গল্পকল্পতরু—(প্রথম কুসুম)

হিরণ্ময়ী

(উপন্যাস)

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আল্‌বার্ট প্রেস্।

৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

কার্ত্তিক,—১২৮৬।

মূল্য এক টাকা চারি আনা

——এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর হস্ত ধারণ করিলেন।
হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না, কেবল অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।
ধীবেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
এমন সময়ে উদ্যানের পশ্চিমদক্ষিণ কোণে কতকটা দূরে একটী মনুষ্যের ন্যায়
কি দেখা দিল।——(৫২ পৃষ্ঠা দেখ)

গল্পকল্পতরু——(প্রথম কুসুম)

হিরণ্ময়ী

(উপন্যাস)

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আল্‌বার্ট প্রেস্।

৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

কার্ত্তিক,—১২৮৬।

মূল্য এক টাকা চারি আনা

বিজ্ঞাপন।

নূতন ব্যাপার।

দেশে পূর্ব্বে কখন এরূপ ধরণের জিনিষ বাহির হয় নাই।

সাত কোটি লোকের বাসভূমি বঙ্গদেশে

গল্পকল্পতরু

রোপিত হইল।

এই তরুবরের অনেক শাখা, এক এক শাখায় এক এক রকম ফুল। একটি ফুলের সহিত অপরটির সাদৃশ্য নাই—অথচ সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি।—প্রত্যেক ফুলের বর্ণ নূতন—ধর্ম্ম নূতন—গন্ধ নূতন। ইহার মধ্যে যিনি যেটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তিনি তাহাতেই মোহিত হইবেন। আজ কাল বাঙ্গালির যাহা ভালবাসার জিনিষ, তাহাই এই কল্পতরুতে ফলিবে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী, বালক বালিকা প্রভৃতি সকলেরই মনোরঞ্জন-পুষ্পগুচ্ছ ইহার শাখায় শাখায় ফুটিবে। লোক যত, রুচিও তত, এই জন্যই এই গল্পকল্পতরুর সৃষ্টি ; কারণ কল্পতরুর নিকট যে যা' চায়, সে তা'ই পায়, ইহা সকলেই জানে।

সাত আট জন উৎকৃষ্ট গল্পরচনক্ষম ব্যক্তি এই তরুবরের মূলে নানাবিধ পাত্র পূরিয়া বিবিধস্বাদবিশিষ্ট জলসেচন করিবেন। তাঁহারা কখন স্বীয় স্বীয় মানস-সরোবরের জল,

কখন বা স্যর ওয়াল্‌টার স্কট্, থ্যাকারে, ডিকেন্স, ডুমা, রেণল্ড, লিটন প্রভৃতির সহায়তা লইয়া এই কল্পতরুর শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির সহিত পাঠক পাঠিকাগণের নূতন নূতন আনন্দ ও কৌতূহল বৃদ্ধি করিবেন। যিনি এই গল্পকল্পতরুর ফুল কিনিতে চাহেন, কিনুন—ঠকিবেন না। কেন না ইহাতে বৎসরে অন্যূন পক্ষে আপাততঃ (প্রতি সপ্তাহে এক ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইবে বলিয়া) তিন চারিটি, ক্রমে (প্রতি সপ্তাহে দুই, এমন কি প্রত্যহ এক এক ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইবে বলিয়া) পাঁচ ছয়টি ও এগার বারটি করিয়া ফুল ফুটিবে, সুতরাং আশা পূরণ হইল না বলিয়া কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। যদিও ইহাতে বরাবর ফুল না ফুটে, তথাপি একটি না একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পূর্ণবিকসিত ফুল পাঠক ,পাঠিকার হস্তে সুশোভিত হইবেই হইবে, সুতরাং তাহা হইলেও আর কাহারও ঠকিবার ভয় নাই।

প্রতি ফর্ম্মার নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র। মফঃস্বলে দুই পয়সা মাসুলে ১৬ ফর্ম্মা একত্রে যাইবে।—গল্পকল্পতরুর ফুল ধারে বিক্রীত হয় না। নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় গল্পকল্পতরুর ফুল বিক্রীত হয়।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি,

প্রকাশকগণ।

আল্‌বার্ট প্রেস,

৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস্ ষ্ট্রীট, বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

শনিবার, ২৮এ বৈশাখ, ১২৮৬ সাল।

গল্পকল্পতরু—প্রথম কুসুম।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নৌকামগ্ন।

বক্তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে, মহারাজ লাক্ষ্মণেয়ের ব্রাহ্মণ সচিবেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে গোপনে পলায়ন করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ রাজা সেই সকল দুর্বুদ্ধি বিপ্রমন্ত্রীর কুপরামর্শে সস্ত্রীক গুপ্তদ্বার দিয়া গঙ্গাতটে প্রস্থান করিলেন। সেখানে একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া সপত্নীক মহাতীর্থ জগন্নাথক্ষেত্রে চলিলেন। বক্তিয়ার বা তাঁহার কোন সমভিব্যাহারী ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিলেন না। রাজা পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণসদৃশী রাজধানী পলায়ন করিতে পারিল না। শত্রুকরে নবদ্বীপের একশেষ দুর্দ্দশা ঘটিল। রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিল। যবনেরা অল্পদিনের মধ্যেই এতদূর অত্যাচার আরম্ভ করিল যে, হিন্দুপ্রজাগণের মৃত্যুই একমাত্র মানসম্ভ্রম রক্ষার অবলম্বন হইয়া উঠিল। অনেক প্রজা যবনকরে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগ পর্য্যন্তও করিতে লাগিল।

সেই উৎসন্নদশাপ্রাপ্ত নবদ্বীপ নগরের এক পল্লীতে একজন ধনবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতা সপ্তগ্রাম হইতে বাসস্থান উঠাইয়া নবদ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। রাজসরকারে কোন একটি ভাল কার্য্য পাইবার জন্যই তিনি নবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন। ফলে সৌভাগ্যক্রমে সেখানে একটি উপযুক্ত পদও প্রাপ্ত হইয়া, আশার চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমরা যে ব্রাহ্মণের বিষয় বলিতেছি, তিনিই তাঁহার একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতা রাজকর্ম্মচারী হইয়া অনেক সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগত হইলে, তিনিই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না—থাকিবেও না। কাল যাহাকে হাসিতে দেখিয়াছি, আজ তাহাকে কাঁদিতে দেখিলাম—কাল যাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছি, আজ তাহাকে হাসিতে দেখিলাম—কাল যাহাকে সুখের প্রভু বলিয়াছিলাম—আজ তাহাকে দুঃখের কিঙ্কর বলিতে হইল—আবার কাল যাহাকে দুঃখের দাস বলিয়াছিলাম, আজ তাহাকে সুখের অধীশ্বর বলিতে হইল। মনুষ্যের অবস্থা এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। চক্রের ন্যায় মনুষ্য-ভাগ্যে সুখদুঃখ অবিশ্রান্তভাবে ঘুরিতেছে। নদীর জল ও পঙ্কে যেরূপ সম্বন্ধ, নরভাগ্যের সুখ ও দুঃখেও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। এ হেন মহামূর্ত্তি—বিরাটমূর্ত্তি প্রকৃতির ভাগ্যেই যেকালে আলোকপূর্ণ দিবা ও তমসপূর্ণ নিশা সুখদুঃখের অভিনয়পট অবিরত ফেলিতেছে, তুলিতেছে, তখন ক্ষুদ্র মানব-ভাগ্যের কথা ত অতি তুচ্ছ।

বক্তিয়ার খিলিজির সৈন্যগণ উক্ত ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি যে আর কোন উপায়ে স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহার কোন পন্থা দেখিতে পাইলেন না। হিন্দু-রাজধানী নবদ্বীপ এক্ষণে মুসলমান-রাজধানী। হিন্দুরাজার সিংহাসনে মুসলমান রাজা। সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্য রক্ষার আর কিছুই উপায় রহিল না। ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক ভয়ানক অত্যাচার করিবার উপক্রম করিল। তিনি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ত্বরাপর হইয়া কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার ও মণিমুক্তা লইয়া, সহধর্ম্মিণী ও দুইটি পুত্রের সহিত গুপ্তদ্বার দিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

তাঁহার অনেকটা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, যখন তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যা বিদায় হইবার জন্য রজনীকে আলিঙ্গন করিতেছিল। বাস্তবিক, দিনের বেলা হইলে, তাঁহার পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করা অতি কঠিন হইত। বক্তিয়ারের ভয়ে মুসলমান সেনারা মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালেই নগরবাসীদের গৃহলুণ্ঠন, এমন কি প্রাণ-বিনাশ পর্য্যন্তও করিত। যাহা হউক, উক্ত বিপদাপন্ন ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কেবল অন্ধকারের কৃপায় স্ত্রীপুত্রদের সহিত প্রাণান্ত হয়েন নাই।

পাঠক মহাশয়, আপনি সেই ব্রাহ্মণের নাম কি, জানেন?—না। তাঁহার নাম গোলোকনাথ। তাঁহার স্ত্রীর নাম তারাসুন্দরী। আর তাঁহার পুত্র দুইটির মধ্যে অগ্রজের নাম বীরেন্দ্রনাথ এবং অনুজের নাম ধীরেন্দ্রনাথ। গোলোকনাথের বয়ঃক্রম অন্যূন সাতচল্লিশ, তারাসুন্দরীর ছত্রিশ, জ্যেষ্ঠ পুত্রটির ষোড়শ ও কনিষ্ঠের চতুর্দ্দশ বর্ষ।

গোলোকনাথ, আপনার স্ত্রী ও পুত্র দুইটির প্রাণবিনাশের ভয়ে, একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাতটে আগমন করিলেন। আসিবার সময় তিনি একবার ভাবিয়াছিলেন যে, এ সময়ে নগরস্থ কোন বন্ধুর বাটীতে গমন করিয়া প্রাণরক্ষা করিবেন। কিন্তু সেই ভাবনা অন্তরে অনেক ক্ষণ স্থান পায় নাই। তিনি আবার আর একটি নূতন চিন্তার অধীন হইয়া ভাবিলেন, "মুসলমানেরা ক্রমশঃ যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আর নগরের কোন স্থানেই অবস্থান করা বিধেয় নহে। আজ—না হয় কাল—আবার হয়ত আমাদিগকে যবনহস্তে পড়িয়া প্রাণান্তকর বিপদের ভাগী হইতে হইবে, সুতরাং চিরকালের জন্যই নবদ্বীপ পরিত্যাগ করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। আবার এ সময়ে সকলেই উৎপীড়িত, সুতরাং কাহার নিকট যাওয়াও বিবেচনাসিদ্ধ নহে। পুনর্ব্বার পিতৃপিতামহদিগের আদিবাসভূমি সপ্তগ্রামে গিয়া বাস করাই সম্পূর্ণ রূপে উপযুক্ত।" গোলোকনাথ এইরূপ চিন্তা করিয়া, স্ত্রী ও পুত্র দুইটিকে সঙ্গে লইয়া, ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইলেন।

গোলোকনাথ যখন গঙ্গার তীর-ভূমিতে উপনীত হইলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি; সুতরাং নিশাকর সেই সময়ে ধীরে ধীরে তমোরাশিকে সরাইয়া, পূর্ব্বগগনে উদয় হইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আকাশের অনন্ত দেহে চন্দ্রের অলক্ষ্যে অস্থির জলদজাল চলিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে, যদিও পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আর মূর্ত্তি লুকাইতে পারিতেছে না। চন্দ্রের ধবলকৌমুদীতে মণ্ডিত হওয়ায়, নীরদখণ্ডগুলির প্রকৃত রূপ লুকায়িত হইয়া, রজতখণ্ডে মণ্ডিত হইয়াছে। মেঘখণ্ডগুলির এইরূপ রূপান্তর নিরীক্ষণ করিয়াই যে, নীতিবিৎ পণ্ডিতেরা "লোকে সঙ্গদোষে দোষী ও সঙ্গগুণে গুণী হইয়া থাকে" এই পদটিতে যে, নীতিশাস্ত্রের নীতিসূত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্ধকারের দোষে মেঘখণ্ডগুলি তমোময় হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্রের গুণে রজতখণ্ডবৎ হইয়া দর্শকগণের দর্শনসুখ পরিবর্দ্ধন করিতেছে। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধগগনে নক্ষত্রমণ্ডলী আর তলগগনে জ্যোতিরিঙ্গণসমূহ যেরূপে গর্ব্ব করিতেছিল, এক্ষণে ঠিক তাহার বিপরীত। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে তাহাদের মূর্ত্তি পণ্ডিতকুলচূড়ামণি বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের "নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" এই অর্দ্ধ শ্লোকটির, পরে মহাকবি কালিদাসের

"অরিষ্টশয্যাং পরিতোবিসারিণা সুজন্মনস্তস্য নিজেন তেজসা।
নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো বভূবুরালেখ্যসমর্পিতা ইব ॥"

কবিতার ভাবার্থের সত্যতা সম্পাদন করিল। সুধাংশুকিরণ কোনখানে বৃক্ষশাখার ব্যবধান দিয়া ভাগীরথীর শীতল সলিল স্পর্শ করিতে লাগিল, কোনখানে তীরস্থ গৃহের বাতায়ন দিয়া নিদ্রাভিভূতা যুবতীর বদনকমল চুম্বন করিয়া যেন কতই তৃপ্তিলাভ করিল। চন্দ্র কখন কখন চলজ্জলদাবলীর পৃষ্ঠদেশে লুকায়িত হইতেছিলেন, আবার কখন কখন তাহাদের তরল দেহ ভেদ করিয়া নিজের সুধাময়ী কৌমুদী ধরাবক্ষে ছড়াইতে লাগিলেন। তন্দ্রাভিভূত কোকিল কোকিলা দিবাভ্রমে এক একবার কুহু কুহু করিয়া উঠিতেছে, আর সেই শ্রুতিসুখবর্দ্ধিনী কুহুধ্বনি নিস্তব্ধ আকাশে সমীর-সঞ্চারে গড়াইয়া যাইতেছে। প্রকৃতি দেবী নির্ব্বাক্ হইয়া যেন মহাধ্যানে নিমগ্ন

হইয়াছেন। কেবল তীরসংলগ্ন কোন কোন তরণী হইতে নাবিককণ্ঠে এক এক বার গ্রাম্যগীতের মধুর শব্দ কর্ণকুহরে আশ্রয় লইতেছে।

এমন সময়ে গোলোকনাথ ভাগীরথীর উপরিতট হইতে তলতটে অবরোহণ করিয়া "মাঝি—মাঝি" বলিয়া দুই চারি বার মধ্যম স্বরে ডাকিলেন। একখানি ক্ষুদ্র নৌকা হইতে এক ব্যক্তি "কে ডাকেন, আজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিল। তখন গোলোকনাথ তাহাকে আপনার নাম বলিলেন। মাঝি তৎক্ষণাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নৌকা হইতে নামিল এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া নম্রতাসহকারে বলিল, "ঠাকুর মশাই! আপনি এমন সময়ে এখানে কি মনে ক'রে এলে?" এই মাঝি গোলোকনাথকে অনেক বার অনেক স্থানে নৌকা করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এই ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানে।

প্রকৃত কথা বলিলে, পাছে মাঝি ভয় পায়, এইজন্য গোলকনাথ তৎক্ষণাৎ নূতন কথা গড়িয়া তাহাকে বলিলেন, "মথুর! সপ্তগ্রাম হইতে একটা বিশেষ সংবাদ আসিয়াছে, এইজন্য আমি সেখানে সপরিবারে এখনই যাইব। আমি একেবারে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, কোনক্রমেই আর বিলম্ব করিতে পারিব না। তোর যদি কোন বাধা না থাকে, তবে তুইই আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারিস্; আর যদি এখন তোর যাইবার সুবিধা না হয়, তবে না হয়, আর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া দে,—কিন্তু আমি আজিই প্রস্থান করিব।"

মথুর প্রায় চারি পাঁচ দিন হইতে কিছুই রোজগার করিতে পারে নাই, সুতরাং গোলোকনাথকে সপ্তগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য অনিচ্ছুক হইল না। আরও সে ভালরূপেই জানিত, অপরাপর আরোহীর অপেক্ষা তিনি, তাহাকে ভাড়া ছাড়া, টাকা কাপড় পুরস্কার দিয়া থাকেন।

অনন্তর মথুর মাঝি পুনর্ব্বার নিজের নৌকায় বসিয়া দুই জন নিদ্রিত দাঁড়ীকে জাগাইল; জাগাইয়া তাহাদের কাণে কাণে কএকটি বাক্য ব্যয় করিল। দাঁড়ী দুই জন অবিলম্বে নৌকাচালনোপযোগী দ্রব্যগুলি ঠিক করিতে লাগিল। মথুর স্বয়ং চক্মকি ঝাড়িয়া একখণ্ড শোলায় অগ্নি সংযোগ করিল এবং সেই অগ্নিতে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিল। দুর্ভাগ্যক্রমে

প্রদীপটির মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং মথুর উহার বর্ত্তিকাটিকে বঙ্কিম-ভাবে রাখিয়া পুনর্ব্বার গোলোকনাথের নিকট আসিল।

তখন গোলোকনাথ মথুরকে লইয়া উপরি-তটে গেলেন এবং মথুরের হস্তে একটি কাপড়ের গাঁঠরী দিয়া, স্ত্রী ও পুত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া জলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মথুর সর্ব্বাগ্রে নৌকার উপর গাঁঠরী রাখিয়া, একে একে বীরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রকে নৌকায় উঠাইয়া দিল। তাহার পর গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরী গঙ্গাবারি শিরঃস্পর্শ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। সর্ব্বশেষে মথুর মাঝি নৌকার উপর বসিয়া, জলমধ্যে কর্দ্দম-সংলগ্ন পদ ধৌত করিল। পা ধুইয়া স্বস্থানে দাঁড়াইয়া হাইল ধরিল। অনন্তর নৌকাবন্ধন বংশদণ্ড উত্তোলন করিয়া মথুর ও দুই জন দাঁড়ী "গঙ্গার পিরতি হরিবোল" বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা ভাটি বহিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল।

দুই দিকে দুইটি দাঁড় পড়িতেছে—নৌকাও কিঞ্চিৎ দমক্ দিয়া চলিতেছে। মথুব ও দাঁড়ী দুই জনের সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, সৌভাগ্য-ক্রমে তাহাদিগকে উজান ঠেলিতে হইল না। মথুর হাজরা দুইটির সঙ্গে ঘরের কত কি কথা আরম্ভ করিল। কখন মথুর প্রশ্ন করিতেছে, দাঁড়িরা উত্তব দিতেছে—কখন দাঁড়িবা প্রশ্ন করিতেছে—মথুর উত্তর দিতেছে। তিন জনের মধ্যে কেহ কখন হাসিতেছে—কেহ কখন কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিতেছে—কেহ আবার প্রফুল্লমনে এই বলিয়া গান ধরিতেছে ;—

"পার কর, পার কর, ব'লে ডাক্‌ছি কত বেলা ;
(ও তুমি শুনেও কি, শ্যাম শুন না হে, হ'য়েছ কি কালা ?"

মথুর মাঝির নৌকা এইরূপে যাইতে লাগিল। ক্ষেপণীনিক্ষেপের মৃদুমধুর শব্দে গোলোকনাথের পুত্র দুইটি ঘুমাইয়া পড়িল ; কিন্তু গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর চক্ষে নিদ্রার আভাসও আসিল না। তাঁহারা উভয়ে মনশ্চক্ষে আপনাদের সেই বিপৎপাত মুহুর্মুহু দর্শন করিয়া নিরতিশয় আকুল হইতেছিলেন। দাঁড়িমাঝির কথা বা গান শুনিয়াও শুনিতেছিলেন না—কেবল সেই দুর্ঘটনা ও বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়াই অস্থির হইতেছিলেন।

পাঠক, গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর মনের ভিতর—হৃদয়ের ভিতর কিরূপ তরঙ্গাঘাত হইতে লাগিল, তাহা লেখনীমুখে কখনই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। তুমিও যদি কখন এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাক, তবে এই সময়ে একবার তাহা স্মরণ কর—বুঝিতে পারিবে। নতুবা শত-পৃষ্ঠাত্মক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াও গোলোক-তারার মনের ও হৃদয়ের এই চিত্র তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। ব্যথার ব্যথী না হইলে এই বিপন্ন দম্পতীর হৃদয়মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার কাহারই ক্ষমতা নাই।

সুদূর আকাশে চন্দ্রমণ্ডলে সুশীতল কিরণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—আবার উহা ভাগীরথীর সুনির্ম্মল জলে পতিত হইয়া তর তর করিয়া ভাসিতেছে। আকাশেও চাঁদ—গঙ্গাজলেও চাঁদ। ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, চন্দ্র যেন দিবাভাগে রবিকিরণে হতশ্রী হইয়াছিল বলিয়া রাত্রি-কালে জলদর্পণে মুখ দেখিতেছে। কিন্তু এক্ষণে চাঁদের বদন-শোভাই বা কত। দিবার চাঁদ আর নিশার চাঁদ যেন পরস্পর স্বতন্ত্র। এক্ষণে এই যে, যেখানে সেখানে কিরণের ছড়াছড়ি, ইহা আর কিছুই নহে—চাঁদের মুখভরা হাসি। অন্ধকার পাইয়া চাঁদ বড়ই খুসী—তাই এত হাসি। যা'ই হউক, চাঁদ বড় নির্ব্বোধ, কেন না,সে জানে না যে, যত হাসি—তত কান্না। আর একটি কথা,—চাঁদ যেমন নির্ব্বোধ, আবার তেমনই নির্দ্দয়। তা' নহিলে কি গোলোক-তারার এই অভূতপূর্ব্ব বিপদেও সে এত হাসে?

দেখিতে দেখিতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া আসিল, নবদ্বীপের নৌকাখানিও রাজধানী ছাড়িয়া প্রায় আট নয় ক্রোশ দক্ষিণে আসিয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক নীরব;—কেবল দুইটি শব্দ শ্রুতিপথে আসিতেছে। তাহার মধ্যে একটি ঝিল্লির, অপরটি ক্ষেপণী-নিক্ষেপের শব্দ। নদীতট-বিরাজিত পাদপশ্রেণী হইতে ঝিল্লিকুল একত্র হইয়া যেন সমস্বরে ঝিঁ ঝিঁ করিয়া কহিতেছে "কে?—কে?" আর নৌকার ক্ষেপণী জলে আঘাত করিয়া যেন উত্তর দিতেছে "চুপ্—চুপ্।"

"ভবিষ্যৎ অভেদ্য অন্ধকারে সৃষ্ট, সুতরাং মানব উহা দেখিতে পায় না। যদি ভবিষ্যতে আলোকের ছায়া মাত্রও থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীকে কেহই দুঃখের প্রসূতি বলিতে সাহসী হইত না। কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার—

পৃথিবীও দুঃখের প্রসূতি।" গোলোকনাথ নেত্র নিমীলন করিয়া এই কথা-গুলি পীড়িত অন্তরে প্রস্তরাঙ্কিত রেখাবৎ খোদিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা মথুর মাঝি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কেষ্টলা! ওরে হরে! লৌকো বুঝি বাণচাল হ'ল। দেখ্ দেখ্, শীগ্‌গির দেখ্—পাট গুঁজে দে।" এই কথা বলিবা মাত্র নৌকার মধ্যে বিষম গোলযোগ পড়িয়া গেল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, গোলোকনাথ ও তারাসুন্দরীর মনোমধ্যে যে দুশ্চিন্তা আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা অক্ষয়। কিন্তু "বাণচাল" শব্দটি উত্থিত হইবামাত্রই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তদপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। উভয়েই তাড়াতাড়ি করিয়া পুত্র দুইটিকে জাগাইতেও অবকাশ পাইলেন না। ডাকিতে ডাকিতে তাহা-দিগকে নৌকার ভিতর হইতে টানিয়া আনিলেন। সেই সময়ে বালক দুইটির নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তাহারা প্রথমে অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধজাগরিত হইল বটে, কিন্তু সহসা নৌকার মধ্যে গোলমাল শুনিয়া ভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিল—কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল। গোলোকনাথ একাকী নৌকায় থাকিলে তত ভয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বালক বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও সন্তরণাক্ষমা তারাসুন্দরী। তিনি সেই তিন জনের জন্য নিতান্ত কাতর ও নিরুপায় হইয়া মাঝিকে বলিলেন, "মথুর!—মথুর! যদি আজ বাঁচাইতে পারিস্ তবে তোকে পাঁচ সহস্র টাকা দিব।"

মথুর বলিল, "ভয় নেই, কর্ত্তা! ভয় নেই; তোমার আশীর্ব্বাদে এখুনি জল ধ'রে দিচ্চি।" একজন দাঁড়ি নৌকার জলপ্রবেশস্থলে হাত চাপিয়া পাট গুঁজিতে লাগিল। অপর জন সেচনী দিয়া নৌকোত্থিত জল সেচন করিতে লাগিল। তাহাদের দৃঢ়তর যত্ন ও পরিশ্রমে বিপন্নাশের অনেকটা সম্ভাবনা হইল বটে, কিন্তু বিপদের উপর বিপদ! নৌকার যে স্থানে বাণচাল হইয়া গিয়া-ছিল, তাহার পার্শ্বেই আবার আর একখানা তক্তা ফাঁসিয়া গেল। এবার আর কিছুতেই জলোত্থান থামিল না। সকলেই হতাশ হইল। তারাসুন্দরী ও বালক দুইটি আতঙ্কে জড়িত স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। দুই চারিবার 'হে মা গঙ্গা, হে ঈশ্বর,—গেলাম, বাঁচাও—হায় হায়" শব্দমাত্র রোদনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গঙ্গাগর্ভ নীরব হইল। জলে নৌকা নাই! নৌকায় যাহারা

ছিল, তাহারাও নাই! ক্ষণকালের মধ্যে নির্জীব ও সজীব উভয়েই অভিন্ন হইল।

ভাগীরথার যে স্থলে গোলোকনাথ সপরিবারে নৌকাডুবী হইয়াছিলেন, উহা তীর হইতে অন্যূন ১৫।১৬ হস্ত দূর হইবে। কিন্তু জলস্রোত অত্যন্ত প্রখর ছিল।

গোলোকনাথের বিপদের উপর বিপৎপাত দেখিয়া আমাদের মনে পড়িল—

"একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং
গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে
ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি॥"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগদীশপ্রসাদ।

যে স্থানে গোলোকনাথের নৌকা মগ্ন হয়, ঠিক সেই স্থান হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে মধুপুর নামে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। সেই গ্রামটি উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়া, এই দুই আখ্যায় বিভক্ত। উভয় পল্লীতেই অনেক ভদ্রলোকের বাস। কিন্তু সেই সকল ভদ্রলোকের মধ্যে তিন চারি জন ব্যক্তি অপরাপর লোকদিগের অপেক্ষা ধনসম্পন্ন ছিলেন। আবার সেই কএক ব্যক্তির মধ্যে দক্ষিণপাড়ায় অপর একজন অধিকতর ধনবান্ জমীদার ছিলেন। তাঁহার নাম জগদীশপ্রসাদ। জগদীশপ্রসাদের পুত্র ব্যতীত অন্য কিছুরই অভাব ছিল না। যাহা হউক, তথাপি তাঁহাকে নিঃসন্তান বলা যায় না। কেন না বিধাতা তাঁহাকে দুইটি কন্যা দান করিয়া ছিলেন। পুত্রের মুখদর্শনে যে পরিমাণে পিতা সুখানুভব করিয়া থাকেন,

তিনি কন্যা দুইটির কোমলতাপূর্ণ বদনসুষমা নিরীক্ষণ করিয়া তাদৃশ আনন্দই উপভোগ করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন জগদীশ-প্রসাদের জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর—নাম কিরণময়ী এবং কনিষ্ঠার বয়স চারি বৎসর—নাম হিরণ্ময়ী। পাঠক, যদি কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর দেহ, রূপ ও মুখশোভা কিরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে একবার কবিবর বিদ্যাপতির

"কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণীহীন হিমধামা"*

কবিতাংশটি মনশ্চক্ষের দৃষ্টিতে ভাল করিয়া দেখিয়া লও। আর যদি উভয় ভগিনীর ভালবাসা কিরূপ জানিতে চাও, তবে 'একবৃন্তে কুসুমযুগল' চিন্তা কর।—বাস্তবিক দুইটি ভগিনী একপ্রাণ ও একচিত্ত, কেবল ভিন্ন দেহ। সর্ব্বদাই দুই জনে একস্থানে খেলা করে—একস্থানে বসিয়া আহারকরে—এক দ্রব্য দুই ভাগ করিয়া ভক্ষণ করে—একস্থানে শয়ন করিয়া থাকে। এক জনকে অপর জন দেখিতে না পাইলে কাঁদিয়া উঠে, ভাবিতে থাকে এবং কিছু খাইতে চাহে না। আবার যখন পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়, তখন উভয়েই উভয়ের গলা জড়াইয়া কতই সুখানুভব করিতে থাকে। আমরা শুনিয়াছি,এক দিন জগদীশপ্রসাদ একটি মেলা হইতে একটি বহুমূল্যের অতি উৎকৃষ্ট পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দুইটি কন্যার জন্য ঐরূপ দুইটি পুতুল কিনিয়া লইয়া আসেন,কিন্তু তাহা সেখানে পান নাই। অবশেষে তিনি সেই একমাত্র পুতুলটি ক্রয় করিয়া গৃহে আগমন করেন। পুতুল দেখিয়া দুই কন্যাই তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিল। জগদীশপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও কিরণ! ও হিরণ! তোমরা দুইটি পুতুল—আবার আজ এই একটি পুতুল আনিয়াছি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কাহাকে ইহা দিব? আচ্ছা, তোমরা দুই জনে এইখান হইতে ঐখান পর্য্যন্ত দৌড়িয়া যাও। যে অগ্রে যাইতে পারিবে, তাহারই

* কনকলতা অবলম্বন করিয়া কলঙ্কহীন চন্দ্র উদয় হইল, অর্থাৎ দেহযষ্টি কনকলতা আর মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই, অতি সুন্দর শরীরের উপরে অধিকতর সুন্দর মুখমণ্ডল।

এই পুতুল।" এই কথা বলিয়া তিনি দৌড়িয়া যাইবার একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ দুই ভগিনী দৌড়িল। বয়স ও শক্তি অনুসারে দেখিতে গেলে, অগ্রে কিরণময়ীরই তথায় পৌঁছিবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। হিরণ্ময়ীই কিরণের অগ্রে কথিত স্থানে উপস্থিত হইল। কিরণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, ছুটিবার সময় পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া গেল। হিরণ্ময়ী নগ্না, সুতরাং কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। তখন জগদীশ-প্রসাদ "হিরণ্ জিতিয়াছে—কিরণ হারিয়াছে" বলিয়া কনিষ্ঠার হস্তে পুত্ত-লিকা প্রদান করিলেন। কিরণময়ী কিঞ্চিৎ ক্রোধমিশ্রিত লজ্জায় বিঘ্নকারণ পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন জগদীশপ্রসাদ তাড়াতাড়ি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "কিক! কাল তোমাকে এই রকম আর একটি পুতুল আনিয়া দিব।" কিরণময়ী কি ভাবিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার সেই ভাব দেখিয়া হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল কি ভাবিল; পরে তৎক্ষণাৎ সেই জয়লব্ধ বহুমূল্যের পুত্তলিকাটি কিরণময়ীকে দিতে চাহিল, কিন্তু সে উহা লইল না।—অবশেষে হিরণ্ময়ী পুত্তলিকাটিকে দ্বিখণ্ড করিয়া উর্দ্ধভাগ কিরণময়ীকে দেখাইয়া বলিল, "দিদি! তুমি আধখানা লও আর আমি আধখানা লই।"

জগদীশপ্রসাদ হিরণ্ময়ীকে পুত্তলিকাটি দ্বিখণ্ড করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহার এই অপূর্ব্ব ভগিনীস্নেহ দেখিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সাহ্লাদে উভয়কে উভয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আর এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই দুই স্নেহময়ী ভগিনীর এইরূপ স্নেহসম্বন্ধিনী অনেক ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের অপরাপর লোকেরা স্ব স্ব পুত্র কন্যাদিগকে সদ্ভাব শিখাইবার জন্য কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়া প্রায়ই বলিত—

"কিরণ হিরণ দুই বোন্,
দুই শরীরে এক মন্।"

পাঠক, তোমাকে কিরণময়ী এবং হিরণ্ময়ীর রূপ ও ভগিনীস্নেহসম্বন্ধে একপ্রকার বুঝাইয়া দিলাম, কিন্তু সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বলিব।—

উহারা উভয়েই রূপবতী, তবু উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য দেখ।—কিরণময়ী সুবর্ণগঠিতা আর হিরণ্ময়ী সরত্নসুবর্ণনির্ম্মিতা।

জগদীশপ্রসাদের বয়ঃক্রম অনূ্যন চৌত্রিশ বৎসর। তাঁহার আবয়বিক গঠনপ্রণালী দেখিলে, তাঁহাকে নিরোগ ও বলিষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস হইত। আকৃতি নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব। শরীরের বর্ণ ফিট্ গৌর। ললাটদেশ বিস্তৃত—চক্ষুযুগল আকর্ণবিস্তৃতও নহে, ক্ষুদ্রও নহে, অথচ অতি সুন্দর—যেন পূর্ণমাত্রায় বিকসিত রহিয়াছে। ভ্রূযুগল মূলস্থলে স্থূল হইয়া ক্রমশঃ অন্ত্যস্থলে সূক্ষ্ম হইয়াছে, সুতরাং ভাল বই কি বলিব? কর্ণ দুইটি যথাযোগ্য। গণ্ডদ্বয় পূর্ণতাবিশিষ্ট। নাসিকাটি টিকলো। ওষ্ঠাধর পুরুও নহে, সরুও নহে। চিবুক মানানসই। তিনি শ্মশ্রুবহন করিতে ভালবাসেন না বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক—শ্মশ্রুহীন। কিন্তু ক্ষৌরকারের ক্ষুর-ঘর্ষণে তাঁহার শ্মশ্রুলোমাবলী নির্ম্মূল হইয়াও হয় নাই। এক কর্ণের মূলদেশ হইতে অপর কর্ণের মূলদেশ পর্য্যন্ত ঈষন্নির্গত শ্মশ্রুলোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ যোড়াটি বেণীপাতি, সুতরাং গোঁফবংশের রাজা। তাঁহার বক্ষ বিশাল। কটিদেশ অস্থূল। বাহুযুগল বেশ গোল। পদদ্বয়ও শরীরের নির্ম্মাণানুযায়ী উপযুক্ত। সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব স্থূলও নহে—খুব ক্ষীণও নহে, অথচ কোনখানে একখানি অস্থিরও উচ্চতা দেখা যায় না। সুতরাং ইহারই নাম নিটোল শরীর। জগদীশপ্রসাদ সর্ব্বদাই শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার করিতেন। তিনি অনেক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও পরিচ্ছদের পারিপাট্য ভালবাসিতেন না।

জগদীশপ্রসাদের সহধর্ম্মিণীর নাম জাহ্নবী। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসর। জাহ্নবী অত্যন্ত স্বামিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। বাস্তবিক জাহ্নবীকে যে সকল স্ত্রীলোক দেখিত, তাহারা তাঁহাকে পতিভক্তির প্রতিমূর্ত্তি বলিত। যেরূপ রূপ গুণ প্রভৃতি থাকিলে নারীকে বিধাতৃসৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারুস্থল বলা যাইতে পারে, জাহ্নবী দেবীতে তত্তাবৎই লক্ষিত হইত। কেবল তাঁহার বামচক্ষু স্বভাবত ঈষৎ বঙ্কিম ছিল।

জগদীশপ্রসাদের স্কন্ধে অনেকগুলি পোষ্য পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নে একজন প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার একটি

কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী, দুইটি ভাগিনেয়, একটি ভাগিনেয়ী, একটি ষষ্টিবর্ষীয়া পিতৃস্বসা, দুইটি বিধবা মাতুলানী ও পাঁচজন মাতুলপুত্র। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি জ্ঞাতি কুটুম্ব তাঁহার বাটিতে প্রতিপালিত হইত।

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটী খুব বৃহৎ—সাত মহল। প্রথম মহলে দরদালান ও বৈঠকখানা। দ্বিতীয় মহলে কাচারী বাড়ী। তৃতীয় মহলে দাস দাসী, দ্বারবান্‌গণ ও বিবিধ সামগ্রী থাকিত। অবশিষ্ট চারি মহলের প্রথম মহলে তাঁহার আত্মীয়েরা এবং দ্বিতীয় মহলে আপনি থাকিতেন। তৃতীয়ে গোশালা এবং চতুর্থে পাকশালা ছিল। গোশালা ও পাকশালার বহির্ভাগে আরও দুইটি দ্বার ছিল। গ্রামের অনেকানেক দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যহ ঐ দ্বার দিয়া পাকশালায় আসিয়া আহার করিত। এই দরিদ্র-ভোজন-ব্যাপারে জগদীশপ্রসাদের মাসিক ব্যয় প্রায় পাঁচ ছয় শত টাকা পড়িত।

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটীর পশ্চিম দিকে ঠাকুরবাড়ী। তথায় ৺ রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ ও শালগ্রামশিলা প্রভৃতি কতিপয় দেবমূর্ত্তি ছিল। সেখানে প্রত্যহ একশত জন অতিথির ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইত। স্নানযাত্রা,রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি হিন্দুদিগের যাবতীয় পর্ব্বাহোৎসব সম্পাদিত হইত।

পাঠক, এইবার তোমাকে জগদীশপ্রসাদের একটি বিশেষ সখের জিনি-ষের কথা বলিব। সেটি একটি বৃহৎ বাগান। তিনি উহার নামকরণ করিয়াছিলেন—'নন্দনকানন'। তথায় বিবিধজাতীয় বৃক্ষ লতা গুল্ম রোপিত হইয়াছিল। তিনি যেখানে যত প্রকার ভাল ভাল ফলের বা ফুলের গাছ পাইতেন, সকলই আপনার বাগানে আনিয়া রোপণ করিতেন। ছয় ঋতুতেই তাঁহার আদরের নন্দনকানন অপর্য্যাপ্ত ফলপুষ্প প্রসব করিত। নন্দনকানন দুই ভাগে বিভক্ত। সেই দুই ভাগেই দুইটি পুষ্করিণী ছিল। এক্ষণে পাঠককে দ্বিভাগ-বিভক্ত নন্দনকাননের বিষয় সংক্ষেপে বলি-তেছি;—প্রথম বা দক্ষিণভাগ—মধ্যস্থলে সরোবর। ইহার জল অতি পরিষ্কার। কোন স্থানে কিছুমাত্র শৈবাল বা দাম নাই, কিন্তু মৎস্য অপ-র্য্যাপ্ত। চারি দিকে চারিটি ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানবদ্ধ অবতরণ-স্থান (ঘাট)।

তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের ঘাটটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। ঘাটের চাতালের উপরিভাগে লৌহতারনির্ম্মিত ফটক। সেই ফটকের উপর দুই তিন জাতীয়া লতা জড়াইয়া ছিল। সকলগুলিই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মৃদুল সমীরণ-হিল্লোলে শিরঃসঞ্চালন করিত। দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা মানুষকে এই বলিয়া নিন্দা করিত,—"ও মানব! তুমি আত্মাবান্ হইয়াও আত্মাশূন্য আর আমরা আত্মাশূন্য হইয়াও আত্মাবিশিষ্ট। যদি বল, কেন? তবে বলি শোন,—তোমাদের ভালবাসার নাম স্বার্থপরতা আর আমাদের ভালবাসার নাম আত্মসমর্পণ। ও স্বার্থপর মানব! তুমি ভালবাসার ভান করিয়া স্বার্থসাধন কর, কিন্তু আমরা ভালবাসার জন্য আত্মসমর্পণ করি। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাও? আইস।—আমার নাম মালতী, আমি মাধবীকে বড় ভালবাসি—মাধবীও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, এইজন্যই আমরা চির-আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছি। নিষ্ঠুর মানব! তুমি যদি আমাদের একজনকে টানিয়া বিচ্ছিন্ন কর, তাহা হইলে অপরজন কখনই তাহাকে ত্যাগ করিবে না।—মালতীকে টানিলে মাধবী মরিবে—আর মাধবীকে টানিলে মালতী মরিবে—নিশ্চয় মরিবে। তাই বলিতেছি, মানব! তুমি আত্মাবান্ হইয়া আত্মাশূন্য আর আমরা আত্মাশূন্য হইয়াও আত্মাবিশিষ্ট।"

জগদীশপ্রসাদ এই পুষ্করিণীর নাম রাখিয়াছিলেন—রাধাকুণ্ড। রাধাকুণ্ডের জল অপরটির অপেক্ষা স্বচ্ছ, লঘু ও সম্পূর্ণরূপে পঙ্কবাসশূন্য। ইহার চতুস্তীরে নানাবিধ পুষ্পতরু কুসুমাভরণে সুশোভিত। তৎপশ্চাৎ প্রথম শ্রেণীর শ্রেণীবদ্ধ আম্রবৃক্ষ। রাধাকুণ্ডের তটস্থ ফুলতরুকুলের শাখোপবিষ্ট বিকসিত কুসুমাবলির শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ বিশিষ্ট প্রতিবিম্ব স্বচ্ছসলিলে নিপতিত হইয়া দর্শকের চক্ষে ধাঁধা লাগাইত। বাস্তবিক, দূর হইতে দেখিলে এই বোধ হইত, যেন রাশীকৃত পুষ্প ভাসিয়া রহিয়াছে। জগদীশপ্রসাদ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে প্রত্যহ নন্দনকাননে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। কিন্তু এই উদ্যানের অপর অংশ অপেক্ষা রাধাকুণ্ড বিভাগই তাঁহার বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল।

উদ্যানের উত্তর বিভাগের নাম ললিতাকুণ্ড। কেননা এই নামে সেখানেও একটি পুষ্করিণী ছিল। রাধাকুণ্ডবিভাগ জগদীশপ্রসাদের বায়ুসেবনের

আর ললিতাকুণ্ড বিভাগ তাঁহার প্রাত্যহিক ব্যঞ্জন সংস্থানের সম্বল। এই বিভাগে বহুবিধ শাকসবুজি উৎপন্ন হইত। প্রায় প্রত্যহ পাঁচ ছয় বজরা তরকারীর যোগাড় এইখান হইতেই হইত। রাধাকুণ্ড-সরসী-তীরে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বিলাসভবন, কিন্তু ললিতাকুণ্ডের কপালে তাহা ছিল না। থাকিবার মধ্যে মালীদিগের বাসোপযোগী চারি পাঁচখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। যাহা হউক, মধ্যে বৃক্ষমণ্ডলীর এরূপ দৃষ্টিরোধক ব্যবধান ছিল যে, বিলাসভবন হইতে তৃণকুটীরগুলি কোন মতেই দেখা যাইত না। ললিতাকুণ্ডে মীনবংশ বড় বিরল। উহার সলিলোপরি ক্ষুদ্র ও বৃহজ্জাতীয় শৈবালদল জন্মিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ তত্তাবৎ পরিষ্কার করাইতে পারিতেন, কিন্তু শ্বেত ও রক্তপদ্মের ঝাড় তৎসহ মিশ্রিত থাকায়, ছিঁড়িয়া যাইবার ভয়ে তাহা করাইতেন না। একমাত্র কমলদলের গুণে ললিতাকুণ্ডের অপরাপর দোষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের বিবেচনায় গুণ সম্বন্ধে রাধাকুণ্ড যেমন প্রধান, তেমনি রূপসম্বন্ধে ললিতাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। ললিতাকুণ্ডের তীরস্থ বৃক্ষগণ বড় হতভাগ্য। তাহারা তাহার জলদর্পণে একটিবারও আপনাদের পুষ্পভূষণভূষিত শ্যামলবদন দেখিতে পাইত না। এই দুঃখেই যেন শৈবাল সরাইবার আশায় স্ব স্ব শাখা জলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিত, কিন্তু সরাইতে পারিত না। কেবল সমীরণ এক এক বার দয়া করিয়া শাখা নাড়িয়া দিলে, কিছুক্ষণের জন্য জলে তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়িত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহাতে সমীরের দয়ার পরিচয়ের পরিবর্ত্তে পরিহাসেরই বাড়াবাড়ি বলা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অগ্রে সে বৃক্ষগুলির মস্তক হইতে কুসুম-ভূষণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, পশ্চাৎ নিরলঙ্কার মুখ দেখাইত। তবে বল দেখি, কে উহাকে দয়ার পরিচয় বলিবে ?

জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটীর পূর্ব্বদিকে এই নন্দনকানন ছিল। উদ্যানটি দীর্ঘে প্রস্থে খুব বৃহৎ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়প্রাপ্তি।

পাঠক, তুমি এতক্ষণ ধরিয়া জগদীশপ্রসাদের বাস্তবাটী, ঠাকুরবাড়ী ও উদ্যানের বিষয় এক প্রকার শুনিলে, এখন একবার তাঁহার বাস্তবাটীর দেহড়ীতে চল।

অধুনা বঙ্গদেশে যেমন ইংরাজি ধরণের ইষ্টকালয় দেখিতে পাই, ইহার পূর্ব্বে সেইরূপ মুসলমান ধরণের অনেক আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইত। আজিও বঙ্গদেশের কোন কোন প্রাচীন হিন্দু জমিদারদিগের প্রাসাদ মুসলমান প্রণালীতে গঠিত হইয়া আছে। কিন্তু এক্ষণে—এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর মহম্মদীয় প্রণালী নাই, কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালী অনেকটা অনুকৃত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালির পক্ষে নূতন বলিয়া ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতীয় মনুষ্য অনুকরণ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইবার যোগ্য, তাহা হইলে আমরা বলিব —"আমরা"। বাস্তবিক, পরকীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, অশন, বসন, শয়ন, ভবন—রং ঢং সং যা কিছু, সকল বিষয়েই প্রথম শ্রেণীর প্রথম অনুকরণকারী "আমরা"। আমাদের আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু অনুকরণক্ষমতা ষোল আনা আছে। যাহা হউক, এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ও বৈরাট অনুকরণবৃত্তি আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎকে আলোকিত করিবে কি আরও গাঢ়তর অন্ধতমসে ডুবাইবে, তাহার কিছুই জানি না। তবে কি না পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না জানিলেও স্থূলরূপে এইমাত্র জানি যে, এই সর্ব্বগ্রাসী অনুকরণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম পর্য্যন্তও গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। বোধ হয়, আর কিছু কাল পরে বাঙ্গালি 'ওরকে ফিরিঙ্গি' এই নবজাতিগত মহোপাধিটি আপনা হইতেই আমাদের উপর বর্ত্তিবে। ভগবান্ জানেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ কিরূপ ভয়ানক বা ভরসাপ্রদ।

পরিবর্ত্তনশীল কালদেবতার তৌলদণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর মিঃ এ, বি, সি,

বিলাইচাঁড় বানরজী এস্কোয়ার, রাধু, সাধু, মাধু প্রভৃতির সহিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর জগদীশ প্রভৃতিকে ওজন করিয়া দেখিলে চিনিয়া উঠা ভার! এখন কোন কোন বঙ্গীয় ধনী বা মধ্যবিত্তের গৃহে প্রবেশ করিলে সহসা বোধ হয় যে, যেন কোন পিন্দ্রর বাড়ীতে আসিয়াছি না কি? এই টেবিল—এই সানক—এই কাচের গেলাস—এই কাঁটাছুরী চামচে—এই হ্যাট-কোট-পেন্টুলন—এই রাশিকৃত মদের বোতল! এই সব দেখিয়া কে বলিবে যে, ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর জগদীশপ্রসাদের দেশ? তাই বলিতেছি যে, ভগবান্ জানেন্ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ কিরূপ ভয়ানক বা ভরসাপ্রদ।

জগদীশপ্রসাদের অট্টালিকা প্রাচীন হিন্দুস্থপতিদিগের নির্ম্মিত, সুতরাং উহাতে আধুনিক কোন প্রকার অনুকৃতির লেশমাত্রও থাকিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে স্থপতিকার্য্যের কিরূপ গঠনরীতি ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক করিয়া বলা দুঃসাধ্য। তবে এইমাত্র জানা যায়, তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রণালীতে প্রায় অধিকাংশ এবং বঙ্গদেশের আদিম নিবাসীদিগের রীতিতে অল্পাংশস্থপিত কার্য্য সমাধা হইত। প্রসিদ্ধ পীঠস্থান কালীঘাটের কালীমন্দির প্রভৃতি বঙ্গভূমির আদিমনিবাসীর এবং কলিকাতাস্থ জগন্নাথের ঘাটের জগন্নাথদেবের মন্দির বৌদ্ধদিগের স্থপতিকার্য্যের পরিচয়-স্থল। কাশীতে বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি শিবলিঙ্গের যেরূপ মন্দির, তাহা বঙ্গদেশে অতি বিরল, কেবল মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কোন কোন স্থলে জৈন কেঁয়েরা পার্শ্বনাথের মন্দির সেইরূপ ধরণে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ মন্দির প্রথমে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিরা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এইটি ধরিয়া লইতে হইবে যে, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় যে সকল মন্দির, উহা প্রথমে হিন্দু-ধর্ম্মাবলীদিগের দ্বারা সৃষ্ট আর জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় যে গুলির আকার, উহা আদৌ বৌদ্ধমতাবলম্বিগণের কৃত। এইরূপ মন্দিরের ন্যায় অট্টালিকা প্রভৃতিরও আদি সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধীয় মূলানুসন্ধান করা নিতান্ত দুরূহ।

আমরা জগদীশপ্রসাদের অট্টালিকাকে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয় রীতির অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইব। বৌদ্ধ-রীতি হিন্দুরীতির অন্তর্বর্ত্তী, সুতরাং

ইহাকে আমরা পরকীয় অনুকরণ বলিব না। জগদীশপ্রসাদও এরূপ করাতে অপরাধী নহেন।

এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত। পাঠক! এইবার দর্শক সাজিয়া আমার সহিত জগদীশপ্রসাদের দেহুড়ীতে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর।—ঐ দেখ, বহির্দ্বার কত উচ্চ। উহার কপাট-ফলকদ্বয়ে কত স্থূলশিরা লৌহকীলক বিদ্ধ রহিয়াছে। এক্ষণে প্রাতঃকাল, সুতরাং দ্বার মুক্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, বহির্দ্বারের বহির্ভাগ হইতে প্রথম মহলের দূরস্থিত অন্ত্য সীমা পর্য্যন্ত বেশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দেহুড়ীর ভিতর দুই পার্শ্বে দ্বারবান্‌দিগের বিশ্রামস্থান। তথায় উহাদের অনায়াসবহনীয় রজ্জুগর্ভ খট্টাসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। ঐ আবার, ঐ দেখ, দৌবারিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধূলি মাখিয়া দেহুড়ীর বহির্ভাগে ভূব্যায়াম, মুদ্গর সঞ্চালন ও নেজান আকর্ষণ-করিতেছে। এক এক জনকে দেখিলে কংস রাজার চানূর মুষ্টিকে মনে পড়ে। ঐ দেখ, নিক্ষিপ্ত কোমল মৃত্তিকার উপর বিশ্বেশ্বর তেওয়ারি ও গোবিন্‌লাল চৌবে বলপরীক্ষা বা বলবৃদ্ধি করিতেছে। মাধোলাল মিশির বৃদ্ধ, সুতরাং সে আর কুস্তীর দিকে নাই। সে এখন নন্দনকানন হইতে কতকগুলি বিল্বপত্র ও পুষ্প আনিয়া শিবপূজা করিতে বসিয়াছে।—বোধ করি, উহার মন বলিতেছে, "মাধোলাল! তুমিও এক সময়ে তেওয়ারি আর চৌবের ন্যায় মাটীর উপর আমাকে উলট পালট খাওয়াইতে, কিন্তু এক্ষণে তুমিই আবার সেই মাটীতে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছ। মাধো! তোমার সেই এক দিন আর এই একদিন! আমার সেই একদিন আর এই একদিন! এবং মাটীরও সেই একদিন আর এই একদিন! মাধোলাল! এই রকম সকলেরই।'

জগদীশপ্রসাদ প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রাণসম নন্দনকাননে বায়ুসেবন ও ভ্রমণ করিতে যান। আজিও তিনি উক্ত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু অন্দরমহলে না গিয়া দেহুড়ীর বাহিরে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর উপবিষ্ট রহিলেন। প্রত্যহ তিনি এমন সময়ে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। কেন? একটি মনুষ্যোচিত সৎকার্য্যের জন্য। সে কার্য্যটি কি? ভিক্ষুকদিগকে চাউল ও পয়সা দান। একজন দৌবারিক ভিক্ষুকগণকে চাউল ও অর্থ দিতে থাকে,

আর তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতে থাকেন। এক একদিন আপনিও স্বহস্তে এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করেন। যখন তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া স্বভুজে দরিদ্র ভিক্ষার্থীদিগকে চাউল পয়সা দিতে থাকেন, তখন দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি মনে মনে বলিতে থাকেন, 'এই অপর্য্যাপ্ত অসীম কষ্টকর সংসার-দ্বারে অর্থাৎ গৃহদ্বারে আর থাকিতে চাহি না। ভিক্ষুকগণ! তোমরা আমার এই সামান্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, আমার একটি অসামান্য উপকার কর—আমাকে চিরানন্দপূর্ণ চিরপ্রার্থনীয় সেই দ্বার—সেই মহাদ্বার দেখাইয়া দাও। তোমরা ব্যতীত কে আমাকে সেই দুর্গম দ্বার দেখাইতে পারে?—বলবানের ক্ষমতা নাই—লক্ষপতির ক্ষমতা নাই—বিদ্বানের ক্ষমতা নাই—কেবল তোমাদেরই ক্ষমতা আছে। সেই মহাদ্বারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঘোরতর অবিচ্ছিন্ন তমস-শঙ্কটে পড়িতে হয়, সুতরাং তোমরাই কেবল আলোক প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইতে পার।'

অদ্য জগদীশপ্রসাদ স্বীয় দ্বারদেশে ভিক্ষুক-বিদায় করিবার আশায় বসিয়া আছেন।—এক্ষণে বেলা অন্যূন এক প্রহর হইয়াছে।—দেখিতে দেখিতে অনেক-গুলি দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ক্রমে দানকার্য্য আরম্ভ হইল।—অদ্য জগদীশপ্রসাদ স্বহস্তে দান করিতেছেন। এমন সময়ে ভিক্ষুকদিগের মধ্য হইতে একটি বালক কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট আসিল। সে কোন কথা কহিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া পরের কষ্টের সহিত নিজের কষ্টের কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারিলেন।—বলিলেন, "বালক! তুমি কাঁদিতেছ কেন? অন্য কোন বালক কি তোমাকে মারিয়াছে?"

বালক বলিল, "কেহই আমাকে মারে নাই।" এই বলিয়া আবার কাঁদিতে কাঁদিতে নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ আবার বলিলেন, "তবে তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ?"

বালক তাঁহার সেই কথার এই উত্তর দিল, "এখান হইতে নদিয়া কতদূর? সাতগাঁ কোন্ দিকে?"

জগদীশ ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আবার বলিলেন, "কেন?"

বালক।—"আমাদের নৌকাডুবী হইয়াছে। আমার পিতা মাতা আর বড় দাদা ডুবিয়া গিয়াছেন। আমিও ডুবিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলে ডুবিয়া কে কোথায় গিয়াছেন জানি না। বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বালক আর বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিল না। আপনা-আপনি কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কেবল অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

জগদীশপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আপনি স্বহস্তে তাহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। একজন দ্বারবান্‌কে জল আনিতে বলিলেন। জল আনীত হইলে, দ্বারবান্ ঐ বালকের মুখে দিয়া কতকটা সুস্থির করিল।

জগদীশপ্রসাদ আবার বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় নৌকা মগ্ন হইয়াছে? কখন হইয়াছে?"

বালক।—"গাঙ্গায় পরশু রাত্রিতে।"

জগদীশ।—"কি করিয়া?"

বালক।—"তা' জানি না। তবে এইমাত্র জানি, নৌকার মধ্যে হুহু করিয়া জল উঠিয়াছিল।"

জগদীশপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন, নৌকা বাণচাল হইয়া গিয়াছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

বালক।—"শ্রীধীরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

জগদীশ।—"তোমার পিতার নাম?"

বালক।—"শ্রীগোলোকনাথ শর্ম্মা।"

জগদীশ।—"তোমার বয়ঃক্রম কত?"

বালক।—"চতুর্দ্দশ বৎসর।"

জগদীশ।—"তুমি নবদ্বীপ আর সপ্তগ্রামের নামোল্লেখ করিলে কেন?"

বালক।—"নবদ্বীপে আমাদের বাড়ী। সপ্তগ্রামে যাইতেছিলাম। তা'র পর গঙ্গায়—"

জগদীশপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন সপ্তগ্রামে যাইতেছিলে?"

বালক।—"যে রাত্রিতে নৌকা ডুবে, সেই রাত্রিতে সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা আমাদের বাড়ী লুঠ করে। আমার পিতা, পরে আরও বিপদ

ঘটিবে ভাবিয়া, আমাদিগকে লইয়া গোপনে নৌকা-আরোহণে সপ্তগ্রামে যাইতেছিলেন।—তার পর দুরদৃষ্টক্রমে—"

"আচ্ছা, সপ্তগ্রামে কি তোমাদের কোন আত্মীয় লোক আছেন?" জগদীশপ্রসাদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক বলিল, "তা আমি ভাল জানি না। তবে শুনিয়াছিলাম যে, সেখানে আমাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল। আমার পিতামহ নবদ্বীপের রাজ-সরকারে কার্য্য করিবার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

জগদীশ।—"সপ্তগ্রামে তোমার কে আছে, তুমি তা জান না,—তবে সেখানে কি জন্য যাইবে?

বালক।—"আমার পিতা যে যাইতেছিলেন।"

জগদীশ—"হয় ত তাঁহার কোন বন্ধুবান্ধব সেখানে থাকিতে পারেন। কিন্তু তোমাকে সেখানকার কে চিনে?"

জগদীশপ্রসাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বালকের চিত্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইল। সে আর সপ্তগ্রামের নাম মনোমধ্যে আঁকিয়া রাখিতে পারিল না।—জগদীশপ্রসাদের একটি কথাতেই বালকের নিকট সপ্তগ্রাম অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। বালক বিমর্ষ হইয়া অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিল।

এ দিকে ক্রমে ক্রমে বালকের সঙ্গী ভিক্ষুকেরা কৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান করিল। ইহার সহিত তাহাদিগের অল্প সময়ের আলাপ, সুতরাং তাহারা যাইবার সময় ইহার বিষয় কিছুই ভাবিল না। জগদীশপ্রসাদের সহিত বালকের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে দেখিয়া দুই তিন জন ভিক্ষুক যাইবার সময় এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, "এ ছোঁড়ার আজ সুপ্রভাত। কর্ত্তা মহাশয় হয় ত ইহাকে নূতন কাপড় দিবেন।"

অনন্তর জগদীশপ্রসাদ বালককে বলিলেন, "তুমি জলমগ্ন হইবার পর কিরূপে তীরে উঠিলে?—তুমি সাঁতার জান কি?"

বালক। "সাঁতার জানি না। নৌকা ডুবিয়া যাইবার সময় যে ঠিক কি রকম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমি জানিলাম, যেন কিসে আট্‌কাইয়া গিয়াছি। অমনি তখন জানিতে পারিলাম, জলে একটা বড় গাছ পড়িয়া আছে—উহার কতকটা জলের ভিতর আর কতকটা

জলের উপর রহিয়াছে। সেই গাছটা নদীর তীর হইতে জলে হেলিয়া পড়িয়াছিল। উহা কি গাছ তাহা আমি তখন ঠিক্ করিতে পারি নাই। আমি সেই গাছটিতে আটক পড়িয়াছিলাম বলিয়া বাঁচিয়াছি, নতুবা নিশ্চয় মরিয়া যাইতাম। আমি সেই প্রাণদাতা বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে উপরে আসিলাম, কিন্তু মগ্নাবস্থায় অনেকটা জল খাইয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া অনেকক্ষণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করিয়া ফেলিলাম। তখন আপনাকে কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলাম। কিন্তু সুস্থ হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত।” বালক এই কথা বলিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

তখন জগদীশপ্রসাদ দেখিলেন, এক্ষণে বালককে আর কিছু বলা ভাল নহে। সে এইরূপ কথায় অত্যন্ত কষ্ট পায়। সুতরাং তাহাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠগৃহে।

জগদীশপ্রসাদ যে সময়ের লোক, সে সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল কি না, তাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই না। কিন্তু জগদীশপ্রসাদ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগদীশপ্রসাদের কন্যা দুইটি পুত্রস্থানীয়া। তিনি তাহাদিগকে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে স্বয়ং একজন বিশিষ্টরূপ বিদ্বাবান্ ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিণীদ্বয় ভবিষ্যতে যে পরিমাণেই হউক, কতকটা লেখাপড়া শিখিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা চরিতার্থ হয়। তিনি এই জন্যই পুত্রী দুইটিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে পূর্ব্বাহ্ন। ও দিকে দুর্দ্দশাপন্ন ধীরেন্দ্রকে লইয়া জগদীশপ্রসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, এ দিকে পাঠগৃহে রামজয় বিদ্যানিধি কিরণ-

ময়ীকে পাঠাভ্যাস করাইতেছেন। কিরণময়ী শিক্ষার প্রথম পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয়খানি আরম্ভ করিয়াছে। কিরণময়ী শিক্ষকের যত্নে ও আপনার বুদ্ধিবলে অল্প দিনের মধ্যে পিতার সন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্টি বর্ষ হইয়াছে। তাঁহার সুবিস্তৃত ললাটদেশ তাঁহাকে একজন সুবিদ্বান বলিয়া পরিচয় দিতেছে। মস্তকের সম্মুখভাগে টাক পড়িয়াছে—পশ্চাদ্ভাগে ক্ষুরমুণ্ডিত হইলেও, সেই স্থান যে কেশোৎপাদনের পক্ষে উর্ব্বর, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। বয়ঃক্রমানুসারে তাঁহার কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে।—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যক্তির মুখের নিকটে দাড়ী গোঁপ কখনই বয়োবৃদ্ধ হইতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে পণ্ডিতদিগের বড় শক্রতা। এই জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় ক্ষৌরকারকে বড় ভাল বাসেন। রামজয় পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রথমশ্রেণীর ভক্ত। তিনি কপালে দীর্ঘ ফোঁটা কাটেন, গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসী মালা ধারণ করেন এবং সর্ব্বদাই মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনি ছয় ঋতুতেই পট্টবস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে প্রাণের ন্যায়, সর্ব্বদা একটি শম্বুকের নস্যাধার থাকে। তিনি আলস্য, নিদ্রা এবং শারীরিক ও মানসিক জড়তা দূর করিবার জন্য, সেই শম্বুককোষে শুষ্ক চূর্ণমিশ্রিত তাম্রকূটচূর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন। প্রয়োজন হইলে তন্মধ্য হইতে এক টিপ্ নস্য বাহির করিয়া নাসারন্ধ্রে স্পর্শ করাইয়া সুদীর্ঘ অন্তর্নিশ্বাসে আকর্ষণ করিয়া ফেলেন, অমনি আলস্য, নিদ্রা ও জড়তা কোথায় পলাইয়া যায়। কতক্ষণের জন্য তাহাদের আর অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি সর্ব্বদাই সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক বার্দ্ধক্য-বশতঃ বাক্যেরও বার্দ্ধক্য জন্মিয়াছে।—ফল কথা, একজন সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে যে সকল গুণ ও লক্ষণ থাকা চাই, তত্তাবৎ রামজয় বিদ্যানিধি পণ্ডিত মহাশয়ে বর্ত্তিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ তাঁহাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

পাঠগৃহের মধ্যস্থলে বিদ্যানিধির সম্মুখে বসিয়া কিরণময়ী আপনার পুরাতন পাঠ আলোচনা করিতেছে, আর বিদ্যানিধি মহাশয় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া আদ্যোপান্ত শুনিতেছেন। কিন্তু মনুষ্য নানাচিন্তার চির-

কিঙ্কর। যে দিন হইতে মনের সৃষ্টি, সেই দিন হইতেই চিন্তা তাহার জীবন, সুতরাং যেখানে মন সেই খানেই চিন্তা—চিন্তামনের কখনই বিরহ ঘটে না। ইহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ সংঘটনেরই নাম মৃত্যু। যে দিন মানুষ মরিবে, সেই দিন মনও মরিবে। এক দিকে মনুষ্যের বায়ুজ প্রাণ দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে, অপর দিকে মনের প্রাণরূপ চিন্তা পলাইয়া যাইবে।—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। বিদ্যানিধি মহাশয় মন দিয়া কিরণের পুরাতন পাঠ শুনিতেছিলেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে, কি জানি, কিসের চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনকে অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছিল। কাজেই তিনি থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি বলিলে মা! আবার বল।"

কিরণময়ীও চিন্তার নূতন সহচরী। সেও পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইতেছিল। তাহার তৎকালের অন্যমনস্কতার কারণ হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাতে কিঞ্চিদ্দূরে বসিয়া একটি কাষ্ঠ পুত্তলিকা লইয়া খেলা করিতেছিল, আর কিরণময়ীর উচ্চারিত এক একটি বর্ণ ও বাক্য এক একবার সুমধুর কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে প্রতিধ্বনিত করিয়া পুতুলটিকে আপন মনে তালে তালে মৃত্তিকার উপর ফেলিতেছিল। পণ্ডিত মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন দেখিয়া, কিরণময়ী নিঃশঙ্ক চিত্তে হিরণ্ময়ীর পাঠাভ্যাস শুনিতেছিল এবং তাহার পুত্তলিকাক্রীড়া দেখিতেছিল। কিরণের মুখ পাঠ অধ্যয়ন করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন চিন্তার সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া হিরণকে আলিঙ্গন করিতেছিল। এমন সময়ে চিন্তার পুরাতন সহচর নেত্র উন্মীলন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিলে মা! আবার বল।"

অমনি চিন্তার নব সহচরী কিরণময়ী চম্‌কাইয়া উঠিয়া আবার অধীত পাঠের সহিত সাক্ষাৎ করিল।—এইরূপে গুরুশিষ্যার পাঠকার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে ধীরেন্দ্রকে লইয়া জগদীশপ্রসাদ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

জগদীশপ্রসাদের প্রতি ক্রীড়ানিমগ্না হিরণ্ময়ীর সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টি পতিত হইল। সে "এই বাবা, কোলে কর, বাবা!" বলিতে বলিতে পিতার নিকট দৌড়িয়া আসিল। তখন পণ্ডিত মহাশয় "আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া জগদীশপ্রসাদকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নমস্কার-

প্রতিনমস্কার-ব্যাপার চুকিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের সঙ্গে একটি অপরিচিত বালককে গৃহমধ্যে আসিতে দেখিয়া রামজয় বিদ্যানিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এই বালকটি কে?"

তখন জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় আদ্যোপান্ত বলিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া দুঃখসহকারে কতকটা বিস্মিত হইলেন।

জগদীশপ্রসাদ ও রামজয় বিদ্যানিধি উভয়ের মধ্যে যে সময়ে ধীরেন্দ্রনাথের কথা হইতেছিল, সে সময়ে ধীরেন্দ্রকে দেখিয়া কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীর দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিরণময়ী বালিকা হইলেও কিঞ্চিৎ বয়সের আধিক্যবশতঃ লজ্জার বশীভূতা আর হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর অপেক্ষা বয়োন্যূন বলিয়া লজ্জার শাসনাধীন নহে। সুতরাং অপরিচিত বালককে দেখিয়া উভয়েরই দুই প্রকার দৃষ্টিপরিবর্ত্তন ঘটিল। কিরণময়ী প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ অধ্যয়ন করিতেছিল, কিন্তু যেমন ধীরেন্দ্রকে দেখিল আর অমনি তাহার উচ্চ স্বর মৃদু হইয়া আসিল। সে এক একবার নবাগত বালকের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল আর আস্তে আস্তে অনুচ্চ স্বরে পাঠ অধ্যয়ন করিতে থাকিল। পরবালককে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জা যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু এ দিকে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রকে অপরিচিত বুঝিতে পারিয়াও ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে ধীরেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে তুমি পুতুল খেলা করিবে?"

হিরণ্ময়ীর সেই সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত কথা কএকটি শুনিয়া ধীরেন্দ্র আত্মাবস্থা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একবার ঈষৎ হাসিল। আবার তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

কথার উত্তর না পাইয়া হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিল। তাহার মাতা তাহাকে একখানি লালরঙের কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে পাঠগৃহে আসিয়া উহা খুলিয়া গলদেশে ও স্কন্ধে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যখন সে ধীরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিল, তখন বাম হস্তে সেই গলস্কন্ধবেষ্টিত বস্ত্রের একাংশ চর্ব্বণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে তাহার দক্ষিণ কর আকর্ষণ করিয়া বসন চর্ব্বিত মুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তুমি কেন আমার সঙ্গে খেলিবে না? বড় দিদির সঙ্গে কি খেলিবে?"

হিরণ্ময়ীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া লজ্জিতা কিরণময়ী অধোমুখে একটু হাসিয়া উঠিল।

হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে লইতে ধীরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু স্বয়ং অপরিচিত বলিয়া তাহা পারিল না।

এ দিকে জগদীশপ্রসাদ আবার বিদ্যানিধিকে বলিলেন, "মহাশয়! এই বালকটিকেও আপনি লেখা পড়া শিখাউন। এখন যেকালে আমি ইহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছি, তখন বিদ্যাশিক্ষার ভারও লইতে হইবে। যত দিন ইহার পিতামাতা ও অগ্রজের কোন সন্ধান না পাইতেছি, তত দিন ইহাকে পুত্রের ন্যায় দেখা কর্ত্তব্য।"

বিদ্যানিধি বলিলেন, "ইহা আপনার ন্যায় দয়ালু ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কার্য্য বটে। যাঁহার আশ্রয়ে প্রতিদিন শত শত লোক প্রতিপালিত হইতেছে, তাঁহার নিকট ইহা কোন্ বিচিত্র বিষয়?" এই কথা বলিয়া তিনি এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ধীরেন্দ্রনাথের ভরণপোষণ ও শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্র জগদীশপ্রসাদের এই সদাশয়তায় অত্যন্ত আনন্দিত হইল, কিন্তু তথাপি তাহার হৃদয়ে যেন কিসের অত্যন্ত কষ্ট রহিয়া গেল। সে কষ্ট যে কি, তাহা পাঠককে আর বলিতে হইবে না।

অনন্তর বিদ্যানিধি মহাশয় সে দিনকার মত বিদায় হইলেন। জগদীশ-প্রসাদও দুইটি কন্যা ও ধীরেন্দ্রকে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

জগদীশপ্রসাদের পুত্রবৎ অকৃত্রিম স্নেহে ধীরেন্দ্রনাথ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। যখন যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই পায়। অধিক আর কি বলিব, একজন ধনীর পুত্র যে অবস্থায় কালযাপন করিয়া থাকে, ধীরেন্দ্রনাথ ঠিক্ সেই অবস্থায় রহিল। এইরূপে পাঁচ ছয় মাস অতীত হইয়া গেল।

এক দিন জগদীশপ্রসাদ সন্ধ্যার পর গৃহমধ্যে বসিয়া সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে ধীরেন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বসিল। জগদীশ-প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহার করিয়াছ ?"

ধীরেন্দ্র অধোমুখে যেন কি ভাবিতে ভাবিতে উত্তর দিল, "আজ্ঞা করিয়াছি।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "অমন করিয়া বলিলে কেন ?—কেহ কি তোমায় কিছু কষ্টকর কথা বলিয়াছে ?"

ধীরেন্দ্র।—"না।" এই বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মোচন করিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাইয়া, তাহার পৃষ্ঠে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন ?—বল না কি হইয়াছে ?"

ধীরেন্দ্র।—"আপনি কি অনুসন্ধান পাইয়াছেন ?"

জগদীশপ্রসাদের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইল। তিনি রামায়ণের পুথি বন্ধ করিলেন। কহিলেন, "ধীরেন্! আজিও কি তুমি ভুলিতে পার নাই ?"

ধীরেন্দ্র কোন উত্তর করিল না।

জগদীশপ্রসাদ আবার বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আগামী কল্য নবদ্বীপে ও সপ্তগ্রামে দুই জন লোক প্রেরণ করিব। তুমি আর ভাবিও না। যাও শয়ন কর গিয়ে।" ধীরেন্দ্র বালক, শয়ন করিলেই নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সে আর চিন্তা করিবে না, এই ভাবিয়াই তিনি তাহাকে শয়ন করিতে যাইতে বলিলেন।

ধীরেন্দ্র ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিন্তু জগদীশপ্রসাদ আর পুথি খুলিলেন না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের পিতা মাতা ও ভ্রাতার অনুসন্ধানের জন্য নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তখন তিনিও শয়ন করিতে গেলেন।

এ দিকে জগদীশপ্রসাদের শয়নগৃহে জাহ্নবী দেবী ও জগদীশপ্রসাদের বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী বসিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কথা কহিতেছিলেন। এই বিধবা স্ত্রীলোকটির নাম অম্বিকা। জাহ্নবী দেবী অম্বিকাকে বলিলেন, "হ্যা দেখ, ঠাকুরঝি! ছেলেটি বড় শান্ত ও বুদ্ধিমান। সর্ব্বদাই আমাকে ভক্তি

করে। আমি ধীরেন্দ্রকে পুত্রের মত নিরীক্ষণ করি—পরপুত্র বলিয়া ক্ষণকালও ভাবি না। আর দেখ, এই পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে ছেলেটি কেমন লেখা পড়া শিখিয়াছে। অন্য বালক যাহা দশ মাসেও শিখিতে পারে না, ধীরেন্দ্র তাহা এই কএক মাসেই অভ্যস্থ করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ধীরেন্দ্র যেমন শান্ত, তেমনি বুদ্ধিমান্।"

অম্বিকা মনঃসংযোগ করিয়া জাহ্নবীর মুখনিঃসৃত ধীরেন্দ্র-প্রশংসা শুনিতেছিলেন, আর এক এক বার ভাবিতেছিলেন, ধীরেন্দ্র যদি তাহার পিতা মাতা ও অগ্রজকে না হারাইত, তবে এই সময়ের মধ্যে আরও লেখা পড়া শিখিতে সক্ষম হইত। তবু যা' হউক, এত চিন্তিত হইয়াও সে যেমন বিদ্যার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা মধুপুরের কোন্ বালক এই বয়সে পারিয়াছে?" অম্বিকা এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি জৃম্ভন ত্যাগ করিলেন। সেই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয়ে আপনা আপনি অনাহূত অশ্রুসঞ্চার হইল। তিনি দুই চক্ষে দুই হস্ত দিয়া শিথিল ঘর্ষণে উহা মোচন করিতে করিতে বলিলেন, "বৌ! তবে এখন আমি শয়ন করি গিয়ে। কাল আবার খুব সকালে উঠিতে হইবে।" এই বলিয়া অম্বিকা আপনার শয়নগৃহে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদ শয়নকক্ষে আসিলেন। জাহ্নবী তাঁহাকে দেখিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "আজ যে এত সকাল সকাল এলে? নিদ্রার প্রতি বুঝি দয়া জন্মিয়াছে? ভাল।"

"ও গো, তা নয়। ধীরেন্দ্রনাথের জন্ম ভাবনা জন্মিয়াছে।" এই বলিয়া সহধর্ম্মিণীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

জাহ্নবী শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি? ধীরেনের কি কোন অসুখ হইয়াছে? সে এই যে কিছু আগে আহার করিয়া তোমার কাছে গেল। এখন্ সে কোথায়?"

জগ। "শয়ন করিতে গিয়াছে। তাহার কোন অসুখ হয় নাই।"

জাহ্নবী। "তবে তোমার আবার কিসের জন্ম ভাবনা হ'ল?"

জগ।—"তাহারই ভাবনার জন্ম।"

জাহ্নবী।—"তাহার আবার কিসের ভাবনা? সে কি আমাদের নিকট থাকিয়া মনে মনে কষ্ট বোধ করে?"

জগ।—"তা' কি তুমি আজিও বুঝিতে পার নাই?"

জাহ্নবী।—"কই না। আমি অত তন্ন তন্ন করিয়া কিছুরই অনুসন্ধান করি না। সে কি তোমাকে তাহার কষ্টের কথা খুলিয়া বলিয়াছে?"

জগ।—"প্রায়ই ত বলে, কিন্তু আজ এই কতক্ষণ সে যে প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিল, তাহা দেখিয়া কে তাহাকে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত বলিতে পারে?"

জাহ্নবী।—"তুমি আমাকে তাহা বলিবে না কি?"

জগ।—"তোমাকে বলিব বলিয়াই ত আজ সকাল সকাল এখানে আসিলাম!" এই বলিয়া তিনি ক্ষণ কাল কি চিন্তা করিয়া নীরব রহিলেন। আবার বলিলেন, "হ্যা দেখ, ধীরেন্দ্র তাহার পিতা মাতা ও অগ্রজের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত এবং দুঃখিত। সে এত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সুখী নহে।"

জাহ্নবী এতক্ষণে জগদীশ বাবুর ভাবনার কারণ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "তবে তা'র এখন্ কি করিবে?"

জগ।—"কাল প্রাতে নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রামে দুই জন লোক পাঠাইব। একবার সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা উহার চিন্তা ক্রমশঃ উহাকে জীর্ণ শীর্ণ করিবে।"

স্বামীর এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া জাহ্নবী দেবীও চিন্তিত হইলেন। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বলিলেন, "যদি সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তুমি কি করিবে?"

জগ।—"ধীরেন্দ্রকে তাহার পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

জাহ্নবী।—"আর যদি না পাওয়া যায়।"

জগ।—"তা' হ'লে তাহাকে নিশ্চিন্ত করিব।—এক বার সন্ধান না করিলে তাহার চিন্তা দূর হইবে না; কারণ, সে ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে যে, অনুসন্ধানে তাহার পিতা মাতার খবর পাওয়া যাইবে। কাজেই আমাকে তাহা না করিলে, কার্য্যটা ভাল দেখায় না।"

"তবে তাহাই করা উচিত হইতেছে।" জাহ্নবী দেবী এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ উভয়েই ধীরেন্দ্রের চিন্তায় চিন্তিত থাকিয়া ক্রমে নিদ্রিত হইলেন। তখন সকল চিন্তাই বিলীন হইল।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী ও বাটীস্থ সকলেই জাগরিত হইলেন। সে দিন প্রভাতে জগদীশ প্রসাদ আর বায়ু সেবনার্থ নন্দনকাননে গেলেন না। প্রাতঃক্রিয়া সমুদয় সম্পাদন করিয়া একখানি অঙ্গমার্জ্জনীতে মুখ মুছিতে মুছিতে একবারে বৈঠকখানায় আসিলেন।

আসিয়া জমাদারকে ডাকিলেন। জমাদার উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিল।

জগদীশ বলিলেন, "জয়মঙ্গল তেওয়ারী! তুমি হারাধন দত্ত ও কালিদাস ঘোষালকে শীঘ্র এখানে ডাকিয়া আন।" এই দুই ব্যক্তি জগদীশপ্রসাদের বিশ্বাসী সরকার।

জমাদার শিরোনমন করিয়া প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জয়মঙ্গল তেওয়ারী হারাধন ও কালিদাসকে লইয়া বৈঠকখানায় পুনর্ব্বার আসিল।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "দেখ, হারাধন! কালিদাস! তোমরা অদ্যই সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লও। বিশেষ কার্য্য পড়িয়াছে। তোমরা দুই জন না হইলে উহা সংসাধিত হইতে পারিবে না।"

হারাধন।—"কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন্।"

জগ।—"তোমাকে নবদ্বীপে আর কালিদাসকে সপ্তগ্রামে যাইতে হইবে।"

হারা।—"কি প্রয়োজনে, মহাশয়?"

তখন জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় আদ্যোপান্ত বিশেষ করিয়া বলিলেন। হারাধন দত্ত ও কালিদাস ঘোষাল সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল, "অদ্যই কি যাইতে হইবে?"

জগ।—"নিশ্চই।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "দেখ, অনুসন্ধানের যেন তিলমাত্রও ত্রুটি না হয়। গোলোকনাথ বা তাঁহার সহধর্ম্মিণী তারাসুন্দরী দেবী কিংবা জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে কোন একজনেরও সন্ধান লইয়া

আসিবে। সন্তোষকর সংবাদ দিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিব।"

হারা।—"আমরা সাধ্যসত্ত্বে কিছুই ত্রুটি করিব না। আপনি প্রভু, আপনার আদেশ পালনে কখন কোনরূপ ত্রুটি বা ছল করি নাই, পরেও করিব না।"

কালিদাস ঘোষাল জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আমাদের সঙ্গে কি আর কোন লোক জন যাইবে?"

জগ।—"যদি ইচ্ছা কর, তবে দুই জনে দুই জন দ্বারবান্ ও দুই জন ভৃত্য লইয়া যাইতে পার। আর দেখ, দেওয়ানজীর নিকট হইতে তোমাদের গমনাগমনের পাথেয় লইয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি আবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

তখন দুই জন সরকার জগদীশপ্রসাদকে অভিবাদনাদি করিয়া বৈঠকখানা হইতে নির্গত হইল। অনন্তর স্নানাহার শেষ করিয়া হারাধন দত্ত নবদ্বীপ ও কালিদাস ঘোষাল সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে এক জন দ্বারবান্ ও এক জন ভৃত্যও চলিল।

এ দিকে জগদীশ বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে এক একবার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ কেশ-গুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন, আবার কখন কখন উভয় হস্তে শিথিল-মুষ্টি আবদ্ধ করিয়া মুখাগ্রে রাখিয়া ফুৎকার দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগলের দৃষ্টি এক একবার কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া এক পদার্থের উপর পতিত রহিল। আবার এক একবার তিনি নেত্র নিমীলন করিয়া বামহস্তে বামগণ্ড রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপে দক্ষিণ পদে অঙ্গুলি গুলি আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কে বলিবে যে, তিনি নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? এই সকল লক্ষণ যে চিন্তার কারণ, তাহা আমরাও জানি।

এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল। "মহাশয়! নাহিবার জল তুলা হ'য়েছে।"

জগদীশপ্রসাদ তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতেছিলেন, ভৃত্যের কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবার কিয়ৎক্ষণ পর উত্তর করিলেন, "যাইতেছি।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। তাহার পর তিনিও স্নানগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু চিন্তা তাঁহাকে ছাড়িল না। এ চিন্তা কিসের, তাহা আর পাঠককে বলিতে হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধানের ফল।

যথা সময়ে হারাধন দত্ত নবদ্বীপে এবং কালিদাস ঘোষাল সপ্তগ্রামে পহুঁছিল। জগদীশপ্রসাদ যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা তত্তাবৎ প্রতিপালন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক দিনে কোন সন্ধান মিলিল না বলিয়া, উভয়ে বাসা গ্রহণ করিল।

অনন্তর উভয়ে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোনরূপ শুভজনক সংবাদ পাইল না। ক্রমে পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করিয়া দুই জনেই মধুপুরে প্রত্যাগত হইল। প্রথমে হারাধন দত্ত, তাহার পর কএক দিন বাদে কালিদাস ঘোষাল জগদীশপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইল।

হারাধন আসিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তিন জনের মধ্যে এক জনকেও দেখিতে পাইলাম না। সেখানকার লোকেরা আমাকে বলিল যে, "গোলকনাথ এখানে ছিলেন। তিনি এক জন গণ্য মান্য ধনী ব্যক্তি। কিন্তু আমরা তাঁহাকে পাঁচ ছয় মাস হইতে দেখিতে পাইতেছি না। তিনি যে সপরিবারে কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। তাঁহার অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তাহাও যে কি হইল, বলিতে পারি না। এখানে মুসলমানেরা আসিয়া প্রথমতঃ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই দেশত্যাগী, ধনত্যাগী ও প্রাণত্যাগী হইতে হইয়াছে। আমরা জানিয়াছি গোলোকনাথ তাহাদেরই অত্যাচারে পীড়িত হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে নিহত করিয়াছে, কি

তিনি এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না, তবে ইহাও জানি যে, তিনি তাহাদেরই অত্যাচারে নবদ্বীপে নাই।”

হারাধন এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল। জগদীশপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি গোলোকনাথ পরিত্যক্ত বাস্তবাটী দেখিয়া আসিয়াছ?”

হারা।—“আজ্ঞে, দেখিয়াছি। তাঁহার অট্টালিকা দেখিয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই এক জন বিশিষ্টরূপ ধনী বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আর কি বলিব, এক্ষণে সেই হিন্দুগৃহে মুসলমানেরা বাস করিতেছে। গোলোকনাথের বিষয় সম্পত্তির অধিকাংশই সেই অট্টালিকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহা সেই অট্টালিকাবাসী যবনেরা ভোগ করিতেছে।”

হারাধনের প্রমুখাৎ জগদীশপ্রসাদ এই সকল দুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “জগদীশ্বর! তোমার ইচ্ছা মানুষিক ইচ্ছার অতীত। তুমি যে কাহাকে কিরূপ কর, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের কি শক্তি বুঝিতে পারে? আর তোমার সৃষ্ট অদৃষ্টচক্র যে কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পলকে পলকে নূতন নূতন গতিতে ঘুরিতেছে, তাহাও মানবী চিন্তার অজ্ঞেয়। দেব! তোমাকে এই কএকটি কথা বলিতে আমার যতটুকু সময় লাগিল, এই সময়ের মধ্যেই তোমার অসীম বিশ্বরাজ্যের কত স্থানে কত কি ঘটিয়া গেল। ইহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প হয়। বিশ্বপতি! তোমারই চক্রে—অনাথ বালক ধীরেন্দ্রনাথের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আহা, সে শিশু, কিছুই জানে না। এই অল্প বয়স হইতেই তাহার ভাগ্যচক্রের এই মহাপরিবর্ত্তন, না জানি ভবিষ্যতে আরও কি হইবে। জগদীশ্বর! তুমিই একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জীবের সমস্তই জান। তোমার ইচ্ছা, কার্য্য, বিবেচনা মানুষে কি বুঝিবে?” অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই কথা গুলি বলিয়া জগদীশপ্রসাদ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

হারাধন বলিল, “যদি মহাশয়ের আদেশ হয়, তবে এক্ষণে গৃহে গমন করি।”

জগদীশপ্রসাদ তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। সেও প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে ধীরেন্দ্রনাথের ভাবনায় অত্যন্ত অস্থির হইলেন আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না—অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কিছু দিন গত হইল। কালিদাস ঘোষাল মধুপুরে ফিরিয়া আসিল। জগদীশপ্রসাদের একটি শেষ আশা ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইল। কালিদাস জগদীশপ্রসাদকে বলিল, "বাবু মহাশয়! সপ্তগ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা বলিলেন গোলোকনাথ শর্ম্মা সেখানে যান নাই। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, গোলোকনাথ তাঁহার পিতার সহিত শৈশবকালে এখানে দুই তিন বার আসিয়াছিলেন, তাহার পর আর আসেন নাই।"

জগদীশপ্রসাদ নীরব হইয়া এই কএকটি বাক্য শুনিলেন। তাহার পর বলিলেন, "সেই সপ্তগ্রামবাসী বৃদ্ধেরা তোমাকে আর কি বলিলেন? আর তুমিই বা তাঁহাদিগকে কি বলিলে?"

কালিদাস বলিল, "তাঁহারা গোলোকনাথের অপর যে সব কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহাকে এক জন ভাল ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হইল। আমি আর কিছু বলি নাই।"

জগ।—"তিনি যে সপরিবারে নৌকামগ্ন হন, সে কথা তাঁহাদের কাছে উত্থাপন করিয়াছিলে?"

কালি।—"আজ্ঞে না।"

জগদীশ।—"ভালই করিয়াছ; কারণ, দুঃখের কথা তাঁহাদিগকে শুনান কর্ত্তব্য নহে। যদি তাঁহাদিগের মধ্যে গোলোকনাথ শর্ম্মার কেহ আত্মীয় থাকিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত।" অনন্তর জগদীশ-প্রসাদ কালিদাসকে বিদায় দিলেন।

মনুষ্য আশার দাস—মনুষ্যের মন আশার প্রসাদভিক্ষুক আর তাহার জীবন আশার অধীন। মানুষ সমস্তই ভুলিতে পারে, কিন্তু আশাকে ভুলিতে পারে না। সে যে দিন আশাকে ভুলিবে, সে দিন সে আপনাকেও ভুলিবে। তখন সে জীবিত থাকিয়াও মৃতপ্রায় হইবে। জগদীশপ্রসাদেরও তাহাই ঘটিল।—তিনি প্রথম কুসংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষসংবাদটি ভাল হইবে বলিয়া কতকটা সুস্থির ছিলেন; আশাকে

ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছিলেন। কিন্তু মায়াময়ী আশা তাঁহাকে ছলনা করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার আশার্চ্চনা পণ্ড হইল। তখন তিনি অধিকতর চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, "ধীরেন্দ্রকে কি বলিব—কি বলিয়া বুঝাইব?" আবার ভাবিলেন, "সজ্ঞানে কখন মিথ্যা কথা কহি নাই, অদ্য তাহাই কহিব। ধীরেন্দ্রকে মিথ্যা কথায় প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিব। এরূপ মিথ্যা কথায় আমার পাপ হইবে না বোধ হয়।" আবার ভাবিলেন, "না—তাহা বলিব না; বলিলে কি হইবে? প্রকৃত কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রকে বুঝাইব। ধীরেন্দ্র ত এখন আর একেবারে শিশু নহে, বুঝাইলে বুঝিতে পারিবে। আমি তাহাকে আপনার পুত্রের মত দেখি। আমি যত দিন বাঁচিব, তত দিন তাহাকে ত্যাগ করিব না।"

জগদীশপ্রসাদ কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ ভাবিলেন। তাহার পর আরও কত কি ভাবিলেন, এমন সময়ে এক জন ভৃত্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়! আপনার কাছে ধীরেন্দ্রনাথ আসিতে চাহিতেছেন।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "এখানে আর আসিতে হইবে না। তাহাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে বল্। আমিও যাইতেছি।

ভৃত্য প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদও অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সান্ত্বনা।

"কি করিব, বাপু! আমি ত সন্ধান করিবার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় আর তোমার দুরদৃষ্টক্রমে তিন জনের মধ্যে কাহারই কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।" জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রকে এই বলিয়া তাহার কেশগুলি অঙ্গুলি দিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্র জগদীশপ্রসাদের মুখে এই নির্ঘাত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইল। তাহার অন্তরনিহিত আশা অলক্ষ্যে কোথায় চলিয়া গেল।

সে যাইবার সময় একাকিনী গেল না, ধীরেন্দ্রনাথের যে কয়টি ভাল জিনিষ; তাহাও লইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রকে যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে আর সেরূপ দেখি না। ধীরেন্দ্র অন্তরে ও বাহিরে আর একরূপ হইয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডলের আর সৌন্দর্য্য নাই—অন্তরে আলোক নাই—হৃদয়ে আনন্দ নাই। সকলই ঘুচিয়া গেল।—তাহার নয়ন ছলছল করিয়া উঠিল—দুই একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ তাহার এই অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। আপনি তাহার নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দিয়া কহিলেন,—

"বাবা! কাঁদিলে কি হইবে? তুমি ত নিতান্ত শিশু নও—কতক বুঝিতে সুঝিতে পার, তবে কেন ভাবিতেছ? মানুষের অবস্থা চিরকাল কি সমান যায়? তোমার অপেক্ষা কত লোকের কত বিপদ ঘটে। তারাও ত সময়ে সময়ে ধৈর্য্য ধারণ করে। তবে তুমি কেন আর এত অধীর হইতেছ? আমি তোমাকে আপনার পুত্রের মত ভালবাসি। তোমার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা তাহাই করিয়া থাকি। তুমি তোমার পিতামাতার কাছে যেরূপ আদরে ছিলে, আমাদের কাছে কি তাহার অপেক্ষা অল্প সুখ-সচ্ছন্দতায় আছ?"

ধীরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, "না, মহাশয়! আমি এখন আপনার কাছে খুব সুখে আছি। আপনি যে এই অনাথকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, আমি তাহা ভালরূপে জানি। আর আপনি আমাকে আশ্রয় না দিলে, আমি এত দিন জীবিত থাকিতাম কি না সন্দেহ।" এই বলিয়া অশ্রুমোচন করিল।

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তবে তুমি সর্ব্বদা এত বিষণ্ণ হইয়া থাক কেন? বিশেষতঃ অদ্য তোমাকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে একটি দিনও এরূপ দেখি নাই।"

ধীরেন্দ্র বলিল, "আজ আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সুস্থির হইতে পারিতেছি না।"

জগদীশপ্রসাদ এই কএকটি কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "ধীরেন্দ্র এখনো বালক, ইহার বুদ্ধিশক্তি এখনও অপক্ব, সুতরাং পিতামাতার শোকে

যে অত্যন্ত কাতর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিছু দিন পরে অবশ্য ইহার এই শোক অনেক লাঘব হইয়া যাইবে। প্রথমাবস্থায় শোক যতদূর পরাক্রম প্রকাশ করে, শেষাবস্থায় আর তাহা ততদূর করিতে পারে না। শোক যদি বরাবর সমান ভাবে মানবহৃদয়কে নিপীড়িত করিত, তাহা হইলে এত দিন পৃথিবীতে এত লোক জীবিত থাকিত না। সকলেরই উৎপত্তি ও নিবৃত্তি আছে।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রকে আর কিছু বলিলেন না।

এমন সময়ে সেই গৃহমধ্যে জাহ্নবী দেবী আসিলেন। ধীরেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "মা! তোমাকে আর গঙ্গার দেবীর পূজা দিতে হইল না।—আমার পিতা মাতার আর দাদার কোন সুখবর পাওয়া গেল না। মা! তাঁহাদের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই মা!" এই বলিয়াই জগদীশপ্রসাদের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া গেল।

জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী অতিশয় শশব্যস্ত হইলেন।

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "বাবা ধীরেন্! এত অধীর হইলে কি হইবে, বাবা? শান্ত হও, এখন না হইল, এর পরেও ত সুখবর পাওয়া যাইতে পারে। ভয় কি, কিসের দুঃখ? তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা জীবিত আছেন। তুমি আর শোক দুঃখ করিও না—সুস্থির হও।" এই বলিয়া তিনি স্বামিক্রোড়পতিত শোকার্ত্ত ধীরেন্দ্রকে আপনার ক্রোড়ে লইলেন।

জগদীশপ্রসাদও তাহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্র আর কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না, কেবল নেত্রজলে তাহার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখ শোক অপরে কি কখন সমান ভাবে বুঝিতে পারিবে? কখনই না। সে আপনিই তাহা বুঝিতেছে বলিয়া এত কাঁদিতেছে।

অনন্তর তাহাকে লইয়া জাহ্নবী দেবী ও জগদীশপ্রসাদ সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালচক্র।

আমরা জানি, শকট-চক্রে পতিত হইলে জীব পেষিত হইয়া মরিয়া যায়, কিন্তু কালচক্রের কার্য্য অন্যরূপ।—কালচক্র প্রতি আবর্ত্তনে শত শত জীবকে পেষণ করিয়া যেমন নিধন করে, সেইরূপ আবার শত শত প্রাণীকে উৎপন্নও করিয়া থাকে। অনেকেই কালচক্রের আবর্ত্তনকে কেবল দুঃখের কারণ বলিয়া জানে, কিন্তু আমরা ইহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই বীজ বলিয়া বিশ্বাস করি। এই স্থলে আমরা কালচক্রের একবার স্তব করিব। পাঠক-বর্গের কর্ণে উহা ভাল না লাগিলেও, ক্ষমা করিবেন। কেন না, আমাদের বিবেচনায় মনুষ্যের স্তব করা অপেক্ষা কালচক্রেরই বন্দনা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। তবে এক্ষণে কালচক্রের স্তব আরম্ভ করা যাউক্;—

হে অনিবার্য্যগতিশীল অখণ্ড প্রতাপ কালচক্র!—তোমাকে নমস্কার। তোমার একদিবরাত্রিক গতির নাম সংক্রমণ—তিন শত পঞ্চষষ্টি দিবস ষষ্ঠ ঘটিকাপরিমিত অর্থাৎ একবার্ষিক সংক্রমণের নাম আবর্ত্তন—আর শতবাৎ-সরিক আর্ত্তনের নাম মহা-আবর্ত্তন। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে চিরভ্রমণকারিন্! কাহার এমন ক্ষমতা আছে যে, তোমার সহিত সমান ভাবে সমান পরাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারে? তোমার গতিরোধ করিতে পারে, এমন কেহই আজিও জন্মগ্রহণ করে নাই। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে মহাগতিশালিন্ চক্রবর! আমরা সৌরজগতের অন্তর্গত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির গতি দেখিতে পাই। এমন্ কি মানবজাতির নির-বয়ব মনের গতিও প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু তোমার অলক্ষ্য গতির প্রতি আমাদের লক্ষ্য হয় না। সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রগণ এবং মনুষ্যদিগের মন তোমারই গতিবলে আঘাতিত হইয়া গতিশিক্ষা করিয়া থাকে। তুমি অগতির গতি। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে চক্রেশ্বর! যখন তুমি ধাবন-ব্যায়ামে চিত্তসংযোগ কর, তখন ঘূর্ণন-ঘর্ঘর-শব্দে জড়-প্রকৃতি জাগরিত হইয়া উঠে। সূর্য্য সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিকে ছুটিয়া যায়—চন্দ্র একপক্ষকাল দেখা দিয়া আর একপক্ষ লুক্কায়িত থাকিতে চেষ্টা করে—অন্যান্য গ্রহগণ আত্মগোপন করিবার জন্য যেন ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া সুনীল নভোগর্ভে মিশাইতে চেষ্টা করে—মহাসাগর উত্তালতরঙ্গমালা উত্তোলন করিয়া গর্জ্জন করে—উর্দ্ধচূড় শৈলশ্রেণী নদীরূপ জলরাশি উদ্গার করে—সুবিশাল শ্যামবসনা মেদিনী কাঁপিয়া উঠে। অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে মহাচক্র! তোমারই কৌশলে "সেই এক দিন আর এই এক দিন" এই বিচিত্র পদটির সৃষ্টি হইয়াছে। এই পদের অভ্যন্তরে তোমার ভ্রমণশীল পদ কত বিপদ, আপদ, সম্পদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিয়াছে—করিতেছে ও করিবে, তাহা কে বলিতে পারে?—যখন ভারত স্বাধীন ছিল, তখন "সেই একদিন" আর এখন ভারত হইয়াছে, "এই একদিন"। যখন ভারত-সন্তান-গণ শক্রমুণ্ড লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিত, তখন "সেই একদিন", আর এখন তাহারা সেই শক্রপদে স্ব স্ব মুণ্ড স্থাপন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছে,—"এই একদিন"। যখন ভারতীয়েরা সুরাকে বিষবিষ্ঠাসম জ্ঞান করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিত, তখন "সেই একদিন", আর এখন তাহারা উহাকে সুধাজ্ঞানে গলাধঃকরণ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে,—"এই একদিন"। যখন 'এই কার্য্য করিও না, ইহাতে পাপ হইবে' এইরূপ মূলবিধির উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন "সেই একদিন", আর এখন সেই মূলবিধির স্থলে 'এই কার্য্য করাই উচিত, নহিলে পাপ হইবে', সুতরাং "এই একদিন"। যখন সরস্বতী নদীতটস্থ অরণ্যে বৈদিক মহর্ষিগণ শুদ্ধচিত্ত হইয়া যাগযজ্ঞ সাধন করিতেন, তখন "সেই একদিন", আর এখন বিহার-উদ্যানের সরোবর-তট-শোভিত "ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে, মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিত-কুঞ্জকুটীরে" মহাপুরুষগণ রমণীমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া সুরা সেবনে অধঃপতন সাধন করিতেছে,—"এই একদিন"। যখন পিতৃবৈরনির্য্যাতনের আশায় অসীম বিক্রমশালী মহারাজ সগর ম্লেচ্ছগণের মস্তক মুণ্ডন প্রভৃতি অবমাননাসূচক শাস্তি প্রদান করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগকে দূরীভূত

করিয়াছিলেন, তখন "সেই এক দিন", আর এখন সেই অপদস্থ ম্লেচ্ছকুলের পাদনিহিত চর্ম্মপাদুকার ধূলি ঝাড়িয়া ভারতবর্ষীয়েরা জীবন সার্থক করিতেছে, সুতরাং "এই এক দিন।" হে মহাচক্র! তোমার কৌশলচক্রে আরও যে এইরূপ কত "সেই এক দিন আর এই এক দিন" বাহির হইয়া পড়ে, অনন্ত আকাশের নক্ষত্রসমূহ, মহাসমুদ্রের বালুকারাশি ও সমুদয় জীবের লোমরন্ধ্ররাজি গণনা করিয়া একত্র সমষ্টি করিলেও তাহার সংখ্যা হয় না। ধন্য তুমি ও ধন্য তোমার অদ্ভুত লীলা। অতএব তোমাকে নমস্কার।

পাঠক, এই অনন্তগমনশীল কালচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক দিন, দুই দিন করিয়া ত্রিশ দিনে এক মাস—এক মাস দুই মাস করিয়া বার মাসে এক বৎসর উল্টাইয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না—কেবল কালচক্রের মহাপরিধির কতকটা আকার বৃদ্ধি করিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া—অলক্ষ্যে থাকিয়া—অলক্ষ্যে কোথায় মিশাইয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে কত কি ভালমন্দ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা এই এক বৎরের মধ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর যত নিমেষপাত হইয়াছে, তদপেক্ষাও সংখ্যায় বহুগুণ হইবে। এই এক বৎসরের মধ্যে কেহ প্রতিনিশ্বাসপাতে কাঁদিয়াছে, আবার কেহ হাসিয়াছে—কেহ প্রাণাধিক পুত্র কন্যা হারাইয়াছে, আবার কেহ লাভ করিয়াছে—কাহার ভাগ্যে পত্নী লাভ হইয়াছে—কেহ সংসারশূন্য হইয়াছে—কেহ খুন করিয়াছে—কেহ খুন হইয়াছে—কেহ কাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইয়াছে—কেহ যথাসর্ব্বস্বলুণ্ঠিত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে—কাহারও ভাগ্যে একাদশ বৃহস্পতি হইয়াছে, আবার কাহারও অদৃষ্টে রন্ধ্রগত শনি অত্যাচার করিয়াছে। ফলকথা এই এক বৎসরে ভালমন্দ—পাপপুণ্য—ধর্ম্মাধর্ম্ম—হিতাহিত—ক্ষতিলাভ সমস্তই ঘটিয়াছে।—বাকী কিছুই নাই, যদি থকে, তবে তাহা কিছুই নহে—শূন্য। এইরূপে এইরূপ অসংখ্য ঘটনা-সমষ্টির উপর দিয়া তিন শত পঞ্চষষ্টি দিনের একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া আরও দশটি বৎসর চলিয়া গেল।

এত দিন পরে ধীরেন্দ্রনাথ চতুর্ব্বিংশ, কিরণময়ী পঞ্চদশ এবং হিরণ্ময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের হইলেন। সুতরাং উল্লিখিত কালচক্রের আবর্ত্তনে ইহাঁদিগের শরীরের ও মনের অনেক পদার্থ ও বৃত্তিরও আবর্ত্তন পরিবর্ত্তন ঘটিল।

জগদীশপ্রসাদের সময়ে যদি এ দেশে রসায়নচিত্রের অর্থাৎ ফটোগ্রাফের প্রথা থাকিত, তাহা হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে এই সমস্ত আবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের কথা এক জনকে অপর জন বুঝাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইবার নহে। সুতরাং কতকগুলি কথা খরচ করিয়া প্রথমতঃ ধীরেন্দ্রনাথের কথা পাড়িতে হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ এক্ষণে যুবা। এখন তাঁহার নূতন অবস্থা। শৈশবকালের খেলাধূলা, আহার ও শয়নপ্রণালী প্রভৃতি প্রায় সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। এখন নূতন শরীর--নূতন জীবন—নূতন প্রাণ—নূতন মন—নূতন কার্য্য এবং নূতন ইচ্ছা বা সখ্। এখন আর সে গুলিডাণ্ডা—কপাটী—চোর চোর—ছুটাছুটি—হুটাহুটি কিছুই নাই। তবে কি আছে?—আছে শতরঞ্চ—পাশা—বাঘছাগল ইত্যাদি। আর ধূলামাখা কাপড়ের বদলে পরিষ্কার কাপড়—'যা' পাই, তা'ই খাই'র বদলে দুই সন্ধ্যা নিয়মিত আহার এবং বিকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ—সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই গাঢ় নিদ্রার বদলে রাত্রি গাঢ় হইলে অপ্রগাঢ় নিদ্রা—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থানের বদলে সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে শয্যাপরিত্যাগ। তখন সঙ্গীত শিখিতে ইচ্ছা থাকিলেও অনবরত বিদ্যাভ্যাসেই লিপ্ত থাকিতে হইত, এখন সঙ্গীতবিদ্যা ও লেখাপড়ার বিদ্যা উভয়েরই অভ্যাস হইয়া থাকে, তবে লেখাপড়া অপেক্ষা সঙ্গীতের সঙ্গে সম্বন্ধটাই অধিক। বোধ হয় বকেয়া বাকীটা পূরাইবার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকিবে। তখন যে ধীরেন্দ্রের অপক্ক নাসারন্ধ্রে ছিদ্র করিয়া তাঁহার পিতা একটি নোলক দুলাইয়া দিয়াছিলেন,এখন সে ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নে ও ওষ্ঠের উপরে কৃত্রিম ভূষণের পরিবর্ত্তে অন্যতম স্বভাবসিদ্ধ প্রধান অলঙ্কার শোভিত হইয়াছে—উহার নাম, পাঠক বুঝিয়া লও। ধীরেন্দ্র শ্মশ্রু ধারণ করিতে ভালবাসেন না বলিয়া প্রতি সপ্তাহে ক্ষৌরকারকে দিয়া উহাকে বিদায় করেন। ধীরেন্দ্রের সেই চক্ষু এখনও সেই, তবে কিনা কিছু বড় হইয়াছে, আর সেই বড়র সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে একটি নূতন জিনিষ আশ্রয় লাভ করিয়াছে, উহার নাম অপাঙ্গদৃষ্টি। ফলকথা ধীরেন্দ্রনাথ এখন যুবা।

পাঠক! তোমার নিকটে আমরা ধীরেন্দ্রনাথের যৌবনবৃত্তান্ত একপ্রকার

বলিলাম। সময়ে কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ীরও বিষয় বলিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে তুমি যেরূপ জান, সেইরূপ করিয়া মনে মনে বর্ণনা কর।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রস্তাব।

বেলা দ্বিপ্রহর। প্রকৃতির প্রথম মূর্ত্তির আর কিছুই নাই—এক্ষণে দ্বিতীয় মূর্ত্তি। আকাশ পরিষ্কার নীল। সূর্য্যদেব উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেই নীলিম গগনে তেজঃ প্রকাশ করিতেছেন। প্রাতঃকালে ইহাঁকে দেখিয়া যেরূপ আরাম লাভ হইয়াছিল, এখন্ তাহার ঠিক বিপরীত। এখন ইনি অস্তাচলে গেলেই বাঁচি। কেহ যে বরাবর এক অবস্থায় থাকিতে ভালবাসে না—তাহার সাক্ষী এই সূর্য্য। কোমলপ্রকৃতিও যে সময়ে উগ্র ও নীরস প্রকৃতির বশীভূত হয়, তাহারও সাক্ষী এই সূর্য্য। আর কাহারই অবস্থা যে চিরকাল সমান থাকে না, তাহার সাক্ষী এই মধ্যাহ্নপ্রকৃতি।

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে বলিয়া সকলেই একপ্রকার নিস্তব্ধ। চারি দিক্ রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পক্ষিরা ঝোপেঝাপে চুপেচাপে বসিয়া আছে। মাঠের মধ্যে গাভীগণ দলবদ্ধ হইয়া আর চরিতে চাহে না। যেখানে একটি বৃক্ষ দেখিতেছে, তাহারই মূলে আশ্রয় লইতেছে,—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ শুইয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছে। তাহাদের পরিচালক রাখাল বালকও পরিহিত মলিন বস্ত্রের এক দিক বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই—গান গায়িতেছে। গাভিদের কেহ কেহ এক একবার গুঁতা-গুঁতি করিতেছে—রাগে কি আমোদে, তাহা জানি না, কিন্তু রাখালবালক 'আরে মর—শালার গরু' বলিয়া স্তব করিতেছে। বৃক্ষের ছায়া যে জীবনের কিরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাহা এতক্ষণে পথিকেরা বুঝিয়াছে। জল যে কিরূপ মূল্যবান্ পদার্থ, তাহা তৃষাতুরের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

প্রত্যহ এই দ্বিপ্রহরের সময় জগদীশপ্রসাদ আহার করেন; এইজন্য তাঁহার ভোজনগৃহে একটি দামী একখানি বড় চতুষ্কোণবিশিষ্ট আসন

পাতিয়া তাহার নিকটে শ্বেত প্রস্তরের একটি চুম্‌কীতে কর্পূরবাসিত জল পূরিয়া রাখিল। তাহার পার্শ্বে একখণ্ড ক্ষুদ্র কদলীপত্রে কিঞ্চিৎ লবণ আর একখানি ক্ষুদ্র রৌপ-রেকাবীতে কতকটা উত্তম মাখন রাখিয়া দিল। এমন সময়ে পাচকব্রাহ্মণ একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত থালায় উত্তম অন্ন ও সাত আটটি বাটীতে নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজাইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনের সম্মুখে রক্ষা করিল। ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া রহিল, দাসী চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন পাচক ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদ আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিলেন। অনন্তর পঞ্চপ্রাণকে পঞ্চগ্রাস অর্পণ করিয়া আহার করিতে বসিলেন। জাহ্নবী পার্শ্বে বসিয়া একখানি তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে বীজন করিতে লাগিলেন।

আহার করিতে করিতে জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবী দেবীকে বলিলেন, "দেখ, আজ কয় দিন ধরিয়া তোমাকে একটি কথা বলিব বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু বলি নাই—আজ বলিব।"

জাহ্নবী বলিলেন, "বুঝিয়াছি, ব্যঞ্জন ভাল হইতেছে না।"

"তবে ত তুমি সকলই বুঝিয়াছ। জ্যোতিষশাস্ত্রটাও কি কণ্ঠস্থ করিয়াছ?" সাহস্যমুখে এই কএকটি কথা বলিয়া জগদীশ একগ্রাস অন্ন মুখে দিলেন।

জাহ্নবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন, তবে কি হইয়াছে? কি কথা বলিবে?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "কথাটা এই,—কিরণময়ী দেখিতে দেখিতে পনর বৎসরে পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহাকে একটি উপযুক্ত পাত্রের করস্থ করিতে হইতেছে। আর বৃথা সময়ক্ষেপ করা ভাল দেখায় না। এত দিন আমার মনের মত পাত্র পাই নাই বলিয়াই, কন্যার প্রতি পিতার এই কর্ত্তব্য কার্য্যটি করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

জাহ্নবী দেবী আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, আমার বড় সৌভাগ্য যে, আজ তোমার নিজের মুখ দিয়াই আপনা আপনি এই কথা নির্গত হইল। আমি আজ ক্রমাগত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া তোমার নিকট এই কথার প্রসঙ্গ

করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তুমি একটি দিনের জন্যও আমার সেই কথায় মনোযোগ দাও নাই। যখনই বলিয়াছি, তখনই 'না—না—এখন না' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছ। তাই বলিতেছি আমার বড় সৌভাগ্য।"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন,"তোমার সৌভাগ্যে আমারও সৌভাগ্য।"

জাহ্নবী বলিলেন, "আচ্ছা, সে যাহা হউক, এক্ষণে কোথায় পাত্র ঠিক করিলে? পাত্রটি ত দেখিতে বেস্ সুশ্রী, লেখাপড়া জানে ত? চরিত্র ভাল ত?"

জগদীশ বলিলেন, "হঁা।" এই বলিয়া আর এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিলেন।

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই দাসী একটি রূপার বড় বাটী পরিপূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ আনয়ন করিল। জাহ্নবী দেবী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া সেই বাটীটি লইলেন। দাসী আবার চলিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের পাত্রের দক্ষিণদিকে দুগ্ধপাত্র রক্ষিত হইল।

আবার উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিল।

জাহ্নবী বলিলেন,"পাত্রটি কোথাকার?"

জগদীশ বলিলেন, "বড় দূরের নয়—এই বাটীর।"

জাহ্নবী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ, এই বাটীর? নাম কি?"

জগদীশ বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ।"

"ধীরেন্দ্রনাথ?—আমাদের ধীরেন্দ্রনাথ?—তা বেস হইয়াছে।" এই বলিয়া জাহ্নবী দেবী কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "না, তুমি পরিহাস করিতেছ।"

জগদীশপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না—আমি পরিহাস করিতেছি না,—সত্যই বলিতেছি।"

জাহ্নবী দেবী অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ধীরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত মায়া মমতা জন্মিয়াছিল, এইজন্য তাঁহারও ইচ্ছা ছিল, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণময়ীর শুভ বিবাহ হয়। আজ স্বামীর মুখে সেই মনোগত কথাগুলি শুনিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। শশাঙ্ক যেমন চকোরীকে সুধা দান করে, সেইরূপ জগদীশপ্রসাদের মুখমণ্ডল জাহ্নবী দেবীকে যেন কি এক অপূর্ব্ব পদার্থ ঢালিয়া দিল। জাহ্নবীর সুখের আর অবধি রহিল না।

ভোজনব্যাপার সমাপ্ত হইল। জগদীশপ্রসাদ আচমন করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে গমনপূর্ব্বক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন। জাহ্নবী দেবীও অবিলম্বে একটি রূপার ডিপায় করিয়া চারিটি তাম্বূল তাঁহাকে দিলেন। অনন্তর উভয়ে উক্ত কথার প্রসঙ্গ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়সঞ্চার।

পাঠক! তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, নন্দনকানন ব্যতীত জগদীশ-প্রসাদের আরও একটি উদ্যান ছিল। সেটি তাঁহার অট্টালিকার উত্তরপার্শ্বে সংলগ্ন। তদীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা সেই উদ্যানে গিয়া পুষ্পচয়ন করিতেন। সেই উদ্যানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাহাতে স্নান করিতেন। উক্ত উদ্যানের পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমের দিকে দুই মানুষ প্রমাণ উচ্চ প্রাচীর, সুতরাং বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তরভাগ বা অভ্যন্তর ভাগ হইতে বহির্ভাগ দেখা যাইত না। তবে কেবল বহিঃপ্রদেশ হইতে উদ্যানের মধ্যস্থ বড় বড় বৃক্ষগুলির শীর্ষদেশ দেখা যাইত। কোন কোন উচ্চ বৃক্ষের দীর্ঘ শাখা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের বালক বালিকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঢেলা মারিয়া সেই সব শাখা হইতে ফল ভাঙ্গিয়া লইত।

সেই উদ্যানের মধ্যে এক দিকে তুলসীবন ও কএকটি বিল্ববৃক্ষ ছিল। বিধবা স্ত্রীলোকেরা তথা হইতে সাজী ভরিবার বিশেষ যোগাড় পাইত। অন্য দিকে অনেকগুলি ভাল ভাল ফুলের গাছ। তাহারই নিকটে স্বচ্ছ সরোবরটি সুশোভিত ছিল।

পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী ধীরেন্দ্রকে পর ভাবিতেন না। বাল্যকাল হইতে তাঁহারা তাঁহাকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবনাবস্থাতেও তাহার অণুমাত্র

অন্যরূপ ভাবেন নাই। তাঁহারা প্রথম দিন ধীরেন্দ্রকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, আজিও তাহাই।

ধীরেন্দ্রনাথ, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী এক এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই উদ্যানে বেড়াইতে যাইতেন। কেহ ফুল তুলিতেন—কেহ তাঁহার নিকট হইতে উহা লইতেন। কেহ মালা গাঁথিতেন—কেহ উহা গলদেশে ধারণ করিতেন। এই তিন জনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বড় ভাব জন্মিয়াছিল। তবে কি না, মুখের ভাবের সহিত মনের ভাব সকলের সমান হয় না। এই জন্য ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে মুখে মনে যেরূপ ভাল বাসিতেন, কিরণময়ীকে ঠিক সেইরূপ ভালবাসিতেন না। মনুষ্যের এইরূপই স্বভাব, সুতরাং কেন যে এমন হইয়াছিল, তাহা কি করিয়া বলিব? কিন্তু ধীরেন্দ্রের প্রতি হিরণ্ময়ীর মনে মুখে যেরূপ ভাব, কিরণময়ীরও ঠিক তাহাই। ইহাও মনুষ্যের স্বভাব, সুতরাং কেন যে এমন হইয়াছিল, তাহাই বা কি করিয়া বলিব?

কিরণময়ীর প্রতি ধীরেন্দ্রনাথের ভালবাসা লজ্জামিশ্রিত, কিন্তু হিরণ্ময়ীর প্রতি তাহা নহে। এইজন্য তিনি যখন কিরণের সঙ্গে কথা কহিতেন, তাহা একজাতীয়, আর যখন হিরণের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন, তাহা অন্যজাতীয়। যদিও তিনি উভয়ের সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে এক প্রকার কথা কহিতেন, তথাপি উহা ভিন্নতর হইয়া দাঁড়াইত।

ধীরেন্দ্র কিরণময়ীর নিকট সকল কথা ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না, কিন্তু হিরণ্ময়ীর কাছে বলিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী উভয়েই মনের কথা সমানভাবে ফুটিয়া বলিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রনাথ একাকী উক্ত উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে একগাছি ছড়ি ছিল। তিনি সেই ছড়িটি কখন সঞ্চালন, কখন ঘূর্ণন, কখন শ্যামল দূর্ব্বাদল ও পুষ্পতরুর উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এইরূপে কতক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুষ্করিণীর ঘাটের উপর আসিয়া উপবেশন করিলেন। দেখিলেন, কতকগুলি ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ মৎস্য চারি পাঁচ অঙ্গুলি জলের নিম্নে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতেছে। তিনি অনন্যমনে তাহাই দেখিতে লাগি-

লেন। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া কতকগুলি পাখী সেই পুষ্করিণীর উপর দিয়া নীড়াভিমুখে উড়িয়া গেল, আর অমনি ভয় পাইয়া সন্তরণশীল মৎস্য গুলিও জলের ভিতর ডুব দিল। ডুবিবার সময় জলে এক প্রকার অস্ফুট অথচ মধুর শব্দ হইল—আবার জল নড়িতেছে; কেন নড়িতেছে?—সান্ধ্য সমীরণের নীরব হিল্লোলে। সুধীর পবন ক্রমাগতই দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে যাইতেছে, আর ক্রমাগতই সরোবরের দক্ষিণ দিক হইতে একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীময় সুবিস্তৃত আস্তরণ উত্তর দিকে সরাইয়া দিতেছে। এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। উদ্যানটি সারাদিন নানা পক্ষীর নানা কথা শুনিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে আর শুনিতে পাইতেছে না। এক্ষণে পক্ষিকুলও নীরব—উদ্যানও নীরব। কেবল ধীরেন্দ্রনাথ এক একবার শিশ্ দিতেছেন—অনুচ্চস্বরে গান গায়িতেছেন—মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটি সোপানের উপর তালে তালে ঠুক ঠুক করিয়া ঠুকিতেছেন। এক জন হইতে তিন রকম শব্দ হইতেছে—এ শব্দ উদ্যানের পক্ষে বিরক্তিকর নহে—বড় মনোহর। ধীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বস্তুত মধুর বলিয়া ইহা উদ্যানের পক্ষে মনোহর,অধিকন্তু তাঁহার গান যে একবার শুনিয়াছে, সে আবার শুনিবার জন্য অনবকাশকে অবকাশ করিয়া লয়। বাগানের গায়েই বাড়ী, সুতরাং কোন গুরুজন গান শুনিতে পাইবেন, এই ভয়ে তিনি অনুচ্চস্বরে গায়িতেছিলেন। তবে কি তিনি কখন উচ্চকণ্ঠে গান গাহেন না?—গাহেন। কোথায়?—প্রিয়মাধবের বাড়ীতে। প্রিয়মাধব কে?—ধীরেন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধু। তিনিই এক্ষণে তাঁহার বাড়ীর কর্তা, সুতরাং তিনিও গাহেন, আর ইনিও গাহেন।

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল, কাজেই চাঁদের চাঁদনীও গাঢ় হইয়া উজ্জ্বল হইল। দিনেও বৃক্ষের ছায়া ছিল, এখনও তাহাই। তবে প্রভেদ এই,—দিনে ছায়া ভাল লাগিত—ছায়ার বাহিরে রৌদ্র ভাল লাগিত না; এখন ছায়া তত ভাল লাগে না, কিন্তু ছায়ার বাহিরে জ্যোৎস্না ভাল লাগে। এই জন্য ধীরেন্দ্রনাথ বৃক্ষছায়া-বিবর্জ্জিত পুষ্করিণীর সোপানের উপরেই বসিয়া রহিলেন। ধীরেন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে।—এই জন্য মৃদুমন্দ সমীরণ আপন মনে তাঁহার উত্তরীয় লইয়া খেলা করিতে লাগিল; জ্যোৎস্না তাঁহার সুন্দর

দেহে হাত বুলাইতে লাগিল; প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি তাঁহার নাসিকায় সুগন্ধ জোগাইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে।—সেই জন্য জগদীশ-প্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন; কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী ভালবাসার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। ফল কথা, ধীরেন্দ্রনাথ ভাগ্যবান্ যুবা।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতীত হইল, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথ সোপান ত্যাগ করিলেন না। এক্ষণে তিনি নীরব হইয়া বসিয়া আছেন।—দেখিলে বোধ হয়, যেন কিসের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন বলিয়া চিন্তার পরিচর্য্যা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এতদূর চিন্তামগ্ন হইলেন যে, বাহিরে কি কি ব্যাপার হই-তেছে, তাহা দেখিতে বা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে চক্ষু নিমীলন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হটাৎ কে একজন আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। ধীরেন্দ্রনাথের গাঢ়চিন্তা সরিয়া গেল—তিনি চমকিয়া উঠিলেন। "কে—কে" বলিয়া নিজহস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, তাহার হস্ত কোমল ও তাহাতে বলয় রহিয়াছে। অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিয়াছিল, কাজে কাজে তাহার হস্ত খুলিয়া গেল। সে অন্য উপায় না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের বস্ত্রে নিজের মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিল। ধীরেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখি-লেন,—হিরণ্ময়ী।

তখন তিনি বলিলেন "হিরণ্!"

হিরণ্ময়ী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "উহুঁ, কিরণ।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ, হিরণ! এ পরিহাসের স্থানও নহে—সময়ও নহে। তুমি এখানে এখন একাকিনী আসিয়াছ কেন?"

হিরণ্ময়ী হাসিতে হাসিতে মুখের কাপড় খুলিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে আছ বলিয়া।"

"আমি যেখানে থাকিব, সেইখানেই কি তোমাকেও থাকিতে হইবে? এমন সময়ে এমন স্থলে তোমার আসা ভাল হয় নাই। তুমি শীঘ্র গৃহে যাও।" ধীরেন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলিয়া, তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "ধীরেন্! আমি যাইব না।"

ধীরেন্দ্র বলিলেন, "যদি কেহ দেখিতে পায়, তবে কি বলিবে? বিশেষতঃ কিরণময়ী তোমাকে এক মুহূর্ত্তও চক্ষের অন্তরালে রাখেন না, যদি তিনিই তোমার অনুসন্ধানে এখানে আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনিই বা কি মনে করিবেন?

এই কথাগুলি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধীরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে নির্গত হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর কর্ণে তিক্তরস ঢালিয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন, "ধীরেন্! আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি। এই তবে আমি যাই।" এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন। আবার একবার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "ধীরেন্! তবে চলিলাম্।" এই বলিয়া গৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন, হিরণ্ময়ী বাস্তবিকই চলিয়া যাইতেছেন, তখন আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। দ্রুতগমনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইচ্ছা ধরিবার।

হিরণ্ময়ী যাইতে যাইতে এক একবার পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, এইবার যেমন চাহিলেন, আর অমনি দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ দ্রুতগমনে আসিতেছেন। তিনি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রমণীস্বভাবসুলভ দ্রুতগতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দৌড়িতে দৌড়িতে একটি কণ্টকিত কুসুমলতায় তাঁহার অঞ্চল বাঁধিয়া গেল—আটক পড়িলেন। কণ্টক হইতে অঞ্চল ছাড়াইতে ছাড়াইতে ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে সেই অঞ্চল ধৃত হইল।

তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী তীক্ষ্ণ পরিহাসের সহিত বলিলেন, "ছাড় ছাড়, শীঘ্র ছাড়—এখনি কেহ দেখিতে পাইবে—পাইলে কি বলিবে?—ছাড় ছাড়—আঁচল ছাড়।"

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "হিরণ! এত পরিহাস কোথায় শিখিলে? আচ্ছা সে যা হউক, তুমি যে আমাকে বলিয়া আসিলে "আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি।" কিন্তু আমি ত এ কথার কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে পারিলাম না। তুমি কি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবে? কেন এমন কথা

বলিলে? কখন ত তোমার মুখে এরূপ বাক্যের আভাসও পাই নাই।" এই বলিয়া আবার তিনি ব্যগ্রতাসহকারে বলিলেন, "হিরণ! আমার নিতান্ত অনুরোধ—আমি যোড়হাত করিয়া বলিতেছি, তুমি এই কথার মর্ম্মভেদ কর।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর হস্ত ধারণ করিলেন।

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না, কেবল অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে উদ্যানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কতকটা দূরে একটি মনুষ্যের ন্যায় কি দেখা দিল। হিরণ্ময়ীর দৃষ্টি ভূক্ষিপ্ত থাকাতে, তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি হিরণ্ময়ীর হস্ত পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহা আর তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। তিনি বিপদে পড়িলেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। দুই পদ অগ্রসর বা দুই পদ পশ্চাৎ যাইতে পারিলেন না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, প্রশ্নের উত্তর করেন নাই বলিয়া, ধীরেন্দ্র ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহার হস্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখন অবসর পাইয়া, কণ্টক হইতে অঞ্চল ছাড়াইয়া, হিরণ্ময়ী বরাবর গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন।

মনুষ্যের ন্যায় যাহাকে দেখিয়া ধীরেন্দ্র ভীত হইয়াছিলেন, তাহাকেও আর দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে হিরণ্ময়ী তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। আর তিনি যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেও কোথা লুক্কায়িত হইল, কি মিলাইয়া গেল,তাহারও কিছু ঠিকানা হইল না। তিনি আবার ঘাটে গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, আর বসিতে পারিলেন না। সরঃ-সোপানাবলির সর্ব্বোপরিস্থ চাতালের উপর উত্তরীয় বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। নেত্র নিমীলন করিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এতাদৃশ বিষম চিন্তায় নিপীড়িত দেখিয়া নিদ্রা যেন দুঃখিত হইলেন; তাই তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য নেত্রযুগলে স্বীয় সুকোমল ও চিন্তানিবারক হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে একখণ্ড বৃহৎ মেঘ আসিয়া চন্দ্রের উজ্জ্বল মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিল। বোধ হইল, শশধর যেন ধীরেন্দ্রনাথের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মেঘান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইলেন। পাছে নিদ্রিত যুবার চক্ষের উপর করজ্যোতিঃ পড়িয়া নিদ্রার ব্যঘাত ঘটে, সেই জন্যই যেন তিনি সেই বৃহদায়তন জলদ-খণ্ডকে টানিয়া আনিয়া আপনাকে ঢাকা দিলেন। অফুরন্ত ঔজ্জ্বল্য-ভাণ্ডার চন্দ্রমণ্ডলে মেঘাবরণ, সুতরাং উদ্যানের রজতাভ সুন্দর চিত্র কতকটা মলিন হইয়া গেল। তরল অন্ধকারে সরোবর-বারি, তরু লতা, ফোটা অফোটা ফুল, দূর্ব্বাদল, ভূভাগ প্রভৃতি সকলই ম্লান হইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় দূরের বস্তু আর তেমনতর দৃষ্টিগোচর হইল না।

পাঠক! ঐ দেখ, নিদ্রাভিভূত ধীরেন্দ্রনাথের শিয়রে কে আসিয়া বসিল—কোনরূপ সাড়াশব্দ হইল না। ও কে?—স্ত্রী কি পুরুষ? পুরুষ নহে, একটী যুবতী রমণী। যৌবনভারে কিছু ব্যগ্র হইয়াছে, বোধ হয়। তাই কি উহার চিক্কণ চিকুরজাল আলুলায়িত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে? তাই কি ও কবরীবন্ধন করিতে সময় পায় নাই? তাই কি উহার বক্ষোলম্বিত মুক্তা-মালা পৃষ্ঠলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে? তাই কি উহার বস্ত্রাঞ্চল আপৃষ্ঠ আবৃত না হইয়া গুচ্ছাকারে কণ্ঠদেশে জড়িত রহিয়াছে? হইতে পারে, জানি না। এই রমণী যে নবযৌবনের পথিক, তাহা মুখ দেখিলেই চেনা যায়। এখনও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যৌবন-তুলিকার সকল প্রকার রঙ প্রতিফলিত হয় নাই। কাহার সহিত ইহার মনোহর বদনকমলের তুলনা করিব? কিসের সহিত ইহার লাবণ্যের উপমা হইবে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। চাঁদ ত ঢাকা পড়িয়াছে।

এই নবযুবতী নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল। ভাসা-ভাসা চক্ষে নিদ্রিত ধীরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিল। কতবার দেখিল, কিন্তু আশা মিটিল না। যে মেঘখানা চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল। আবার উদ্যান পূর্ব্বের ন্যায় কৌমুদী-বিধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইল। নিদ্রিত যুবার মুখমণ্ডলও সেই সঙ্গে যেন বিমল হইয়া উঠিল। যুবতী আবার তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু এবারও আশা মিটিল না। অনন্তর কি ভাবিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, আবার

ধীরেন্দ্রনাথের পরিলক্ষিত মুখখানি দেখিতে লাগিল। গগন-চাঁদের সহিত এই চাঁদের সাদৃশ্য আছে কি না, যুবতী তাহাই দেখিবার জন্য কি উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল বা চাঁদকে পুনর্ব্বার মেঘান্তরালে থাকিবার নিমিত্ত চাহিল, তাহা কে বলিতে পারে?—সুতরাং আমরাও বলিতে পারি না। কে কি চক্ষে কাহাকে দেখে—কে কিরূপ উপমেয়ের জন্য কিরূপ উপমান খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা অন্যের পক্ষে জ্ঞাতব্য নহে।

যুবতী নিশ্বাস অবরোধ পূর্ব্বক নিদ্রিত যুবার মুখের কাছে মুখ অবনত করিয়া কি দেখিল। পাছে নিশ্বাস লাগিলে যুবার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাই যুবতী এই বুদ্ধি খাটাইয়া দেখিল। যুবতী কি জন্য যুবার শীর্ষদেশে উপবিষ্ট হইয়া এরূপ করিতে লাগিল? এরূপ অজ্ঞাত দর্শনের মর্ম্ম কি? এ যুবতী কে? এই যুবার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ?—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

যুবতী উপবিষ্ট হইয়া অবধি এখন পর্য্যন্তও যুবার গাত্রস্পর্শ করিল না। কি জানি স্পর্শ করিলে, পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে বা বিবেচনায়, বিনাস্পর্শে কেবল দর্শন করিতে লাগিল। এক এক বার ভাবিল, "আমি ধীরেন্দ্রনাথকে জাগাই।"—আবার ভাবিল, "না—জাগাইব না; জাগাইলে এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া—সাধ মিটাইয়া—চক্ষু জুড়াইয়া দেখিতে পাইব না।" এই ভাবিয়া আবার মনে মনে বলিল, "আহা, আমি কি সৌভাগ্যবতী, আজ আশানুরূপ মনোমুগ্ধকর চিত্র দর্শন করিতেছি।"

এক্ষণে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছে। চন্দ্রদেব পূর্ব্বাকাশে পর্য্যটন করিয়া পশ্চিমাকাশের সীমায় উপনীত হইলেন। অস্ত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই।

তখন যুবশির্ষবিরাজিনী বনদেবী-সদৃশা যুবতী আপনার অঞ্চল হইতে একখানি লিপি খুলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের ভূবিস্তৃত উত্তরীয়ের একটি কোণে আস্তে আস্তে বাঁধিয়া রাখিল। যুবতীর আগমনাবধি এখন পর্য্যন্ত কি কি হইল, ধীরেন্দ্র তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। যুবতী আর একবার নিমেষরহিত নয়নচকোরে নিদ্রিত যুবার মুখচন্দ্রের অনুপম সুধাপান করিয়া, আস্তে আস্তে তথা হইতে উঠিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার নিকট আসিবার সময় যে চরণভূষণ হস্তে করিয়া আসিয়াছিল, যাইবার সময় তাহা সেই খানে ভুলিয়া গেল।

যুবতী প্রস্থান করিল আর ও দিকে রজনীরঞ্জনও চলিয়া গেলেন। উদ্যানভূমি কিঞ্চিৎ আভামিশ্রিত অন্ধকারে ডুবিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রাভঙ্গ—লিপিপ্রাপ্তি।

যে উদ্যানের সরোবর-সোপান-চত্বানে ধীরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত ছিলেন, তাহার ঈশাণ কোণে একদল শৃগাল 'হুয়া হুয়া হুক্কা হুয়া' করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ধীরেন্দ্রনাথ সেই শব্দে জাগিয়া উঠিলেন। চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখিলেন, চারি দিক অন্ধকার;—উদ্যানের সেই জ্যোৎস্নালাঞ্ছিত শোভা নাই—আর এক প্রকার হইয়াছে। তিনি যেমন জাগিলেন, অমনি তাঁহার মনে সেই দৃষ্ট ব্যক্তির কথা পুনর্ব্বার উদিত হইল। যে দিকে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে আবার দেখিলেন; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি পূর্ব্বেই তাহাকে সরিয়া যাইতে দেখিয়া ছিলেন, তথাপি এক্ষণেও পুনর্ব্বার দেখিলেন। দেখিবার মর্ম্ম এই যে, যদি সে আবার সেখানে আসিয়া থাকে। কিন্তু অন্ধকার বাধা দিল।

অনন্তর তিনি পূর্ব্বব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে এক একটি করিয়া কএকটি সোপানে অবতরণ করিলেন। পুষ্করিণীর জল যে সোপানটিকে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি তাহার উপরিস্থ সোপান পর্য্যন্ত গমন করিয়া উবু হইয়া বসিলেন। সেই খানে বসিয়া মুখনেত্র প্রক্ষালন করিলেন। অনন্তর তথা হইতে চত্বালে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তরীয় খানি ঝাড়িয়া যেমন স্কন্ধোপরি রক্ষা করিবেন, অমনি তাঁহার হস্তে গ্রন্থিবদ্ধ একটা কি ঠেকিল। তিনি প্রথমতঃ কি-ত-কি ভাবিয়া, আবার উত্তরীয় খানি ঝাড়িলেন, কিন্তু উহা উত্তরীয়চ্যুত হইল না। তখন তিনি গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, একখানি লিপির মত কি রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন, বাস্তবিক একখানি লিপি। পড়িবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অন্ধকার শত্রু হইল।

পত্রখানি পাইয়া ধীরেন্দ্রনাথ অধিকতর চিন্তিত হইলেন। ব্যাপারখানা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এক বার ভাবিলেন, "আমি কি কোন পত্রিকা উত্তরীয়তে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম ?—কই না।" আবার ভাবিলেন, "হিরণ্ময়ী কি আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিবার পূর্ব্বে চুপি চুপি এই কার্য্য করিয়াছে ? তা' পত্রখানি না পড়িলে ত বুঝিতে পারিতেছি না। যাই হউক, এক্ষণে সকলে শুইয়াছে, আমি এই সময়ে গৃহে যাই। গিয়াই এই পত্রখানি পড়িয়া পরে অন্য কাজ।" এই বলিয়া যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি তাঁহার পদে কি ঠেকিয়া শব্দ হইল। তিনি ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। কটিদেশ বক্র করিয়া অবনত হইয়া দেখিলেন, কএকখানি অলঙ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইলেন। সূক্ষ্মস্পর্শন ও স্থূলদর্শন দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, সে গুলি কোন স্ত্রীলোকের পাদভূষণ। দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, "কে আমার নিকট এই কএকখানি গহনা ফেলিয়া বা রাখিয়া গিয়াছে ? কেন এমন হইল ? কেহ কি আমার শত্রুতা করিতেছে ?—হইতেও পারে—না হইতেও পারে। যাহার অলঙ্কার, সে কি এখন্ এখানে আছে ?—তাই বা কি করিয়া জানিব ?—অন্ধকারে এত বড় উদ্যানের কোন্ খানে কে আছে, তাই বা কি করিয়া ঠিক করিব ?" যুবা ক্ষণেক কাল ইতস্ততঃ করিয়া আবার ভাবিলেন, "বোধ হয়, কোন তস্করই বা আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এই কাণ্ড করিয়া থাকিবে। ভাল, আমি ত কাহারও কোন অপকার করি নাই, তবে কেন আমার সহিত তাহার এইরূপ শত্রুতার সূত্রপাত হইল ? অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি এখানে আসিয়া ভাল কবি নাই।" এই প্রকার সাত পাঁচ ভাবিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বিমর্ষের উপর আরও বিমর্ষ হইলেন।

অনন্তর কি ভাবিয়া, অলঙ্কারগুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি কতকটা দূর অতিক্রম করিলেন। এমন সময়ে একটা শৃগাল কি কুকুর তাঁহার গমনপথ কাটিয়া দৌড়িয়া চলিয়া গেল। তিনি পত্রালঙ্কারের চিন্তায় তদ্গতচিত্তে যাইতেছিলেন, হটাৎ সেইটাকে যাইতে দেখিয়া যেন চমকাইয়া উঠিলেন। করধৃত যষ্টিখানি মৃত্তিকার উপর দুই চারি বার ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিলেন। আবার গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে বাটীর দ্বারদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। সরসীতট হইতে এ পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহাকেও কেহ দেখিতে পাইল না। কারণ, তখন রাত্রি অধিক, জনমানবের কোনই সংস্রব ছিল না।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। স্থিরকর্ণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অপরাপর কক্ষ হইতে কাহারই সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। তখন বুঝিলেন, সকলেই নিদ্রিত।

তিনি যখন নিজ কক্ষের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন আলোকাধারের বর্ত্তিকাটি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি প্রথমতঃ উহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তাহার পর ভিতর হইতে গৃহের দ্বার বন্ধ করিলেন। যথাস্থানে উত্তরীয় রাখিয়া রাত্রিবাস বস্ত্রখানি লইয়া পরিহিত বস্ত্রখানি ছাড়িলেন। উত্তরীয়ের পার্শ্বে উহা রক্ষিত হইল। তিনি কাপড় ছাড়িবার পূর্ব্বেই উত্তরীয়বদ্ধ লিপিখানি খুলিয়া এবং অলঙ্কারগুলি লইয়া শয্যার উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর কৌতূহল ও আগ্রহের সহিত পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই পত্রখানিতে এই লেখা ছিল;—

"প্রিয়তম ধীরেন্!

আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমাকে তাহার শতাংশের একাংশও কি ভালবাস? যদি না বাস, তবে আমি কি দোষে দোষী, তাহা বলিবে কি?—বাল্যকাল হইতে আমি তোমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন ভালবাসিব, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। তুমি আমার সহিত মন খুলিয়া কথা কও না,—এই বড় দুঃখ। ধীরেন্, তুমি কি আমার হইবে? তা তুমিই জান,—আমি জানি না; কিন্তু আশা আশ্বাস দিতেছে। আবার শুধু আশার আশ্বাসে সকল সময়ে কে কোথা বিশ্বাস করে? তাই আবার বলি, ধীরেন্! তুমি কি আমার হইবে! আমার প্রাণাধিকা ভগিনী হিরণ্ময়ী সর্ব্বদা কাছে থাকে, তাই আমি মুখ ফুটিয়া তোমায় কিছু বলিতে পাই না। সেই জন্য আজ এই পত্রখানিতে

আমার মনের কথা লিখিলাম। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, পিতৃগৃহই যেন আমার ভাগ্যে স্বামিগৃহও হয়,—অধিক আর কি বলিব, ইতি।

আমি একান্ত তোমারি
কিরণময়ী।”

এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ অগাধ চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। মনে মনে কত কি যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার ভাবিলেন, “আমি যে কিরণময়ীকে মর্ম্মাহত করিয়া আসিতেছি,তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। আমি যে হিরণ্ময়ীকে তাহার অপেক্ষা ভালবাসি, সে তাহা কি করিয়া বুঝিতে পারিল? কেনই বা পারিবে না? তিনজনে এক বাড়ীতে আছি, পরস্পরের সহিত পরস্পরের দেখা শুনা হইতেছে, তবে সে কেন তাহা জানিতে না পারিবে? যেকালে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য আমার মনঃপরীক্ষা করা, সেকালে সে যে অবশ্যই ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কিরণ যে আমাকে বড় ভালবাসে, আমি তাহা অগ্রেই জানিয়াছি, এক্ষণে আবার আরও জানিলাম। আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইলে সে বড় সুখী হয়, এই তাহার পত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা বড় গুরুতর সমস্যা। আমি মহাশঙ্কটে পড়িলাম যে। এ বিষয়ে তাহার পিতা মাতার কোন মতামত আছে কি না, তাহা ত জানি না, কিন্তু সে আপনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইতেছে। আমার ইচ্ছা যে অন্য কোন পাত্রের সহিত কিরণময়ীর আর আমার সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয়। সে দিন আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়মাধব বলিয়াছেন যে, অন্য কোন পাত্রের সহিত কিরণের বিবাহ হইলে হিরণের সঙ্গে আমার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিতে পারিবেন। সে কথা বড় সন্দেহের নয়, কারণ, কিরণ-হিরণের পিতা প্রিয়মাধবকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাহাতে এ কথায় বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু তাহা হইলে কিরণের দশা কি হইবে?” এই ভাবিয়া যুবা আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “হুঁ, আমি পাগল, তা নহিলে এরূপ ভাবিতেছি কেন? কর্ত্তা মহাশয়ের ইচ্ছা না হইলে, আমাদের কাহারই ইচ্ছা ফলবতী হইবে না। আমি কি দুরাশার দাস—আমি কি ভ্রান্ত! আমি হিরণ্ময়ীর

আশা করিতেছি—কিরণময়ীকে উপেক্ষা করিতেছি। ফল কথা, আমার কিছুই হইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। পত্রখানি বক্ষের উপর হাত চাপা দিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন। চিন্তাশূন্য হইলেন কি?—না চিন্তার তরঙ্গ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। পত্রখানি আর একবার পড়িলেন। অনন্তর শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের অভ্যন্তরে কি যেন হইতে লাগিল, সুতরাং অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। একটির উপর একটি করিয়া নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তা তাঁহার প্রাণ মন হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া তুলিল। উদ্যানে একগুণ নিদ্রা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে চতুর্গুণ জাগরণ। দেখিতে দেখিতে রজনীর তিন ভাগ অতীত হইয়া গেল।

এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ শয্যাতলে প্রাপ্ত পাদালঙ্কার কএকখানি ও পত্রখানি লুকাইয়া রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। শুইবার সময় মুখ ফুটিয়া ধীর-স্বরে বলিলেন, "কিরণময়ীই যে নিজে উদ্যানে গিয়া আমার উত্তরীয়তে এই পত্রখানি বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ এই অলঙ্কারগুলি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এগুলি তাহারই পাদালঙ্কার, তাহা আমি আলোকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি। মুখ ফুটিয়া আবার বলিলেন, "আমি পালঙ্কের সর্ব্বাধঃতলে পত্রখানি ও অলঙ্কারগুলি যেরূপ করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম, তাহা আর হিরণ্ময়ী জানিতে পারিবে না।" ধীরেন্দ্রনাথের এই কথাগুলির মর্ম্ম এই, হিরণ্ময়ী প্রত্যহই তাঁহার গৃহে যখন তখন আসিয়া, এটি সেটি করিয়া সকলগুলিই ঘাঁটেন। শুধু ঘাঁটা নয়, অনেক জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলেন।. হিরণ্ময়ীর হস্তে অন্য জিনিষ পত্র পতিত বা নষ্ট হইলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই পত্রখানি ও অলঙ্কারগুলি পড়িলে বিষম ব্যাপার ঘটিবে। সেই ভয়েই এত লুকাচুরি।

পাঠক! তুমি বলিবে যে, ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে কথা কহিতে কহিতে শেষে মুখ ফুটিয়া কহিলেন কেন? এ কথার উত্তর কি দিব? তুমিও কি কখন কখন মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে মুখ ফুটিয়া কথা কও না? শুনিবার কেহই নাই, অথচ আপনি বলিয়া আপনিই শুন না? কেহই শ্রোতা নাই, অথচ

মানুষ মনের কথা এক একবার ফুটিয়া বলে। তাহা আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না, কেবল তাহারই কর্ণে আর বাতাসে, আকাশে।

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার শুইলেন। কিন্তু নিদ্রার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন কি না, তাহা তিনিই জানেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রহস্যভেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। কি করিয়া হইল ?—না সদসৎ দুই প্রকার কার্য্য মিশাইয়া হইল।—সৎকার্য্য কি ?—ঈশ্বরাধনা, ধ্যান, জপ যোগ প্রভৃতি। আর অসৎকার্য্য কি ?—না, চুরি, ডাকাইতি, হত্যা প্রভৃতি। এই প্রকার কার্য্য ব্যতীত আর একটি কার্য্যের সহিত রাত্রি প্রভাত হইল।—উহা কি ?—না, ধীরেন্দ্রনাথের সচিন্ত জাগরণ—উদ্যানের মধ্যে নিদ্রাংশ বাদ দিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ। নিশাদেবী ধীরগম্ভীর ভাবে ধরাবক্ষে বিরাম লভিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু স্থান শূন্য থাকিবার যো নাই, কারণ উষাদেবী আসিলেন। সর্ব্বাগ্রে শাখারূঢ় বিহঙ্গেরা সুর বাঁধিয়া নিশাকে বিদায় দিয়া উষাকে অভ্যর্থনা করিল।

আচ্ছা, পাঠক! আপনি বলিতে পারেন, উষাকে দেখিয়া কে কে সুখী আর কে কে অসুখী হইল? সুখী হইল কুসীদজীবী, কেন না অধমর্ণের নিকট তাহার ধার দেওয়া টাকার সুদ বাড়িল—সুখী হইল নববিবাহিত যুবা, কেন না তাহার প্রিয়তমা আর একদিনের বড় হইল—সুখী হইল অদ্য যাহার বিবাহ, কেন না সে একটি আশার প্রদীপ পাইবে; যদিও সে জানে না যে, ভবিষ্যতে এই আশার প্রদীপ তাহাকে প্রকৃত পক্ষে সুখী কি দুঃখিত করিবে, কিন্তু সে এখন ত সুখী;—আমাদের তাহাই বক্তব্য।—আর কে সুখী হইল ?—না যাহার অসুখ নাই, আর কে ? না যে কারাগারে আছে, কেন না তাহার দিন কমিল। এইরূপ উষা-আগমন সন্দর্শন করিয়া আরও কত লোক যে কত প্রকারে সুখী হইল, সে সকল কথা পাড়িবার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, অসুখী

হইল কে কে?—না, অধমর্ণ ব্যক্তি, কেন না তাহার উত্তমর্ণ আসিয়া আসল ও সুদের জন্য উত্তম মধ্যম ও অধম করিয়া কত মিষ্ট কথা শুনাইয়া দিল। অসুখী হইল গলিতদেহ বৃদ্ধ, কেন না তাহার দিন কমিয়া গেল। অসুখী হইল কোন কোন পিতা মাতা, কেন না তাঁহাদের মৃত পুত্রকন্যার শোক জাগিয়া উঠিল। অসুখী হইল বিধবা রমণী আর মৃতদার পুরুষ, কেন না তাহাদের মধ্যে একের ভর্ত্তৃশোক অপরের স্ত্রীবিয়োগ হৃদয়কে আক্রমণ করিল। আর কে? না যাহার সুখ নাই। আর কে? না ধীরেন্দ্রনাথ।

আচ্ছা, পাঠক, তুমি এই নব উষা-আগমনে সুখী কি অসুখী হইয়াছ? তোমার আপনার কথা প্রসঙ্গে বলিতেছি না,—ধীরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলিতেছি। হয় ত তুমি ইহাঁর অসুখে অসুখী হইয়াছ, নয় ত ইহাঁর অসুখ তোমাকে অসুখী করিতে পারিল না, কারণ একজনের সুখে একজন সুখী ও একজনের অসুখে একজন যে অসুখী হয়, এরূপ লোক বড় বিরল। তা যদি না হইবে, তবে কেন ঐ ধনীর দ্বারদেশে একমুষ্টি অন্নের জন্য ঐ ভিক্ষুক রোদন করিতেছে, আর ধনী ক্ষীরসরনবনী লইয়া নিজের উদরই শীতল করিতেছে? কেন ভিক্ষুকের রোদনে কর্ণপাতও করিতেছে না? বিপদে পড়িয়া একজন একজনের চরণোপান্তে লুটাইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সে কেন সাধ্যসত্ত্বেও তাহার দিকে অনুকূল দৃষ্টিপাত করিতেছে না? একজন স্বজনবিয়োগে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতেছে, আর একজন কেনই বা তাহার নিকটে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গান গায়িতেছে? এই পাপ সংসারে এরূপ লোকই সংখ্যাতীত, কিন্তু পরের ব্যথায় ব্যথিত হয়, এরূপ লোক বড় বিরল। সুখসম্বন্ধেও তাই।—একজন যদি সৌভাগ্যবলে শ্রীসম্পন্ন হইল, অমনি দশজন তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আহার নিদ্রা পর্য্যন্তও ত্যাগ করিল। একজনের যদি একটু ভাল হইল, অমনি সাতজন তাহাকে কাঁদাইবার জন্য ভীষ্মের পণ করিল। এইরূপ আরও যে কত আছে, তাহা বলিতে গেলে সূর্য্যাস্ত হইয়া যায়। এই জন্যই বলিতে হয়,—ইহা পৃথিবী নয়—নরক।

কিন্তু আমরা জানি, আমাদের সহৃদয় পাঠক মহাশয় সেরূপ নহেন। তিনি পরের অসুখে অসুখী আর পরের সুখে সুখী হইয়া থাকেন। ধীরেন্দ্র-

নাথের এই মানসিক অসুখে তাঁহারও চিত্ত দুঃখিত হইয়াছে, এরূপ আশা করিতে পারি।

প্রভাত হইতে দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রির অধিকাংশভাগ নিদ্রা হয় নাই বলিয়া এবং মনোমধ্যে চিন্তার উপর চিন্তার দুর্ব্বিসহ ভার সহিয়া, তাঁহার শরীর কতকটা অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মুখ-খানি শুকাইয়া গিয়াছে—নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়াছে। গা হাত পা মাটী মাটী করিতেছে—হাই উঠিতেছে—মাতা ঘুরিতেছে। মনের সুখ নাই বলিয়া শরীরেও সুখ নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত পূর্ব্বক গাত্রভঙ্গ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিতেছেন।

শয্যা পরিত্যাগের পর হইতে এইরূপে কতকটা সময় অতীত হইল। অনন্তর তিনি মুখ প্রক্ষালনাদি সমস্ত প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য স্নানের যোগাড় করিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ স্নান করিলেন। স্নানান্তে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় আজ উহা ভাল লাগিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গমন-বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটী হইতে নির্গত হইলেন। নির্গত হইয়া কোথায় গেলেন?—বোধ করি প্রিয়মাধবের নিকট।

পাঠক! গত রাত্রিকালে মনে মনে কহিতে কহিতে ধীরেন্দ্রনাথের মুখ ফুটিয়া যে কএকটি কথা নির্গত হইয়াছিল, তাহা ত তোমার মনে আছে? তুমি সেই কএকটি কথা ভুলিয়া যাও বা মনেই রাখ, তাহাতে তোমার এমন কিছু অনিষ্ট নাই, কিন্তু তাহাতেই একটি সুগভীর রহস্যভেদ হইবার উপক্রম হইল।

গত রজনীতে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি নিদ্রা যান নাই। ধীরেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও নানাচিন্তায় অস্থির হইয়াছিলেন। ধীরেন্দ্র তাঁহাকে কাছে থাকিতে দিলেন না—এক প্রকার তাড়াইয়া দিলেন,—সেই এক ভাবনা। আবার গৃহে আসিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী কিরণময়ীকে দেখিতে পাইলেন না—সেও এক ভাবনা। এই দুইটি ভাবনার সূত্রপাতে তাঁহার মনোমধ্যে অসংখ্য ভাবনার পুঞ্জ পুঞ্জ সমষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। মধ্যরাত্রিতে কিরণময়ী গৃহে প্রবিষ্ট

হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জাগিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। কিরণময়ীর আসিবার পূর্ব্বে তিনি শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া এক ধারে পড়িয়াছিলেন। কিরণময়ী ভাবিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার বিপরীত। দুই ভগিনী এক গৃহে এক শয্যায় শয়ন করিতেন।

কিরণময়ী ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী, তাঁহাকে তত রাত্রিতে আসিতে দেখিয়া আরও চিন্তিত হইয়াছিলেন, সুতরাং শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তিনি তাহাকে স্পর্শ করেন নাই।

কতক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া, বাহিরে আসিয়াছিলেন। আসিয়া কখন্ কিরূপ অবস্থায় ছিলেন, কি কি করিতেছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু একবার ধীরেন্দ্রনাথের গৃহের রুদ্ধকপাটের বহির্দ্দেশে উৎকর্ণ হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, ইহা আমরা জানি। ধীরেন্দ্রনাথ তখন গৃহের ভিতর ছিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয়কে বলিয়াছি। তাঁহার সেই মুখফোটা কথাগুলি নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মানা ধীরেন্দ্রনাথগতা হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া, তিনি তখন ধীরেন্দ্রনাথকে ডাকেন নাই বা রুদ্ধকপাটে আ াত করেন নাই। আবার ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে আসিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তখনও কিরণময়ী নিদ্রায় অভিভূতা। সুতরাং হিরণ্ময়ীর বহির্গমনের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

অনন্তর প্রভাতে উভয় ভগিনীই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন ইচ্ছায় আপনাপন কার্য্যগুলি সমাধা করিলেন। মধ্যে মধ্যে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষের দিকে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবিষ্ট হন নাই,—ফিরিয়া গিয়াছিলেন। অদ্য এখন পর্য্যন্তও কিরণময়ী ধীরেন্দ্রের কক্ষে একটি বারও আসেন নাই।

যাহার চিন্তা সেইরূপ, তাহার কার্য্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। [illegible]

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এতক্ষণে তথাস্ত হইল।

তিনি তাহা জানিতে পারিয়া, একাকিনী অন্যের অলক্ষ্যে তাঁহার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াই শয্যাতল হইতে পত্র ও অলঙ্কার কএকখানি বাহির করিয়া লইলেন। বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি একটি কক্ষে চলিয়া গেলেন, এ কক্ষ তাঁহার নিজের; এ গৃহে কিরণময়ীর কোন জিনিষপত্র বড় থাকে না। তিনি সেইগুলি অগ্রে আপনার বাক্সের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিয়া, পরে একখানি গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসিলেন। পড়া ত তাঁহার মাথা আর আমাদের মুণ্ড, কেবল ধীরেন্দ্রনাথের পোড়া হইয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদিনী।

ভিতর ইহতে নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হিরণ্ময়ী পত্রখানি দুই তিনবার পড়িলেন। পড়িয়া পড়িয়া শেষে বলিলেন, "হুঁঃ, যা মনে করিয়াছি, তাই। তবে না ধীরেন্ আমাকে ভালবাসে বলে? এরি নাম বুঝি ভালবাসা? অ্যাঁ, ধীরেন্ এমন!" এই বলিয়া, ক্ষণেককাল কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন, "কই, আমি যাহা ভাবিতেছি, ঠিক তাহা ত নয়। পত্রখানির মর্ম্ম ত সেরূপ নয়। ভাবে বোধ হইতেছে, ধীরেন্ এ বিষয়ে কিছুই জানেন না—এই কাণ্ড বড় দিদির। বড় দিদি ধীরেন্‌কে বড় ভালবাসেন, বিবাহ করিতে অভিলাষিণী। আমার দশা তবে কি হইবে? না, বড় দিদির নিজের ইচ্ছায় কি বিবাহ হইতে পারে? বাবা আর মা'র মত না হইলে, তাহা হইবে না। আচ্ছা, বড় দিদির যদি অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে আমিই কি করিয়া—" এই অসমাপ্তি কথার মর্ম্ম ভাবিতে ভাবিতে তিনি কপাট উন্মোচন করিলেন, দেখিলেন বাহিরে কেহই নাই। আবার কপাট বন্ধ করিলেন।

আবার মনে মনে বলিলেন, "আমি সর্ব্বদা কাছে থাকি বলিয়া বড় দিদি ধীরেন্‌কে মনের কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন না। ধীরেনের প্রতি তাঁহার বড় টান—বড় ভালবাসা। আমিও ত ধীরেন্‌কে খুব ভালবাসি। বড় দিদি লিখিয়াছেন, ধীরেন্ তাঁহাকে তাঁহার ভালবাসার শতাংশের এক অংশেও ভালবাসেন না; তা' হইতে পারে,—আমি জানি না, কিন্তু ধীরেন্ আমাকে যে ভালবাসেন, তা' আমি জানি।" এই ভাবিয়া ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া থাকিলেন। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। আবার ভাবিলেন, "না, ধীরেন্ আমাকে মুখেই কেবল ভালবাসেন, তা' নহিলে আমাকে কাল তাড়াইয়া দিলেন কেন? বুঝিয়াছি—আর কোথায় যায়—বুঝিয়াছি। আচ্ছা—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি আর অধিক বাক্যচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন না। এতক্ষণে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত হইল, ধীরেন্দ্রনাথের কিরণময়ী আর কিরণময়ীর ধীরেন্দ্রনাথ;—হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কেহই নহে।

একটি প্রস্ফুটিত সুধাধার পদ্মকে ছিন্ন করিয়া রৌদ্রে রাখিলে যেরূপ রসহীন ও সৌন্দর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে, হিরণ্ময়ীর মনোহর মুখখানিও তাহাই হইল। মনে প্রাণে বুকে শরীরে যেন শত শত কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল। একটি একটি করিয়া কএকটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তন্মধ্যে শেষের গুলি বাধা পাইয়া ছিন্ন হইয়া নাসারন্ধ্র ত্যাগ করিল। এরূপ হইবার কারণ এই, তখন হিরণ্ময়ী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিবার সময় উদর ও বক্ষের অভ্যন্তরে মুহুর্মুহু চাপ লাগে, সেই জন্যই রোদনের সহচর দীর্ঘনিশ্বাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কখন কোন কারণে কাঁদিয়া থাকেন, তবে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। এ সকল কথার অর্থ অভিধানে এবং ভাব টীকায় অপ্রাপ্য, সুতরাং এ সকল কথার অর্থের অভিধান তুমি, আমি, ইনি, তিনি ইত্যাদি এবং ভাবের জন্য টীকাও তুমি, আমি, ইনি, তিনি ইত্যাদি।

করিপদবিদলিত হইয়া মৃণাল যেমন জলে ডুবিয়া যায়; তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, বিষাদ বাড়ে, সেইরূপ হিরণ্ময়ী দুঃখসাগরের গভীর জলে ডুবিয়া গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার বরবপুর যে যে স্থলে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সেই সেই স্থলে বিষাদ-রেখা যেন অঙ্কিত হইয়া

গেল। হিরণ্ময়ী যৌবনের নব-অধিকারিণী হইলেও, এক্ষণে বালিকা। তিনি আজিও কোন কার্য্যের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা তলাইয়া বুঝেন না। তিনি যাহা করেন বা যাহা বলেন, তাহাই তাঁহার নিকট একবার ভাল আবার পরক্ষণে মন্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি ভালকে মন্দ ভাবেন—মন্দকে ভাল ভাবেন, আবার কখন কখন ভালকেই ভাল আর মন্দকেই মন্দ ভাবেন। আজ তিনি যে কত কি ভাবিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? আজ অনেক দিনের পর তাঁহার কোমল বক্ষ পরিতপ্ত হইয়াছে, তাই উহা যেন শীতল হইবার আশায় লোচনবর্ষিত দরদর ধারা আকর্ষণ করিতেছে। কখন তিনি গালে হাত দিয়া অর্দ্ধ হেলিত ভাবে একদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, আর তাঁহার আরক্তিম অক্ষিযুগল হইতে উত্তপ্ত অশ্রুরাশি আপনা আপনি স্তবকে স্তবকে উথলিয়া উঠিতেছে। এক একবার তিনি বস্ত্রের সূক্ষ্মাঞ্চলে, আবার এক একবার কোমল করপদ্মে অশ্রুমোচন করিতেছেন। যখন তিনি অঞ্চলে নয়ন মুছিতেছিলেন, তখন এক সূত্রের পর এক সূত্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে অশ্রু আকর্ষিত হইতে-ছিল;—তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন উত্তপ্ত বক্ষে তপ্তাশ্রু পড়িলে পাছে আরও কষ্ট হয়, সেই জন্যই অঞ্চলখানি সমস্ত অশ্রু শোষণ করিবার নিমিত্ত এইরূপ কৌশল প্রকাশ করিল। আর যখন তিনি করপদ্মে নয়ন মার্জ্জন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে স্বর্ণ বলয় দুলিতেছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন বালা সেই বালাকে কাঁদিতে নিষেধ করিতেছিল।

হিরণ্ময়ী একাকিনী অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি অন্যের নিকট কাঁদিলে, সে ব্যক্তি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া থাকে, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই। অপিচ তাঁহার কাহারও নিকট এই কান্না কাঁদিয়া দুঃখ প্রকাশ করিবারও পথ নাই, সুতরাং কে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে? তিনি নিজে ব্যতীত কেহই তাঁহার রোদন শুনিতেছে না—বুঝিতেছে না।

এক এক বার তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন আর অমনি গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে মনে মনে বলিলেন, "ধীরেন্! আমায় ভুলিলে? আমায়

কাঁদাইলে? তোমার মনে কি এই ছিল?—উঃ, পুরুষের চিত্ত কি কঠিন।” এই ভাবিয়া অনেক যত্নে আত্মভাব গোপন করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার স্নানাহার করিবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মাতা বকিবেন বলিয়া একপ্রকার যেমন তেমন করিয়া সারিয়া লইলেন।

তিনি ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীর চিত্ত পরীক্ষা করিবার জন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত বন্ধু।

মহাতপ্ত মরুভূমির বক্ষে ওয়েসিস, গভীর ও সুবিশাল মহাসাগরের হৃদয়ে দ্বীপ, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতলে দীর্ঘকালস্থায়ী মেঘখণ্ড, অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় সুশীতল বায়ু ও জল যেরূপ হিতকারী, মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃত বন্ধুও তাহাই। বিপদে ধৈর্য্যের ন্যায়, রোগে ঔষধের ন্যায়, ভয়ে ভরসার ন্যায়, অন্ধকারে আলোকের ন্যায়, যন্ত্রণায় উপশমের ন্যায়, অশান্তিতে শান্তির ন্যায়, শরীরে প্রাণের ন্যায় যাঁহার প্রকৃত বন্ধু নাই, তাঁহার কেহই নাই। এই মানব জগতে প্রকৃত বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ; তবে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্, তাঁহার ভাগ্যেই এ হেন স্বর্গীয় রত্ন লাভ হইয়া থাকে। বন্ধুর নিমিত্ত বন্ধু জীবন দেয়, পৃথিবীতে এরূপ বন্ধুর সংখ্যা কয়টি? একবৃন্তে দুইটি কুসুমের ন্যায়, দুই শরীরে একপ্রাণ না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব ঘটে না। এক জনের সুখে আর এক জনের সুখ এবং দুঃখে দুঃখ উৎপন্ন না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব সংঘটিত হয় না। প্রকৃত বন্ধুর হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত? তা’ কেমন করিয়া বলিব?—কারণ তাহা এই প্রবঞ্চনা-সার পৃথিবীতে নাই। সে উপাদান স্বর্গ হইতে আসিয়া প্রকৃত বন্ধুর হৃদয়ে পরিণত হয়।

কালের কি ভোজবাজী! যাহারা প্রকৃত বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, প্রায় তাহাদের মধ্যে অপ্রকৃত বন্ধুই সকলেই। এক্ষণে যে ব্যক্তি আর একজনকে

ঠকাইতে পারিবে,বিপদের সময় ফিরিয়াও দেখিবে না, প্রাণদানের পরিবর্ত্তে প্রাণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে, কৌশল করিয়া স্বার্থসাধন করিবে, সেই প্রকৃত বন্ধু! আহা, যে সরল ব্যক্তির ভাগ্যে এরূপ গুণময় বন্ধু যুটে, তা'র পক্ষে এই পৃথিবী নরক এবং এইরূপ মহাপুরুষ বন্ধু নরকের বিষমুখ ও বিষহৃদয় ভুজঙ্গ।

তবে কি প্রকৃত বন্ধু মূলেই নাই?—আছে বই কি। একেবারেই না থাকিলে এত দিনে মানবসমাজের অঙ্গহানি হইত, উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিত, জীবিত থাকা বিড়ম্বনা হইত।

একেবারেই প্রকৃত বন্ধু নাই বলিলে ধীরেন্দ্রনাথের প্রিয়মাধব কোথায় দাঁড়ান?

প্রিয়মাধবের পিতামাতা কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তি যদিও বেশী ছিল না বটে, কিন্তু জীবন-যাপনের কোন কষ্ট হইত না। প্রিয়মাধবের বয়ঃক্রম ২৭।২৮ হইবে। তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স এক বৎসর মাত্র। প্রিয়মাধবের স্ত্রী দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন না, কিন্তু বড় গুণবতী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২০।২১ বৎসর, নাম কাদম্বিনী। পত্নী শ্যামাঙ্গী সুতরাং তত সুশ্রী নয় বলিয়া প্রিয়মাধবের মন এক নিমিষের জন্যও বিচলিত হইত না। তিনি কাদম্বিনীকে বড় ভালবাসিতেন, সুতরাং স্বামীর উপযুক্ত কার্য্যই করিতেন। প্রিয়মাধব যুবা, তাঁহাকে শাসন করে এমন কেহই ছিল না, তাহাতে আবার সহধর্ম্মিণী সুন্দরী নহেন, সুতরাং এমন অবস্থায় তাঁহার চরিত্রে দোষস্পর্শ হওয়াই সম্ভব, কিন্তু প্রিয়মাধব সচ্চরিত্র যুবা ছিলেন। তাঁহার চক্ষে কাদম্বিনী—সৌদামিনী।

এদিকে ধীরেন্দ্রনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর প্রিয়মাধবের বাটীতে গমন করিলেন। তিনি যখন তথায় উপস্থিত হ'ন, তখন প্রিয়মাধব সদর দরজায় বসিয়া পুত্রটিকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন—এ খেলার নাম আদর! প্রিয়মাধব নামকরণের সময় পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন,—সুধাময়। কিন্তু তাহার আদরের নাম খোঁকা।

খোঁকা কখন পিতার ক্রোড়ে বসিয়া চুষীকাটী চুষিতেছে, কখন তাঁহার

হাত ধরিয়া ক্রোড়ের উপরেই থেই থেই করিয়া নাচিতেছে, কখন বা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিতেছে, আবার কখন বা ধুপুস্ করিয়া পড়িয়া যাইতেছে ; পড়িয়া কাঁদিবার যেমন উপক্রম করিতেছে, আর অমনি প্রিয়মাধব তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্ম মৃত্তিকাকে ভৎ সনা করিতেছেন। কখন বা তিনি তাহার মুখচুম্বন করিয়া কতই তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। এইরূপে পার্থিব জগতে পিতাপুত্রে অপার্থিব ক্রীড়া হইতেছে।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। খোঁকা খেলা বন্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ হাঁ করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার মতলব ফিরিয়া গেল, পিতার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল,"বা—কে"। প্রিয়মাধব বলিলেন, "খুড়ো"। খোঁকা প্রতিধ্বনি করিল, "খু—"। আবার থেই থেই তেই তেই করিয়া, বসিয়া বসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া নাচিতে লাগিল। করতালির ধুম পড়িয়া গেল, কিন্তু শব্দ নাই।

প্রিয়মাধব ধীরেন্দ্রনাথকে "এস,—বস" বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ধীর ! আজ্ তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে কেন ? অসুখ হইয়াছে কি ?"

ধীরেন্দ্রনাথ অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথার উত্তর দিলেন না। তাহা দেখিয়া প্রিয়মাধব কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। স্বহস্তে তাঁহার মস্তক ফিরাইয়া আবার কহিলেন "কর্ত্তা মহাশয় কি কিছু বলিয়াছেন ? উত্তর দিতেছ না কেন ?—বল না, কি হইয়াছে ?"

ধীরেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে গত রাত্রের ঘটনাগুলি বলিতে লাগিলেন। প্রিয়মাধব স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। খোঁকা এক একবার উচ্চস্বরে তান ছাড়িতে লাগিল। প্রিয়মাধব মধুর গর্জ্জনে "আঃ—কি করিস্ খোঁকা" বলিয়া ধমকাইতে লাগিলেন। সে তাহাতে দৃক্পাতও করিল না।

ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনিয়া প্রিয়মাধব অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই অবসরে ধীরেন্দ্রনাথ, মনে সুখ নাই অথচ মুখের হাসি হাসিয়া সুধাময়কে বলিলেন, "কি খোঁকা ! দুধ খেয়েছ ?" খোঁকা এ কথার ঠিক উত্তর করিল, "আইয়া এলি লিলি—লেই লেই লেই।" ধীরেন্দ্র হাসিয়া

বলিলেন,"বেস্।" প্রিয়মাধব ভাবিতেছিলেন, তিনিও একবার হাসিলেন। হাসিবার সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বাতাসের সঙ্গে দুই তিনটা 'হুঁ—হুঁ' বাহির হইয়া গেল।

ধীরেন্দ্র বলিলেন, "ভাই প্রিয়! কি ঠিক করিলে?" এই বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রিয়মাধব কহিলেন, "পত্রখানা আনিয়াছ কি? আমি একবার দেখিব।" এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথের চমক হইল। বলিলেন, "ওই যা, আমি আসিবার সময় সেখানা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই ত, তবে কি করি? এখন গিয়া আনিব কি?"

"না, এখন আর আনিতে হইবে না। সন্ধ্যার পর লইয়া আসিও। এখন আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আইস দেখি। সেখানে দু'জনে বসিয়া যা হয় একটা ঠিক করি গিয়া।" প্রিয়মাধব এই কথা বলিয়া সুধাময়কে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। "এস ধীর!" বলিয়া অগ্রসর হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আশা।

লোক বলে প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ, কিন্তু আমরা বলি তাহা নয়। আমাদের মতে যে 'এই বস্তুটি প্রিয়' বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তাহার বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ। কে মানুষকে তাহা বুঝাইয়া দেয়?—আশা। আশা কি?—কিছুই না—অথচ সকলই। রোগ মানুষকে মারিয়া ফেলে, কিন্তু সে মৃত্যুতে সে কথা কয় না—চাহিয়া দেখে না—ভাবিতে পারে না। কিন্তু আশা বিমুখ হইলে মানুষের যে মৃত্যু ঘটে, তাহাতে সে কথা কয়—চাহিয়া দেখে—ভাবিতে পারে। রোগে মৃত্যু হইলে পরে কষ্ট নাই, কিন্তু আশার বিচ্ছেদে

মরিলে আর রক্ষা নাই। মানুষ বাঁচে আশার আবির্ভাবে আর মরে উহার তিরোভাবে। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াই আশার ভক্ত হয় আর মরিলেই ত্যাগ করে। এই জন্য মরণের মধ্যে সে কখনই আশাকে ত্যাগ করিতে পারে না। সে ত পারেই না, কিন্তু আশা যদি আপনি সরিয়া যায়, তা' হইলেই তাহার তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যু! এ অপমৃত্যুর নাম জীবনে মরণ;—বড় ভয়ানক। ইহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। যাহার ঘটিয়াছে, সেই জানে।

আশা সকলকেই লোভ দেখায়, তাহার মধ্যে 'পনর আনা পনর গণ্ডা তিন পাই'কে ঠকাইয়া 'একটি পাই'কে বরদান করে। আশাই আমাকে তোমাকে ও তাহাকে স্বর্গে তুলে, 'যাহা হইবার নয়, তাহাই হইবে' বলিয়া স্বর্গের কপাট খুলিয়া দেয়, আর যেমন তাহার ভিতর যাইবার শুভদিন, শুভ ক্ষণ ও শুভলগ্ন স্থির হয়, অমনি এক আছাড়ে পাতালের উদরে গুঁজড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তা' বলিয়া কে গো-শৃঙ্গে সর্ষপস্থিতিরও সহস্রাংশের সময়টুকুর জন্যও ইহাকে ভুলিতে পারে? যত দিন পৃথিবী আর যত কাল সেই পৃথিবীতে মানুষ, তত কাল আশার আধিপত্য যাইবার নয়! যে দিন দেখিবে, আশা ইহলোক হইতে চিরকালের জন্য পরলোকে চলিল, সেই দিনই দেখিবে, পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ মানুষের অস্তিত্বও চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গেল। অহ, আশা তবে কি?

সজীবের ত কথাই নাই, নির্জ্জীব পর্য্যন্তও আশার অধীন।—ফুল ফুটিতেছে, সুগন্ধ বিতরণ করিবার আশায়। বায়ু বহিতেছে, সেই সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ছড়াইবার আশায়। মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি ঢালিবার আশায়। বৃষ্টি পড়িতেছে, শস্য উৎপাদন করিবার আশায়। সূর্য্য উদয় হইতেছে, বাষ্প সঞ্চয়ন করিবার আশায়। বাষ্প সঞ্চিত হইতেছে, মেঘমূর্ত্তি ধরিবার আশায়। চন্দ্র উদয় হইতেছে,—সূর্য্যের প্রখর কর লইয়া সেই করকে শীতল করিবার আশায়। সূর্য্যের কর শশিসংস্পর্শে শীতল হইতেছে, সকলের চক্ষু জুড়াইবার আশায়। বৃক্ষ লতা সমুৎপন্ন হইতেছে, ফলপুষ্প ধারণ করিবার আশায়। ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতেছে, জীবের রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার আশায়। নদী বহিতেছে, সমুদ্রসঙ্গমের আশায়। সমুদ্র স্ফীত হইতেছে, নদীর জলবৃদ্ধি করিবার আশায়। এইরূপ সকলেই একটি না একটি কার্য্য

করিবার জন্ত আশার আরাধনা করিতেছে। আশাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না;—থাকিবার উপায়ও নাই। প্রশ্ন,—অহ, আশা তবে কি? উত্তর,—প্রাণ।

কিরণময়ী এই আশাকে হৃদয়ের গূঢ়তম আসনে উপবিষ্ট করাইয়া গত কল্য পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্যও ইহারই ভরসায় "ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর।"

পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন যে, কই কিরণময়ী কোথায়? তাঁহাকে ত দেখিতে পাই না? আসুন, ঐ দেখুন, তিনি তাঁহার কক্ষে বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার অন্তরে কোথা হইতে আপনা আপনি আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। হিরণ্ময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার? তাঁহার বিপরীত। আজ তিনি ভাবিতেছেন যে, যেন আশা তাঁহাকে কৃতকার্য্য করিবে—ধীরেন্দ্রনাথকে মিলাইয়া দিবে।

হিরণ্ময়ীর মনোভঙ্গের কথা বাটীর কেহই জানিতে পারে নাই, সুতরাং তিনিও জানেন না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, ধীরেন্দ্রনাথ পত্র পড়িয়া যথা সময়ে অবশ্য তাহার উত্তর দিবেন। সে উত্তর কি?—বিবাহ। চমৎকার উত্তর; কার্য্যে পরিণত হইলে কিরণময়ীর পক্ষে সোনায় সোহাগা হইবে। কতই কল্পনা হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কতই হর্ষোচ্ছ্বাস হইতেছে, তাহার সীমা নাই। আর আশা-লতা কতই বাড়িতেছে, তাহার শেষ নাই।—প্রণয়-সূত্রের কি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা! উহার এক দিকে এক জন জড়িত হইয়া কাঁদিতেছে আবার অপর দিকে এক জন হাসিতেছে।

কিরণময়ী মনে মনে কত গড়িলেন—কত ভাঙ্গিলেন। শেষে গড়িলেন "ধীরেন্দ্রনাথের সহিত আমার বিবাহ হইবেই হইবে।" এইরূপে মনে মনে গঠনকার্য্য সমাধা করিয়া, ধীরেন্দ্রনাথের নিকট পত্রের উত্তরাভাস জানিবার চেষ্টায় রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

ধীরেন্দ্রনাথ প্রিয়মাধবের বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুর নিকট কোন পরামর্শ করিয়া এখনও কিছু ঠিক হইল না। পুনর্ব্বার সন্ধ্যার পর সেখানে যাইবার কথা আছে। এবার আবার পাছে পত্র ভুলিয়া যান, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি অগ্রে শয্যাতল হইতে উহা বাহির করিতে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পত্র বা অলঙ্কার কিছুই পাইলেন না। চিন্তিত হইলেন ;— আবার উলট পালট করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম সার হইল। চঞ্চল চিত্ত আরও চঞ্চল হইল। পুনঃ পুনঃ গৃহের এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও দুইয়ের একটিও মিলিল না। অগ্রে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ শয্যার উপর বসিলেন। এই দীর্ঘ নিশ্বাসটি পরিশ্রম জন্ম কি পত্রালঙ্কারের অপ্রাপ্তি হেতু তাহা বলিতে পারি না, তবু, বোধ হয়, উভয় কারণেই।

ফিরিয়া আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে আবার পরিশ্রম, কাজে কাজে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল। এত ঘর্ম্ম যে, যেন এই স্নান করিয়া গা মুছিবেন। শুষ্ক বস্ত্রে স্বেদ মোচন করিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া শয্যার উপরে শুইয়া পড়িলেন। চক্ষু নিমীলিত করিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।—একবার ভাবিলেন, "আমি কি পত্রখানা আর গহনাগুলা এখান হইতে আমার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়াছি? হইতেও পারে, কারণ যেরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি, ইহাতে যে, সকল কার্য্য মনে ঠিক থাকিবে না, তাহার আশ্চর্য্য কি ? ভাল, সিন্দুকটাই খুলিয়া দেখি।" অনন্তর গোপনীয় স্থান হইতে চাবি লইলেন, সিন্দুক খুলিলেন, দেখিলেন,—আশা নিষ্ফলা। আবার বন্ধ করিয়া যথাস্থানে চাবি লুকাইয়া রাখিলেন। "তাই ত, কি হইল, কে লইল" ইত্যাদি মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কক্ষদ্বারের বিপরীত দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শুইয়া রহিলেন। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। গাঢ় চিন্তার সময় প্রায় সকলেই নয়ন মুদ্রিত করিয়া

থাকে। এরূপ করিয়া ভাবিলে চিন্তার অনন্তমূর্ত্তিখানি চক্ষের উপর সম্পূর্ণ-রূপে দেখা যায়। লোকে বলে 'চ'ক বুঝিলে অন্ধকার' সে কথা অন্য স্থলে খাটে, কিন্তু বহুরূপিণী চিন্তার চতুর্দ্দশভুবনবিরাজিত প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিবার সময় 'চ'ক চাহিলেই অন্ধকার।' এই জন্যই ধীরেন্দ্রনাথ নেত্র মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হিরণ্ময়ী ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন নিজের কক্ষে পদালঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। আসিবার সময় দ্বারে চাবি দিয়া আসিয়াছেন। কারণ, বাক্সের ভিতর ফাঁদ আছে।

হিরণ্ময়ী প্রবিষ্ট হইয়া গৃহের একটি কোণের নিকটস্থ দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখে কথা নাই—করপদসঞ্চালনের শব্দ নাই। তিনি এরূপ ভাবে দাঁড়াইলেন যে, যেন একখানি মনোহর ছবি অনেক দিন হইতে দেওয়ালে থাকিয়া ধূলি মাখিয়া মাখিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক আজ যেন দেওয়ালে একটি বিষাদময়ী ছবি আপনা আপনি আঁকিয়া গেল। কিন্তু আজ এই অপূর্ব্বছবিখানি বিষাদ-কালিমায় মলিন হইলেও, গৃহের অন্যান্য রমণীচিত্রগুলি পরাজিত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ! একবার পাশ ফিরিয়া এই বেলা চাহিয়া দেখ, নতুবা এই মনোমুগ্ধকরী ছবি দেখিতে পাইবে না। পাঠকগণ! তোমরাও বিশেষ করিয়া দেখ। ইহা দেখিবার সম্পূর্ণ যোগ্য, পূর্ব্বে কখন দেখ নাই—পরেও দেখিতে পাইবে না।

হিরণ্ময়ী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন আর ধীরেন্দ্রনাথ শয্যায় পড়িয়া আছেন। একজন একজনের পৃষ্ঠদেশ দেখিতেছেন আর একজন আর একজনের গৃহের মধ্যে অবস্থিতিরও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। হিরণ্ময়ীর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরেন্দ্র দর্শনের আশা ছিল, কিন্তু হইল না। একটা ছোটখাট হাঁচি আসিয়া তাঁহার আশা উড়াইয়া দিল।

হাঁচির শব্দ পাইয়া চিন্তামগ্ন ধীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন,

"সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আঁকিল ?"

অমনি উঠিয়া বসিলেন। চিত্রবৎ হিরণ্ময়ীর নিকটে গিয়া কহিলেন, "হিরণ! তুমি কতক্ষণ এখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ ?"

"তা জানি না—মনে নাই" বলিয়া হিরণ্ময়ী মুখ অবনত করিলেন।

তদ্দর্শনে ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, কল্য রাত্রি কালে তিনি উদ্যান হইতে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া হিরণ্ময়ীর রাগ হইয়াছে। সুতরাং তদনুসারে বলিলেন, "হিরণ! আমি ভালর জন্য বলি, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, তুমি উল্টা বুঝিয়া রাগ কর। তুমি ছেলে মানুষ, কিছুই বুঝ না, তাই এমন কর। বুঝিলে আর এমন করিতে না। এখন আমার অনুরোধ এই, যদি আমি ওরূপ আচরণে দোষী হইয়া থাকি, তবে কিছু মনে করিও না। আমি আর তোমাকে কখন কিছু বলিব না।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে কত কি বুঝাইতে লাগিলেন।

বুঝাইতে বুঝাইতে একবার বলিলেন, "কাল রাত্রিকালে তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, 'আর বলিতে হইবে না—আমি বুঝিয়াছি'।—কিন্তু হিরণ্ময়ি! আমি ত তোমার সে কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তুমি, কি বুঝিয়াছ, আমাকে বুঝাও। কাল বুঝাও নাই—আজ বুঝাও।"

হিরণ্ময়ী দুঃখমিশ্রিত ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন, "বুঝিবে? আচ্ছা।—কিয়ৎ কাল অপেক্ষা কর। আসিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। কোথাও যাইও না।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না"।

হিরণ্ময়ী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আপনার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। বাক্স খুলিয়া কিরণময়ীর লিখিত পত্রখানি বস্ত্রে লুক্কায়িত করিলেন। অতি সাবধানে লুক্কায়িত করা হইল, অপরের সাধ্য কি যে দেখিতে পায়? আবার দ্বারে চাবি লাগাইয়া ধীরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য দিন আসিয়া ধীরেন্দ্রনাথের শয্যার কিঞ্চিৎ দূরস্থাপিত একখানি ক্ষুদ্র চৌকির উপর উপবেশন করেন, কিন্তু অদ্য প্রথমবারেও উহাতে বসেন নাই—এবারেও বসিলেন না— দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুতরাং ধীরেন্দ্রও দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হিরণ! বুঝাইয়া দাও।"

হিরণ্ময়ীও বুঝাইলেন। বুঝাইলেন কি? না—পত্রপ্রদর্শন। পত্রখানি দেখাইয়া একবার তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িলেন।

পত্র শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন,—সাবধান হইলেন।

কিন্তু কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, কি উত্তর দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, 'আর বলিতে হইবে না—আমি বুঝিয়াছি' কথার মর্ম্ম এতক্ষণে বুঝিলে ত ? ধীরেন্! তুমি এমন্, তা আমি জানিতাম না! বেস্, ভালই হইয়াছে, সুখে থাক।" হিরণ্ময়ীর এই কথাগুলির প্রত্যেক অক্ষরে যেন তীক্ষ্ণ বিষ ফুটিয়া পড়িল—ক্রোধচিহ্ন দেখা দিল।

নির্দ্দোষ ধীরেন্দ্রনাথ অবাক্। মুখে বাক্য নাই—নয়নে পলক নাই—আর দেহে যেন প্রাণ নাই। ঘটনাশক্তির কি অপূর্ব্ব কৌশল! একে আর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "হিরণ! তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, ও পত্রের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি উহার কিছুই জানি না।" আত্মপক্ষসমর্থনার্থ ইহা বলিলেন। এ কথায় তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। তিনি ঠিক্ কথাই বলিলেন।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তা' কেমন করিয়া তুমি জানিবে বল ? তোমার বিছানার নীচে ছিল কি না!"

ধীরেন্দ্রনাথের মন চঞ্চল হইল, কিঞ্চিৎ ভীতও হইল। তাই এইবার তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া বাক্‌চাতুর্য্য ব্যবহার করিলেন। বলিলেন, "হিরণ! অন্য কেহ কি বিছানার নীচে রাখিয়া যাইতে পারে না ?"

"তা' যেন পারে, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হিরণ্ময়ী নীরব হইলেন।

"'কিন্তু' কি, হিরণ্ময়ি ?" ধীরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে এই অদীর্ঘ পংক্তিটি আগ্রহের সহিত নির্গত হইল।

"কিন্তু কি, বুঝিবে ?"

"বল।"

"আগে শপথ কর।"

"কেন ?"

"তা' নহিলে তুমি বুঝিয়াও বুঝিবে না।"

"শপথ করিতে হইবে না,—তুমি বল, আমি বুঝিব।"

"হিরণ্ময়ী তা' বলে না।"

"ভাল, হিরণ্ময়ি! তুমি ত পূর্ব্বে কখন আমাকে শপথ করিতে বল নাই! আজ কেন এরূপ করিতেছ?"

"তুমি দিব্য করিবে না? না কর। আমি বলিব না।"

ধীরেন্দ্র বিপদে পড়িলেন—উদ্বিগ্ন হইলেন। কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, কিন্তু শপথ না করিলে উহার চরিতার্থতার সম্ভাবনা একবারেই নাই। কি করেন? অগত্যা শপথ করিতে হইল। শপথ করিলেন, "হিরণ্! তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা বুঝিব।"

তখন হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তুমিই কি এই পত্রখানা উদ্যান হইতে নিজে আনিয়া শয্যাতলে লুকাইয়া রাখ নাই?"

ধীরেন্দ্রনাথ আবার উদ্বিগ্ন হইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হিরণ্ময়ী কি সর্ব্বজ্ঞা? কি করিয়া সন্ধান পাইল?" মনে মনে আরও কত কি তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "ধীরেন্! চুপ করিয়া রহিলে যে? উত্তর দাও না।" এই বলিয়া পত্রখানি দেখিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ অনন্যোপায় হইয়া, ইত্যবসরে হিরণ্ময়ীর হস্ত হইতে সহসা পত্রখানি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। "দেখি দেখি, কি পত্র" বলিয়া আকর্ষণ-জনিত দোষ কাটাইতে গেলেন। তদ্দর্শনে হিরণ্ময়ী রাগ করিয়া পুনর্ব্বার উহা যেমন কাড়িয়া লইবেন, ধীরেন্দ্রনাথ দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া, অমনি ছিঁড়িয়া গেল। উভয়ে এইরূপে দুই চারিবার কাড়াকাড়ি করাতে একখানি পত্র তিন চারিখানি হইয়া গেল।

ধীরেন্দ্রনাথের মুষ্টি মধ্যে এক খণ্ড, হিরণ্ময়ীর ক্ষুদ্র মুষ্টির ভিতর এক খণ্ড রহিল এবং ভূতলে দুই খণ্ড পড়িয়া গেল। পড়িয়া বাতাসে কতকটা সরিয়া গেল—বোধ হইল আবার ছিন্ন হইবার ভয়ে। হিরণ্ময়ী অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। রুষ্ট হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তথা হইতে দ্রুতগমনে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কহিব না। তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহাকে লইয়া থাক। কপট! তুমি এত দিন ধরিয়া আমাকে ভাঁড়াইয়া আসিতেছিলে!

এখন হইতে তোমার ঘরেও আসিব না—তোমার সঙ্গে কথাও কহিব না।”

ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একবার ধরিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সাহস পাইলেন না। হিরণ্ময়ী চলিয়া গেলেন। এরূপ ভাবে চলিয়া গেলেন, যেন সহসা বিদ্যুদ্‌রেখা মেঘ হইতে নির্গত হইয়া গেল।

নির্দ্দোষ ধীরেন্দ্রনাথ দুর্ভাগ্যবশতঃ ষোল আনা দোষী হইলেন। ললাটে কর চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ধরা পড়িলেন।

এক কক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছেন, পত্রখানা ও অলঙ্কারগুলি সিন্দুকের মধ্যে না রাখিয়া ভাল করেন নাই। হিরণ্ময়ীই যে এই পত্র ও অলঙ্কারগুলি শয্যাতল হইতে লইয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসে স্থান পাইল। কি করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে গিয়া খিল লাগাইলেন। তিনি রাগ করিলেই আগে দরজার খিল লাগাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের শান্তি কি বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিতে পারি না।—তাঁহার এক্ষণের মনের ভাব এই যে, চোর আপনা আপনি ধরা পড়িয়াছে।

আবার এ দিকে কিরণময়ী আপনার কক্ষে বসিয়া মনে মনে কতই আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। হিরণ্ময়ী ও ধীরেন্দ্রে যে কি ব্যাপার চলিতেছে, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। তাঁহার মনের ভাব, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

হিরণ্ময়ী নিজ কক্ষে থাকিয়া উদ্রিক্ত ক্রোধের কিয়ৎপরিমাণে শান্তিবিধান করিলেন। কিরূপে করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। অনন্তর অর্গল খুলিয়া কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। আজ কিরণময়ীর সহিত এ পর্য্যন্ত

তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিরণময়ীও তাঁহার অনুসন্ধান লন নাই। তা' যাই হউক, কিন্তু উভয় ভগিনীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসার ত্রুটি ছিল না।

যখন কিরণের কক্ষে হিরণ প্রবিষ্ট হইলেন, তখন কিরণময়ী জলপান করিতেছিলেন। তিনি জলপান করিয়া জলপাত্রটি দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠ বহিয়া দুই চারি ফোঁটা জল বক্ষবস্ত্রে পড়িয়া গেল। তিনি হিরণ্ময়ীকে প্রথমত দেখিয়াই ঈষৎ মধুর হাসিলেন। দেখা হইলেই হাসিয়া থাকেন। হাসিয়াই আবার কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্ত হইলেন। এরূপ হইলেন, হিরণ্ময়ীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া। তখন, তাহার কারণ জানিবার জন্য বলিলেন, "হিরণ্! অসুখ হইয়াছে কি ?"

হিরণ্ময়ী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "দিদি! তোমার পায়ের গহনা কই ?" তিনি নিজে পদালঙ্কার ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন।

কিরণময়ীর চমক হইল। অলঙ্কার যে পদে আছে, কি কোথা রাখিয়াছেন, এতক্ষণ তাঁহার মনে ছিল না। হিরণ্ময়ীর এক কথায় তাঁহার মনোমধ্যে নানা কথার উদয় হইল। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। বুঝিলেন, পুষ্করিণীর ঘাটে অলঙ্কারগুলি ফেলিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া হিরণ্ময়ী আবার বলিলেন, "তুমি পায়ে গহনা পর নাই, কিন্তু মা দেখিলে তোমাকে বকিবেন। গহনা কোথায় আছে বল না, বাহির করিয়া দি। সিন্দুকে আছে ?"

কিরণময়ী লজ্জার ভয়ে প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলেন, "হুঁ"।

"তবে আমাকে চাবি দাও না—আমি বাহির করিয়া পায়ে পরাইয়া দি।"

"চাবি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই ভাবিতেছি, মা কি বলিবেন।"

"নারাণের মাকে কামারবাড়ী পাঠাইব ?" নারায়ণের মাতা কিরণময়ীর দাসী, ইহা পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দেওয়া গেল। না বলিলে তিনি কত খুঁজিবেন ?

কামারবাড়ীর কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "না, হিরণ! এখন না। আমি আগে খুঁজিয়া দেখি, একান্তই না পাইলে, ইহার পর তাহাকে পাঠাইয়া দিব।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, বড় দিদি কথা উপর কথা চাপা দিতেছেন, কোন মতে মনের কথা বা কাজের কথা বলিতেছেন না। বুঝিলেন, দিদি বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন। একবার ভাবিলেন, প্রকাশ করিয়া দি, আবার ভাবিলেন "এখন না—আরও কিছুক্ষণ দেখিয়া প্রকাশ করিব। দেখিই না, বড় দিদি কতদূর মনের ভাব ভাঁড়াইয়া নূতন কথা গড়িতে পারেন।" এই ভাবিয়া বলিলেন, "কি করিয়া চাবি হারাইয়া ফেলিলে?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "বাঁ হাতে কোথায় রাখিয়াছি, বোধ হয়, তাই শীঘ্র মনে আসিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে পাইব এখন।" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "হিরণ! তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিরণময়ীও ভাবিলেন এই কথা পাড়িয়া কনিষ্ঠা ভগিনীকে পূর্ব্ববিষয়ে নিরস্ত করিবেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী ভুলিবার নহেন। অন্য সময়ে ভুলিলেও ভুলিতে পারিতেন, কিন্তু এ সময়ে অন্য সব ভুলিতে পারেন, তথাপি নিজের মৎলব ভুলিতে পারেন না। এই জন্য তিনি অসুখবিষয়ক প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আবার অলঙ্কারের কথা পাড়িলেন। এবার প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "বড় দিদি! আমি যদি তোমাকে তোমার গহনাগুলি দিতে পারি, তবে আমাকে কি দিবে?"

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পরিহাসচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব।"

হিরণ্ময়ী উত্তর দিলেন, "তা আর দিতে হয় না।"

কিরণময়ী ভাবিলেন, হিরণ্ময়ীও তাঁহাকে আর গহনা দিয়াছেন; তিনিও আর তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন। অনন্তর মনে মনে বলিলেন, "হিরণ্ময়ী যদি সরিয়া যায়, তাহা হইলে আমি পুষ্করিণীর ঘাট হইতে এই সময়ে গিয়া গহনাগুলি আনয়ন করি।" আবার ভাবিলেন, "সে গহনাগুলি এখনও কি সেখানে আছে? বোধ হয়—না। হয় ধীরেন্দ্র উহা আনিয়াছেন, তা না হয় ত আর কেহ কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, ধীরেন্দ্রের কাছে একবার যাইব। হিরণ্ময়ীকে একবার কোন কৌশলে এখান হইতে সরাইয়া দি।" এই ভাবিয়া, আবার ভাবিলেন, "বোধ হয়, হিরণ্ময়ী সেই

গহনাগুলি সেখান হইতে আনিয়া থাকিবে, তাই এমন কথা বলিতেছে। আমি চতুরতা করিতে গিয়া ঠকিলাম বুঝি।" এই কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে কিরণময়ীর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভয়বিমিশ্রিত লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হিরণ্ময়ীর কথার উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

হিরণ্ময়ী বিলম্ব দেখিয়া বলিলেন, "বড় দিদি! আমি যাহা বলিলাম, তাহাই হইল।"

"কি হইল, হিরণ?"

"যাহা চাহিব, তাহা দিতে পারিবে না।"

"তুমি কোথায় গহনা পাইলে?"

"বলিব?"

"বল।" এ কথা মুখে বলিলেন, কিন্তু মনে খট্‌কা লাগিল।

"আমি—" এইমাত্র বলিয়া হিরণ্ময়ী নীরব হইলেন। তাঁহার মনে কি ভাবোদয় হইল। ভাবিলেন, বলিয়া কাজ নাই। ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া থাকিলেন। আবার ভাবান্তর হইল। ধীরেন্দ্রনাথের মূর্তি মনে পড়িল। আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের শয্যাতলে পাইয়াছি। শুধু গহনাগুলি নয়, তোমার স্বাক্ষরিত একখানা পত্রও পাইয়াছি।" এই বলিয়া অলঙ্কারগুলি বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "ধীরেন আমার হস্ত হইতে পত্রখানা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন।"

কিরণময়ীর মহাশঙ্কট উপস্থিত। কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। উত্তর দিবার উপায়ও নাই। তিনি হিরণ্ময়ীর হস্তে ধরা পড়িলেন।

হিরণ্ময়ী গহনাগুলি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কিরণময়ী লজ্জায় তাঁহার মুখের দিকে আর তাকাইয়া দেখিতেও সাহস পাইলেন না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বাস প্রদান।

সন্ধ্যা হইল। সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন। বসিবার সময়, ভবিষ্যতে মঙ্গল লাভের কামনায়, আকাশে স্বর্ণবৃষ্টি করিলেন। ভিক্ষুক মেঘমণ্ডলী তাড়াতাড়ি তাহা কুড়াইয়া লইল। পক্ষিকুল নীড়ে গিয়া বসিল। শাবকগণ চিঁ চিঁ করিয়া উঠিল। কোন পক্ষী কোলে প্রসূত অণ্ড চাপিয়া বসিল। পেচকের কোটর শূন্য হইল। গোপগণ দোহনপাত্র লইয়া গোদোহন আরম্ভ করিল। নিকটে বৎসগণ রজ্জুবদ্ধ; তাহারা মনে করিতেছে, দাতা গোপ মহাশয় যেরূপ অনির্ব্বচনীয় দয়া প্রকাশ করিতেছেন, দুগ্ধ পাই বা না পাই, পেট ভরিয়া বাঁট চুষিব!

ব্যক্তি বিশেষের গৃহে একটি দুইটি চারিটি বা ততোধিক করিয়া দীপ জ্বালিত হইল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ধূনা গুগ্‌গুলের তৃপ্তিকর গন্ধে সন্ধ্যার আমোদ হইল। এমন সময় জগদীশপ্রসাদের নন্দন কাননে এক দল শৃগাল 'হুয়া হুয়া' করিয়া অস্তগত সূর্য্যদেবকে 'দুও দুও' বলিয়া পুষ্করিণীর ধার সরগরম্ করিয়া তুলিল।

জগদীশপ্রসাদের ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। দ্বারদেশে ডগ ডুম্ ডগ ডুম্ বোলে নাগরা বাজিতে লাগিল। দুই জন লোক হাত ঘড়ি, চারি জন কাঁসর বাজাইয়া বিমিশ্রতালজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল। ধূপ ধূনার ধুঁয়ায় ঠাকুর-ঘর অন্ধকার। ধূমস্তরের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপালোক মিট্ মিট্ করিতে লাগিল। সিংহাসনে ৺রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। মূর্ত্তি যুগল শৃঙ্গারবেশে (রাজবেশে) সজ্জিত। পূজারী ঠাকুর পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চপ্রদীপ জলপূর্ণ শঙ্খ, পাট-করা ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, দর্পণ, পুষ্প প্রভৃতি লইয়া আরতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার করভঙ্গি দেখিয়া দ্বারের বহির্ভাগস্থ গলবস্ত্র যোড়হস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধা ভক্তগণ মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। দুইটি বালক ও একটি বালিকা হাঁ করিয়া পূজারী ঠাকুরের হস্তব্যায়াম দেখিয়া, গৃহে গিয়া সেই-

রূপ করিবে ভাবিতে লাগিল। একদল বালক প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, কেহ বা নিরাজন-বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে লাগিল। এ দিকে পূজারী ঠাকুর তিন বার শঙ্খধ্বনি করিয়া আরতি শেষ করিলেন। ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। যাহার মনে যাহা চাপা ছিল, এতক্ষণে প্রার্থনা করাতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তথাপি দুই এক জন মনে মনেই ঠাকুরকে মনের কথা জানাইল। পাঠক মহাশয়কে বলিতে ভুলিয়াছি যে, আরতির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পূজারী ঠাকুরের বাম হস্তে একটা একসের ওজনের ঘণ্টা বাজিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর প্রিয়মাধবের বাড়ী যাইবার কথা ছিল বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ তথা গমন করিলেন। পত্রখানি সঙ্গে লইয়া যাইবার আশা বিফল হইল। রিক্তহস্তে গমন করিলেন।

যখন তিনি তথা উপনীত হইলেন, তখন প্রিয়মাধব গৃহে ছিলেন না। তিনি একাকী বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। প্রিয়মাধবের বৈঠকখানাটি অল্পায়তনবিশিষ্ট হইলেও দেখিতে সুন্দর। বৈঠকখানার মধ্যস্থলে ঘর জুড়িয়া এক খানি শতরঞ্চ পাতিত রহিয়াছে। তাহার উপর ঠিক মধ্যস্থলে চারি হস্ত দীর্ঘ ও তিন হস্ত প্রস্থের একখানি গালিচা শোভা পাইতেছে। গালিচার পশ্চাদ্ভাগে একটি বড় এবং বামে দক্ষিণে দুইটি ছোট তাকিয়া পেট ফুলাইয়া পড়িয়া আছে। বৈঠকখানার সর্ব্বসমেত তিনটি দ্বার। তিনটিতেই এক এক খানি করিয়া নারিকেল-ত্বকের পাপোশ পদধূলিতে ভারি হইয়া পাতিত রহিয়াছে। তিনটি দ্বারের উপরে তিন খানি বড় বড় ছবি লম্বিত আছে। সে তিন খানি ছবি এই,—শিবদুর্গা, রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণ। এতদ্ব্যতীত আরও কুড়ী খানি ছবি দেওয়ালের চারিদিকে আলম্বিত আছে। তাহাদের মধ্যে দশখানি বিষ্ণুর দশাবতার ও বাকী দশখানি শক্তির দশমহাবিদ্যা।

ধীরেন্দ্রনাথ বসিয়া রহিলেন। সম্মুখে একটি কাচনির্ম্মিত আলোকাধারে অন্ধকার নাশিবার দ্রব্য জ্বলিতেছে। বাটীর সমস্ত নিস্তব্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুর হইতে সুধাময়ের কণ্ঠশব্দ পাওয়া যাইতেছে। সেই কণ্ঠস্বর চীৎকার, রোদন ও আনন্দসূচক। বহির্দ্বারের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে এক জন দ্বারবান খাটিয়া পাতিয়া শুইয়া আছে। নিদ্রা যায় নাই, শুইয়া শুইয়া নাকী

(সানুনাসিক) স্বরে ধীরে ধীরে ভজন গায়িতেছে। সেই ভজন গান তাহাকেই ভাল লাগিতেছে, অন্যের কর্ণে কর্কশ। দ্বারবানের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সে একাকীই কিন্নরকণ্ঠবিনিন্দিত স্বরের কর্তৃত্ব দেখাইতেছে; কেহ শুনিতেছে না—শুনিলে কালাবৎকে গালি খাইতে হইত। তাহার গীতধ্বনি যেখানে উত্থিত হইতেছে, তাহার কিঞ্চিদ্দূরে গিয়াই বিলয় পাইতেছে—বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে না। প্রবেশ করিলে সুধাময় ভয় পাইত।

এমন সময়ে প্রিয়মাধব দ্বারে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবান্ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়মাধব একবার তাহার দিকে চাহিয়া বৈঠকখানায় যাইবার জন্য সোপানে উঠিতে লাগিলেন। চর্ম্মপাদুকার শব্দ হইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, প্রিয়মাধব আসিতেছেন। প্রিয়মাধব বৈঠকখানাগৃহে প্রবেশ করিয়াই "সংবাদ কি" বলিয়া গালিচার উপর উত্তরীয় খানা ফেলিয়া দিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল নয়।"

"কেন?"

"গোলযোগ ঘটিয়াছে। মহাবিভ্রাট।"

"সে আবার কি?"

"হিরণ্ময়ী জানিতে পারিয়াছেন।"

"পত্রখানা আনিয়াছ কি?"

"হিরণ্ময়ী সে খানা আর অলঙ্কারগুলি আমার শয্যাতল হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। সমস্তই পড়িয়াছেন। পড়িয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি অনন্যোপায় হইয়া তাহা কাড়িয়া লইয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। হিরণ্ময়ীর অত্যন্ত রাগ হইয়াছে।"

এই কথাগুলি শুনিয়া প্রিয়মাধব কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধহেলিত ভাবে উপবেশন করিলেন। কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের ভর দক্ষিণ হস্তের উপর পড়িল আর বাম হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি কেশরাশির মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নেত্র নিমীলন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "ধীর! তুমি ভাবিও না। কোন ভয় নাই।"

ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "ভয় নাই কেমন করিয়া, প্রিয়মাধব ? ভয় সম্পূর্ণ, কারণ হিরণ্ময়ী তাহার বালিকাস্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকেই দোষী করিয়াছে। আমি যে কিরণময়ীকে ভালবাসি, এটি হিরণ্ময়ীর স্থিরসিদ্ধান্ত। যদি সে এই পত্র ও অলঙ্কার লইয়া বাড়ীময় গোল করে, তাহা হইলে তাহার পিতামাতা কি মনে করিবেন ? প্রিয়মাধব ! আমার কি দুরদৃষ্ট। আমি কোন দোষে দোষী নহি অথচ আমারই উপর সমস্ত দোষ পড়িল। আমি সে দিন উদ্যান হইতে পত্র অলঙ্কার আনিয়া ভাল করি নাই। পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিলেই ভাল হইত। কিন্তু কপালে যাহা আছে, তাহা—" এই পর্য্যন্ত বলিলে পর প্রিয়মাধব বলিলেন,

"আমি বেস্ জানি হিরণ্ময়ী কখনই এ কথা লইয়া বাড়ীতে গোল বাঁধাইবেন না। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, যে যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে, সে তাহাকে এইরূপ করিয়া থাকে।—ইহার নাম ভালবাসার অভিমান। আমি বলিতেছি, তোমার কোন ভয় নাই। হিরণ্ময়ী তোমাকে রাগ করিয়া মুখে যাই বলুন, কিন্তু মনে তাহার বিপরীত। তুমি তাঁহার স্বার্থ, সুতরাং তিনি কখনই স্বার্থহানির চেষ্টা করিবেন না। এখন্ একটি কথা শুন,—তুমি তাঁহাকে নিজ নির্দ্দোষিতা আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও। বালিকা বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার। প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তিকে গান শুনাইয়া থামাইতে হইবে, ইহা যেন মনে থাকে।" প্রিয়মাধব নীরব হইলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই। আবার আসিয়া যাহা ঘটে বলিব।"

প্রিয়মাধব বলিলেন, "আহার করিয়া যাও।"

মনে সুখ নাই, সুতরাং ধীরেন্দ্রনাথ অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রিয়মাধব ছাড়িলেন না। সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। উভয়ে একসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ খাইতে পারিলেন না, যেমন পূর্ণপাত্র ছিল, প্রায় তাহাই রহিল। তদ্দর্শনে প্রিয়মাধব দুঃখিত হইলেন, কিন্তু উচ্ছিষ্টপরিষ্কারকারিণী কালিন্দীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

ধীরেন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তায় ডুবিয়াছিলেন,

তাহাই রহিলেন। আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। একজন ভৃত্য তাঁহাকে আহার করিতে ডাকিতে আসিল। তিনি "ক্ষুধা নাই" বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ভৃত্য মুখে "যে আজ্ঞে" কিন্তু মনে "এ বেলা বিধাতা কপালে মাপেন নাই" বলিয়া ফিরিল। পাঠক, মনে করিবেন না যে, ধীরেন্দ্রনাথের কপালে বিধাতা মাপেন নাই। সে আপনার সম্বন্ধেই বলিল। এ বেলা সে ধীরেন্দ্রনাথের প্রসাদলাভে বঞ্চিত।

ধীরেন্দ্রনাথ দ্বাররুদ্ধ করিয়া, শয়ন করিবার সময়ে শয়ন করিলেন। গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃ রাত্রিমান হ্রস্ব, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের পক্ষে শীতকালের অপেক্ষাও দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক অসুখের এক দণ্ড যেন এক প্রহর বলিয়া বোধ হয়। সেই রাত্রিকালে কিরণময়ী বা হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না। তিনিও তাহার চেষ্টা করিলেন না। সারারাত্রি জাগিয়া শেষ রাত্রিতে কিঞ্চিৎ নিদ্রা হইয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহোচ্ছেদ।

এক দিন দুই দিন করিয়া এক সপ্তাহ অতীত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ, কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী আপনাপন চিন্তাকে লইয়া এই কয় দিন অতিবাহিত করিলেন। এই সাত দিনের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ নিজ নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য হিরণ্ময়ীকে কএকবার বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ী তখনও তলাইয়া বুঝেন নাই।

অদ্য ধীরেন্দ্রনাথের শুভদিন। আজ তিনি প্রাতঃকালে কাহার মুখ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু যদি তিনি কাহার মুখ দেখিয়া থাকেন, তবে সে ব্যক্তি সুমুখ—তাহার মুখের মহিমা আছে।

হিরণ্ময়ী একটি চন্দনচর্চ্চিত পুষ্প হস্তে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ একখানি হস্তলিখিত নীতিগ্রন্থ

পাঠ করিতেছেন। কেন যে তিনি উহা পড়িতেছেন, তাহা হিরণ্ময়ীর হৃদয়ঙ্গম হইল না। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর ক্রোধশান্তি ও মতপরিবর্ত্তনের জন্যই পড়িতেছিলেন। কিন্তু আর তাঁহাকে পড়িয়া পড়িয়া, মনের মত শ্লোক খুঁজিয়া মস্তক ঘুরাইতে হইল না। আপনা আপনি উদ্দেশ্য সফল হইবার পন্থা প্রস্তুত হইল।

একটি পুষ্করিণীতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সবলে নিক্ষিপ্ত হইলে উহার জল যেমন উপর্য্যুপরি তরঙ্গ-চক্রে চঞ্চল হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পত্রালঙ্কার-আঘাতিতা হিরণ্ময়ীও প্রথমে কয় দিন উপর্য্যুপরি চঞ্চল হইয়া অদ্য শান্ত হইয়াছেন। অনেক চিন্তা ও মত কাটাকাটির পর তাঁহার চিত্তোদ্বেগ হ্রাস হইয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ আজ কএক দিন ধরিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে যে সকল ক্রোধসূচক অপ্রীতিকর চিহ্ন দেখিয়া আসিতেছিলেন, অদ্য আর তাহা দেখিতে পাইলেন না। তবে কি দেখিলেন?—দেখিলেন বৎসরান্তে বর্ণবিচ্যুত দেবীমূর্ত্তিতে যেন আবার রঙ ফলান হইয়াছে। অদ্য ধীরেন্দ্রনাথের চক্ষু জুড়াইয়া গেল। নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার অন্তরে নূতন চিন্তার আবির্ভাব হইল। যাহা হইবার আশা ছিল না, তাহাই হইল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, উগ্রচণ্ডা আজ অন্নপূর্ণা। প্রাণ জুড়াইয়া গেল। পুঁথি বন্ধ করিয়া হিরণ্ময়ীকে কেবল দেখিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথকে দেখিলে যে হিরণ্ময়ীর পক্কবিম্ববৎ ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা নাচিয়া উঠিত, কএক দিন ধরিয়া তাহা লুকাইয়াছিল,—আজ আবার দেখা দিল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যেন গম্ভীর কাদম্বিনী-মুখে সৌদামিনী দেখা দিল—অন্ধকারে আলোক হইল।

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বসনাঞ্চলের কিয়দংশ ভূতলে লম্বমান হইয়া পড়িয়া রহিল। নিবিড় কেশগুচ্ছ আলুলায়িত। তাহার মধ্যাংশ পৃষ্ঠদেশে এবং অপর দুই ভাগ দুই স্কন্ধ বহিয়া সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল। মনোহর মুখমণ্ডল সেই অসিতচিকুরগুচ্ছের মধ্যে সুশোভিত হইল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, খনির ভিতরে মণি—মেঘবর্ণসরোজলে প্রফুল্ল কমল। হিরণ্ময়ীর যে চক্ষু আজ কএক দিন ধরিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে ভয় দেখাইতেছিল, আজ তাহাই ভরসার স্থল হইল।

হিরণ্ময়ীর চিত্তভাব যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ধীরেন্দ্রনাথ তাহার দুই জন সাক্ষী পাইলেন। সে দুই জন সাক্ষী কে?—নয়নযুগল।

চন্দ্রের কিরণ মলিন দর্পণেও পড়িলে উহা হাসে, হিরণ্ময়ীর হাস্যরেখা বৈমর্ষ্য-মলিন ধীরেন্দ্রনাথের ওষ্ঠাধরে পতিত হওয়াতে উহাও হাসিল। ধীরেন্দ্রনাথ হাসিলেন বটে, কিন্তু এখনও সাহস করিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অগ্রে হিরণ্ময়ীরই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল।

তিনি বলিলেন, "ধীরেন্! এই ফুলটি ধর।"

ধীরেন্দ্রনাথের আর বিলম্ব সহিল না। অঞ্জলি পাতিয়া ফুলটি লইলেন।

তখন হিরণ্ময়ী বলিলেন, "এটি ঠাকুরের ফুল। তুমি এইটি ছুঁইয়া শপথ কর।"

ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, আবার পরীক্ষা। ভাবিয়া বলিলেন, "হিরণ্! কি শপথ করিব?"

"তুমি কাহাকে মন খুলিয়া ভালবাস?"

"যিনি এই প্রশ্ন করিলেন, তাঁহাকে।"

"আর বড় দিদিকে?"

"না।"

"তবে তাঁহাকে কিরূপ ভালবাস?"

"সে ভালবাসা তোমার প্রতিকূল নহে।"

"সত্য?

"তোমার প্রদত্ত দেবপ্রসাদী পুষ্পই তাহার সাক্ষী।"

"ভাল, তাহাই হইল, কিন্তু তোমাকে আর একটি শপথ করিতে হইবে।"

"কি?"

হিরণ্ময়ী সহসা ধীরেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিল, সুতরাং জিহ্বা বাক্য উচ্চারণ করিল না। তাঁহাকে নিরুত্তরে থাকিতে দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই, চুপ করিয়া রহিলে যে?"

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, সুতরাং হিরণ্ময়ী আর নীরব হইয়া থাকিতে পারিলেন না। উত্তর দিলেন, "ধীরেন! তুমি বড় দিদিকে বিবাহ করিবে না বল।"

এই বলিয়াই লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। কিন্তু ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিল। ধীরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন কি না, বলিতে পারি না।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "হিরণ্। বুঝিয়াছি,—এইটিই তোমার মূলকথা। তা' এত শপথ না করাইয়া অগ্রে এইটির উত্থাপন করিলেই ত চুকিয়া যাইত।" আবার হাসিয়া বলিলেন, "ভাল হিরণ। না হয় আমি শপথ করিলাম যে, কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না, কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি ?"

লজ্জাবতী হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইলেন। ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন ধীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "আমি চিরকালই অবিবাহিত থাকিব। আমার একেবারেই বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। বাল্যকাল হইতে তোমাদের দুইটি ভগিনীকে দেখিয়া আসিতেছি, এক্ষণে তোমাদের দুই জনকে দুইটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত এক হইতে দেখিলেই আমার আশা মিটে—চক্ষু জুড়ায়।"

সরলা হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের পরিহাস বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন "কি হইতে কি হইল। আমি কি বলিলাম আর ধীরেন্ কি বুঝিলেন!" এই ভাবিয়া আবার ভাবিলেন, "সত্যই কি ধীরেন্দ্রনাথ একেবারে বিবাহ করিবেন না ? বোধ হয়, বড় দিদিকে ইহাঁর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি এইরূপ গোলযোগ করাতে এক্ষণে বিবাহ-আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতেছেন। বুঝি আমার আশা ভরসা ঘুচিয়া গেল।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্মিতমুখখানি শুকাইয়া গেল—আবার বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিল। মন অস্থির হইল; যেন কি হইতে কি ঘটিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া আসিল। ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরব হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, স্বর্ণ-প্রতিমায় আবার কালিমা আধিপত্য বিস্তার করিল। তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন,—

"হিরণ্ময়ি! তোমার মনের প্রকৃত ভাব কি ?"

বিষাদপ্রতিমা হিরণ্ময়ী নিরুত্তর।

ধীরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "তোমার কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই? তাই কি তুমি বিবাহের নাম শুনিয়া এমন হইলে?"

এবার হিরণ্ময়ী প্রশ্নাত্মক উত্তর করিলেন, "তোমার কেন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই?" ধীরেন্দ্রনাথ যে পরিহাসচ্ছলে বিবাহ করিব না বলিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী তাহার বিপরীত ভাবিয়া মনে মনে ঠিক করিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ জব্দ হইয়াছেন—ফাঁপরে পড়িয়াছেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই কথার যেরূপ উত্তর দিলেন, তাহা হিরণ্ময়ীর কল্পনাকে হারাইয়া দিল। তিনি এই উত্তর দিলেন, "হিরণ! আমি যে কেন বিবাহ করিব না, তাহার নিগূঢ় কারণ আছে।"

অমনি হিরণ্ময়ী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কি কারণ, ধীরেন্? শুনিতে পাই না?" এই বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া আবার নতমুখী হইলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ চতুরতা প্রকাশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, হিরণ্! সে কথা আর কি বলিব? আমি একটি সুন্দরীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা নহে। তিনি, বোধ হয়, আর কাহাকেও স্বামিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং আমি আশায় নিরাশ হইয়া একেবারেই যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিব মনস্থ করিয়াছি। হিরণ! যদি মনের মানুষ পরের হইতে চলিল, তবে আর অন্য এক জনকে কি করিয়া মনের করিব? তুমি নিশ্চয় জানিও, এক জনের দুই জন ঠিক মনের মানুষ হইতে পারে না। সেই জন্য আমারও আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। শুনিলে ত?"

এই কথা শুনিয়া আবার হিরণ্ময়ী কতকটা পূর্ব্বচিন্তার প্রগাঢ় ও অপ্রীতিকর ছায়াতলে পড়িলেন। বলিলেন, "বড় দিদির সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে না বুঝি?"

ধীরেন্দ্রনাথ ঈষৎ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আবার সেই কথা? এই লও তোমার ফুল। যাহার মন সর্ব্বদা সন্দেহের ক্রীতদাস, তাহার শপথ করাইতে আসা বিড়ম্বনা মাত্র।" হিরণ্ময়ী ইতস্তত করিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"ক্ষমা কর, আর বলিব না।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের চিত্তোদ্বেগ উপশম করিবার আশায় বলিলেন, "ধীরেন্! তবে কে তোমাকে হতাশ করিল? এমন নিষ্ঠুরা রমণী কে?"

এইবার ধীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে মনের দ্বার খুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "যে বলে—সে।"

হিরণ্ময়ী লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন—দুই চারি বার ঈষৎ হাসি হাসিলেন। তাঁহার হৃদয় অপরিসীম আনন্দের আশ্রয় হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন। এ ভাবনায় যে অনুপম সুখরাশির বিকাশ হইল, তাহা তাঁহার মুখমণ্ডলই বুঝাইয়া দিল। অনন্তর তিনি বলিলেন,

"ধীরেন্! তুমি কি সত্য বলিতেছ?"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সত্য মিথ্যা আমি জানি না। তবে এইমাত্র জানি যে, ঠাকুরের ফুল হাতে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ যাহা বলিতেছে, তাহাতে হিরণ্ময়ীর বিশ্বাস হয় ভাল, না হয় ধীরেন্দ্রনাথ নাচার।"

হিরণ্ময়ী আর কোন উত্তর করিলেন না। কেবল ধীরেন্দ্রনাথের পদধারণ করিয়া এই বলিলেন, "ধীরেন্! তোমাকে আরও একটি শপথ করিতে হইবে। বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে—আমার সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলে।"

ধীরেন্দ্র সহাস্য মুখে হিরণ্ময়ীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "হিরণ! আমি তোমার উপর রাগ করি নাই, তোমার কোন দোষই দেখিতে পাই নাই, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিবার যোগ্য এমন কোন কার্য্যই কর নাই; তবে নিরপরাধিনীকে কে কোথায় ক্ষমা করে? সেরূপ ক্ষমা যে আকাশকুসুম, হিরণ! তুমি যাহা করিয়াছ, ভাবিয়াছ, তাহা বালিকায় করে। বালিকার তাহাই স্বভাব। সুতরাং বালিকা হিরণ্ময়ীর কার্য্যে দোষ লক্ষিত হয় না।"

হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের এই যুক্তিগর্ভ কথাগুলি শুনিয়াও, তথাপি আব্দার করিয়া বলিলেন, "না, তোমাকে ক্ষমা করিতেই হইবে। তা নহিলে আমি তোমার পা ছাড়িব না।" এই বলিয়া আবার তাঁহার পদধারণ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বাধা দিলেন। বাধা দিয়া বলিলেন, "সাধে কি আমি বলি তুমি বালিকা ?"

"আচ্ছা, আমি বালিকা। তুমি ক্ষমা করিবে কি না ? বল বল, তা নহিলে তোমার পায়ের আঙুল ভাঙিয়া দিব।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর এই ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া' কে বলিবে যে এই হিরণ্ময়ীই সেই হিরণ্ময়ী ?

ধীরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে হিরণ্ময়ীর করতলে নিজ করতল রক্ষা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি দোষী হইয়া থাক, তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

এই মনোমত কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে ভূ-ললাট হইয়া একটি প্রণাম করিলেন। এ প্রণাম চতুরতার নহে সরলতার।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।"

হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসিতে কত মাধুর্য্য, কত সৌন্দর্য্য, কত আনন্দোচ্ছ্বাস যুগপৎ পরিলক্ষিত হইল, তাহা ধীরেন্দ্রনাথের তৃষাতুর নয়নযুগলই জানিতে পারিয়াছিল। এরূপ হাসি ধীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। এই হাসি—এই অনির্ব্বচনীয় হাসি—এই কল্পনাতীত হাসি হাসিয়া হিরণ্ময়ী বলিলেন, "ধীরেন্! আমায় ভুলিও না।" এই কএকটি অক্ষর ধীরেন্দ্রনাথের হৃদয় ও মনের অন্তস্তলে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া জাগরিত হইলেন, নিশার পর দিবা দেখিলেন, দুঃখের পর সুখ দেখিলেন, অন্ধকারের পর আলোক দেখিলেন, নিরাশার পর ভরসা দেখিলেন। অপরিসীম পুলকে মোহিত হইয়া বলিলেন, "ধনেশ-তনয়া হিরণ্ময়ী কখন দরিদ্র ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারেন, কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ধীরেন্দ্রনাথ জীবনের একমাত্র ভালবাসার—পবিত্র ভালবাসার—স্বর্গীয় ভালবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হিরণ্ময়ীকে কখনই ভুলিবে না। যত দিন ধীরেন্দ্রকে যম ভুলিয়া থাকিবে, তত দিন সে আশাস্বরূপিনী হিরণ্ময়ীকে ভুলিবে না, আর যে দিন যম তাহাকে ভুলিতে ভুলিয়া যাইবে, সে সেই দিনই হিরণ্ময়ীকে—" এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র হিরণ্ময়ী কোমল কর-কমল

দিয়া ধীরেন্দ্রনাথের মুখ ঢাকিয়া আর কথা কহিতে দিলেন না। দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, "ছি ছি, অমন কথা বলিতে নাই। আবার যদি ও কথা মুখে আন, তা' হ'লে আমি আর তোমার কাছে আসিব না।"

ক্ষণেক পরে ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল, হিরণ্ময়ি! তুমি কি আমাকে বরাবর মনে রাখিবে?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আমি, ধীরেন্! তোমার মত অত কথা বলিতে জানি না, সুতরাং কেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি তোমায় বরাবর মনে রাখিব কি ভুলিয়া যাইব, তাহা তুমি আমার কার্য্যেই দেখিতে পাইবে।"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার অন্তরনিহিত হৃদয়-সঞ্চিত দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বিমর্ষতা সকলই একে একে বিলীন হইয়া গেল। হিরণ্ময়ীও তত্তাবৎ ভুলিয়া গেলেন। আবার সেই ধীরেন্দ্রনাথ—সেই ধীরেন্দ্রনাথ আর সেই হিরণ্ময়ী—সেই হিরণ্ময়ী।

পাঠক! আইস তোমার সহিত আমরা ঘটনাচক্রকে নমস্কার করি। ঘটনার ষড়যন্ত্রে না হইতে পারে এমন বিষয় আজিও কেহ দেখে নাই—পরেও দেখিবে না।

অনেক ক্ষণ ধরিয়া উভয়ের এই সন্দেহ-নিরাকরণের কথাবার্ত্তা হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল। তখন হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

উভয়েরই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই দীর্ঘকালস্থায়ী কথোপকথনের সময় কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে আইসেন নাই। অদ্য তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ ছিল বলিয়া আসিতে পারেন নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মুখবন্ধ।

ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীতে এই কয় দিন ধরিয়া যেরূপ মনান্তর হইয়া আসিতেছিল, কিরণময়ী এতাবৎ তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। মনান্তরের পর পুনরায় উভয়ের মনোমিলন হইল, ইহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্বে যাহা জানিয়াছিলেন, এখনও তাহাই। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তে, পাঠক মহাশয়, এই কথা বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই কএক দিনের ভাবপরিবর্ত্তনে কিরণময়ী কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? তদুত্তরে আমরা বলি, তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা অন্যরূপ। ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর অসুস্থতা-নিবন্ধন ভাববৈপরীত্য ঘটিয়াছে, ইহাই কিরণময়ী বুঝিয়াছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর পুনর্মনোমিলনের পর দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় দিন গত হইল।

যে দিবস কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিবার ও অলঙ্কার হারাইবার জন্য হিরণ্ময়ীর হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন, সে দিবস হইতে তিনি লজ্জিত ও ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা ধীরেন্দ্রনাথকে মিলাইয়া দিবার আশা দেখাইলেও, তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। ধরা পড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চিত্ত যেরূপ পরিষ্কৃত ছিল, কিন্তু ধরা পড়িবার পরক্ষণ হইতেই তাহা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। মনে বড় লজ্জা, বড় ভয়, কারণ হিরণ্ময়ী রহস্যভেদ করিয়াছেন। তিনি পিতা মাতার অগোচরে এরূপ দুঃসাহসিক ও বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, হিরণ্ময়ী উহা জানিতে পারিয়াছেন। এখন পাছে তিনি বালিকাস্বভাবনিবন্ধন বাড়ীময় গোল করিয়া দেন, এই জন্য কিরণময়ীর বড় লজ্জা ও বড় ভয় হইয়াছে।

কি করিলে তিনি এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। মনে মনে

কতই কৌশলের সৃষ্টি করিলেন—কতই চূর্ণ করিলেন—আবার সেই চূর্ণাংশ মিশাইয়া কতই নূতন করিয়া গড়িলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিল না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন—হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধ। তা' ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। এইরূপ ঠিক করিয়া তাহারই চেষ্টায় রহিলেন। তিনি সকল কার্য্য বিস্মৃত হইয়া কেবল হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধের জন্যই ব্যতিব্যস্ত হইলেন। কিন্তু, তাহাও বলি, তিনি সকল কার্য্য ভুলিয়াও আর এই ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াও ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারেন নাই। যদিও আজ কাল তিনি লজ্জা ও ভয়ে ধীরেন্দ্রনাথকে দেখা দেন না, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকেন। দেখা দিবার বা দেখা করিবার অন্য কিছু বাধা বা কারণ নাই, কেবল হিরণ্ময়ীরই ভয়। পাছে তিনি দেখিলে আরও সন্দেহ করেন, এই জন্যই কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না।

কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেরূপ সাক্ষাৎ করেন না, সেইরূপ হিরণ্ময়ীর নিকটেও সর্ব্বদা থাকেন না। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য। এইরূপ করিতে করিতে চারি পাঁচ দিন গত হইয়া গেল।

এ দিকে হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সকল অভিমান ও ক্রোধ ভুলিয়া গেলেন—পূর্ব্বের ন্যায় হইলেন। এইরূপ হইয়া লোকে আবার যাহা করে, তিনিও তাহাই করিতে লাগিলেন।

এক দিন তিনি একাকিনী সেই উদ্যানের মধ্যে গিয়া আপন মনে পুষ্পচয়ন, মালাগুম্ফন, গুচ্ছবন্ধন করিতে লাগিলেন। কেন যে এরূপ করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে অনুমানে এই বোধ হয় যে, ধীরেন্দ্রনাথকে উপহার দিবার জন্য। পূর্ব্বে তিনি প্রায় এইরূপ পুষ্প-উপহার দিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে সুখী করিতেন, কিন্তু মধ্যে রাগ করিয়া কএক দিনের মধ্যে একটি দিনও আর সেই স্বর্গীয় উপহার দেন নাই। অদ্যই বোধ করি, তাহার পুনরারম্ভ। হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে মালাগুম্ফনাদি সমাপন পূর্ব্বক এক একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পুষ্করিণীতে নামিলেন। নামিয়া সলিল-চুম্বিত সোপানের উপর উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়া অলক্তরঞ্জিত পা দুখানি জলমধ্যে ডুবাইয়া তল-সোপান স্পর্শ করিয়া রহিলেন। পুষ্করিণীর

জল অতিশয় পরিষ্কার। কটিপ্রমাণ জলের ভিতর কি পড়িয়া আছে, তাহা অনায়াসে লক্ষিত হয়। তাঁহার রাঙা পা দুখানি জলমধ্যে মগ্ন হইয়াও আকার লুকাইতে পারিল না। সেই গুল্‌ফ—সেই পদূর্দ্ধভাগ—সেই অঙ্গুলি—সেই নখ এবং সেই রাঙা টুক্‌টুকে অলক্তরেখা স্বচ্ছ সলিল ভেদ করিয়া তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তবে বিস্ময়ের মধ্যে এই যে, জলের ভিতর থাকিয়া পা দুখানি যেন কিছু চেপ্টা দেখাইতে লাগিল। তিনি তদ্দর্শনে এক এক বার জলের মধ্যেই ইতস্তত করিয়া চরণ চালনা করিতে লাগিলেন, চরণ দুইটিও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে তিনি এক এক বার কুন্দবিনিন্দিত সুন্দর দন্ত বিকাস করিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিয়া আবার পা দুখানি কিয়ৎক্ষণ স্থির রাখিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। সেইখানকার জলও স্থির হইয়া রহিল। এমন সময় একটি মীনশাবক আস্তে আস্তে তাঁহার জলমগ্ন পদের এক হস্ত দূরে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। ভাসিয়া থাকিবার জন্য কেবল ধীরে ধীরে পাথ্‌না নাড়িতে লাগিল। কোনমতে সরিল না,কেবল অলক্তরঞ্জিত পদের দিকে নিশ্চল চক্ষে চাহিয়া রহিল। হিরণ্ময়ী সেটিকে দেখিয়া আরও সাবধান হইয়া কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিলেন। কেবল এক এক বার তাহার দিকে আর এক এক বার জলমগ্ন পা দুখানির দিকে দৃষ্টিপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ আশা, ততক্ষণ দেখা হইল। আশাও পূরিল আর পা দুখানিও নড়িল। মীনশাবক "ধর্‌লে রে ধর্‌লে রে" বলিয়া দৌড় দিল। ঘাট ছাড়াইয়া উহার বাম পার্শ্বস্থ তীরে জলমগ্ন শৈবালদলের ভিতর লুকাইল।

মীনশাবক পলাইল—হিরণ্ময়ীরও আর একটি কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি একখানি সদ্যশ্ছিন্ন কদলী পত্রে করিয়া চয়িত পুষ্প, পুষ্পের হার ও পুষ্প-গুচ্ছ সাজাইয়া আনিয়াছিলেন। সেই পত্র খানি অগ্রে ধুইয়া সোপানের উপর রাখিলেন। অনন্তর তাহার উপর পুষ্প প্রভৃতি একটির পর একটি সাজাইয়া অঞ্জলি পূরিয়া সেই গুলিতে জল ছিটাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার অমনোযোগিতায় তদীয় শুষ্ক অঞ্চলের শিরোভাগ ভিজিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া উহা যেমন তুলিয়া লইবেন, অমনি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সবলে লাগিয়া এক ছড়া মালা ছিঁড়িয়া গেল। তিনি তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ

দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া কএকটি ফুল ফেলিয়া দিয়া আবার মালাছড়াটির সূত্র বন্ধন করিলেন। মালাছড়াটি কিছু ছোট হইল—তা হউক।

অনন্তর তিনি আস্তে আস্তে জলসিক্ত পুষ্পমালা প্রভৃতি কদলীপত্রে বন্ধন করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। জল স্থির হইল। তিনি তাহাতে শশাঙ্কসদৃশ মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। মুখ দেখিবার ভঙ্গিই বা কত। কখন জিহ্বা, কখন দন্ত, কখন চক্ষু, কখন কপাললম্বিত কেশগুচ্ছ, কখন ওষ্ঠাধর এবং কখন নাসিকা দেখিতে লাগিলেন। মন ভরিয়া জলদর্পণে মুখ দেখা সাঙ্গ হইল। ফুলের পাত লইয়া আবার এক দুই করিয়া জলসোপান অবধি সর্ব্বোর্দ্ধ সোপান পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত এগারটি সোপান অতিক্রম করিলেন। অবরোহণের সময় কষ্ট হয় নাই, কিন্তু আরোহণের সময় কতকটা হইল। পাঠক মহাশয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয় অবগত থাকিলে এই কষ্টের কারণ বুঝিতে পারিবেন। সেই পুষ্করিণীর চারি দিকে চারিটি ঘাট ছিল। হিরণ্ময়ী দক্ষিণ দিকের ঘাটে এই পুষ্পসিক্তকরণ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এক্ষণে অপরাহ্ন। হিরণ্ময়ী উপরে উঠিয়া চাতালের পশ্চিম পার্শ্বস্থ রোয়াকের উপর বসিয়া দক্ষিণ দিকে কদলীদলাবদ্ধ পুষ্পগুলি রক্ষা করিলেন। অপরাহ্ন উপনীত হওয়াতে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে সরিয়া বসিলেন। তাঁহার উত্তপ্ত কর শীতল হইয়া আসিল এবং তিনি শ্বেতপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া রক্তপরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। তাঁহার লোহিত কিরণ-রেখা উদ্যানের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। উদ্যানের বৃক্ষ লতা পুষ্প পত্র তৃণ সমস্তই রক্তাভায় ঈষৎ রঞ্জিত হইল। হিরণ্ময়ী যে রোয়াকের উপর বসিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি বকুল বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাদি এত বড় যে, সে গুলিতে রোয়াক ছাইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ দুইটা শাখা রোয়াক ডিঙ্গাইয়া চাতালের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। সেই বকুলবৃক্ষের পক্বপত্র ও শিথিলবৃন্ত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমাবলি বাতাসে আঘাতিত হইয়া ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। জলে, সোপানে, চাতালে ও চাতালের বহিঃস্থ ভূখণ্ডে থাকিয়া থাকিয়া অনেক পত্র ও পুষ্প ঝরিয়া পড়িতেছিল।

পরিশ্রমী সমীরণ অনুগ্রহ করিয়া সেই বকুলবৃক্ষের পুষ্প সৌরভ লইয়া সরোবর-তটকে আমোদিত করিতেছিল।

হিরণ্ময়ী বকুলবৃক্ষের ছায়াবৃত রোয়াকে কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া চাতালে নামিলেন। একটি একটি করিয়া অনেকগুলি ভূপতিত বকুলফুল কুড়াইয়া অঞ্চলে বাঁধিলেন। এক এক বার সেই কুসুমাবদ্ধ পুঁটলি নাসিকাগ্রে ধরিয়া ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। এত ফুল কুড়াইয়াও তাঁহার আশা মিটিল না। তিনি আবার কুড়াইতে বসিলেন। দক্ষিণ হস্তে কুড়া-ইয়া বামহস্তে রাখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বামহস্তের আকুঞ্চিত তলভাগ ফুলে পূরিয়া আসিল। সেই ফুলগুলি রোয়াকের উপর রক্ষা করিয়া চাতালের বহির্ভাগে গিয়া আবার ফুল কুড়াইতে লাগিলেন। কুড়াইতে কুড়াইতে একখণ্ড খড়ি দেখিতে পাইলেন। সেই খড়িখানি তুলিয়া লইয়া পুষ্পসংগ্রহ বন্ধ করিলেন। পুনর্ব্বার চাতালের উপর আসিয়া পা ঝুলাইয়া বসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তাঁহার মনে একটি ভাবের আবির্ভাব হইল। উহা কি? না, লিখিবার ইচ্ছা। তিনি সেই খড়িখণ্ডে অন্য কিছু লিখিবার পাইলেন না। পাইলেন ধীরেন্দ্রনাথের নাম। ছোট বড় অক্ষরে রোয়াকের উপর লিখিতে লাগিলেন 'ধীর—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ'। এইরূপ লিখিয়া, বৃক্ষ লতা মৎস্য পক্ষী প্রভৃতির কএকটি চিত্র অঙ্কন করি-লেন। তথাকার স্থান ফুরাইয়া গেল। হিরণ্ময়ী সরিয়া বসিলেন। সরিয়া সেখানে লিখিলেন 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী।' এইরূপে আরও কত কি লিখিয়া লেখা সাঙ্গ করিলেন। অনবরত প্রস্তরের উপর খটিকাখণ্ড ঘর্ষিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী সেই অবশিষ্ট খণ্ডটুকু ছুড়িয়া পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিলেন। টুব্ করিয়া একটি সুমিষ্ট শব্দ হইল।

অনন্তর হিরণ্ময়ী রোয়াকের উপর বসিয়া বসিয়াই উদ্যানের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন। যতদূর তাঁহার দৃষ্টি চলিল, তিনি ততদূরই বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। রোয়াক হইতে কতকটা দূরে রজনীগন্ধের কএকটি কোরক সদ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। কুসুমলোলুপা হিরণ্ময়ী আর থাকিতে পারিলেন না—সেগুলিকে বৃন্তবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য

তাড়াতাড়ি সেই দিকে চলিলেন। যাইবার সময় পথের দুই পার্শ্বে আরও কএক প্রকার ফোটাফুল ছিঁড়িয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইলেন। প্রথমতঃ পুষ্প কএকটি না ছিঁড়িয়া, নাসিকা সন্নত করিয়া ঘ্রাণ লইলেন। ঘ্রাণ লইয়া ছিন্ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কিছু দূরে কিরণময়ী আসিতেছেন। তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আগমন কাল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

অনন্তর কিরণময়ী যেমন কাছাকাছি হইলেন, অমনি হিরণ্ময়ী "বড় দিদি! এই রজনীগন্ধ ফুল ছিঁড়িব?" বলিয়া এক প্রকার মধুর হাসি হাসিলেন। কিরণময়ীও হাসির বিনিময়ে হাসি দিয়া বলিলেন, "দেখিও যেন কুঁড়িশুদ্ধ ভাঙ্গিও না—আস্তে আস্তে ফোটা ফুলগুলি তুলিয়া লও।" কিরণময়ী হাসিয়া এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু এই হাসি মনের নহে—মুখের। হিরণ্ময়ী হাসিলেন—তিনিও হাসিলেন। এরূপ হাসিকে দাঁতের হাসি' বলে। মনের ভিতর রোদনের প্রস্রবণ খুলিয়া গিয়াছে কিন্তু পরের জন্য তাহাকে চাপা দিয়াও হাসিতে হয়। কিন্তু এরূপ হাস্যের জীবনীশক্তি নাই। কিরণময়ীও এইরূপ নির্জ্জীব হাসি হাসিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না।

অনন্তর হিরণ্ময়ী অগ্রজা ভগিনীর পরামর্শানুসারে আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত কুসুম কএকটি ছিঁড়িয়া লইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি ফুল—তন্মধ্যে হইতে দুইটি কিরণময়ীকে দিলেন, বাকী দুইটি আপনি লইলেন। কিরণময়ী সাদরে কনিষ্ঠাভগিনীপ্রদত্ত পুষ্পোপহার গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "হ্যা দেখ, হিরণ! এখানে আসিবার সময় ঐ ওখানে একখানা ভূপতিত ইষ্টকখণ্ডে আমার বাঁ পায়ে হোঁচট্ লাগিয়াছে—বড় যন্ত্রণা হইতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। চল, পুষ্করিণীর জলে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকি।" এই কএকটি কথা বলিবার সময় কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে কষ্টচিহ্ন প্রকাশিত হইল। বাস্তবিক তাঁহার বাম পদে আঘাত লাগিয়াছিল।

হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর কথা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সহিত পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকের ঘাটে গেলেন। উভয়ে

এক সঙ্গে সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া জলের নিকট উপনীত হইলেন। কিরণময়ী সোপানের উপর চাপ্টালি হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ পদ বাম উরুর উপর রক্ষা করিয়া, বাম পদের অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহার বাম দিকে উবু হইয়া বসিয়া জলমধ্যে দক্ষিণ হস্ত প্রবেশ করাইয়া, ধীরে ধীরে আঘাতিত স্থল স্পর্শ করিতে লাগিলেন। কিরণময়ী সেই কোমলস্পর্শনে আরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর দুইটি জীবন্ত প্রতিমা তথা হইতে উপরে উঠিলেন।

কিরণময়ী অগ্রে আর হিরণ্ময়ী পশ্চাতে থাকিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ! দক্ষিণ ঘাটে বকুলফুল কুড়াই গিয়া চল।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! আমি এই কতক্ষণ সেখানে অনেক বকুলফুল কুড়াইয়া রোয়াকের উপর রাখিয়াছি। চল, সেইগুলির অর্দ্ধেক তোমাকে দিব। সেই ফুলগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ চারি ছড়া মালা হইবে।" কিরণময়ী তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর উভয়ে দক্ষিণ ঘাটে উপনীত হইলেন।

কিরণময়ী উপনীত হইয়াই দেখিলেন, রোয়াকের একস্থানে কতকগুলি বকুলফুল—একস্থানে ফুলযোড়া কলাপাত আর যেখানে সেখানে তরু লতা মীন পক্ষীর চিত্র মিশ্রিত ধীরেন্দ্রনাথের নাম। অন্যগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে একরূপ ভাবোদয় হইল, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের নামাবলি দেখিয়া আর একপ্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হইল। এ ভাব বড় ভয়ানক ভাব—অনেক দিনের সঞ্চিত আশা পূরণের ভাব—হিরণ্ময়ীর মুখবন্ধের ভাব। ভাবি-অনভিজ্ঞা হিরণ্ময়ী না বুঝিয়া আপনা আপনি ফাঁদে পড়িবার পন্থা প্রস্তুত করিলেন। তিনি এক ভাবিয়া কিরণময়ীকে বকুলফুল দিতে আনিলেন, কিন্তু আর একরূপ ঘটিবার সূত্রপাত হইল। এবং কিরণময়ী এক ভাবিয়া হিরণ্ময়ীর সঞ্চিত বকুলফুল লইতে আসিলেন, কিন্তু আর একরূপ হইয়া দাঁড়াইল। মানবকার্য্যের এক কার্য্যের পরিণাম অনেক সময়ে এইরূপ অন্য কার্য্যের পরিণামে দাঁড়ায়।

এই কার্য্যটির বা ঘটনাটির পরিণাম দাঁড়াইল,—হিরণ্ময়ীর বিপৎপাত আর কিরণময়ীর বিপদনাশ। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু কিরণময়ী পারিলেন।

হিরণ্ময়ী রোয়াকের নিকট দাঁড়াইয়া সঞ্চিত বকুলফুলগুলি দুই ভাগ করিলেন, কিন্তু এক ভাগে বেশী ও অপর ভাগে কম ফুল পড়িল। তিনি তদ্দর্শনে বেশীর ভাগ হইতে কতকগুলি ফুল লইয়া কমের ভাগে দিয়া সমান করিলেন। হিরণ্ময়ী যখন এইরূপ করিতেছিলেন, তখন কিরণময়ী তাহা দেখেন নাই। তিনি দেখিতেছিলেন, খটিকাসঞ্জাত চিত্র ও লিখন এবং মনে মনে পড়িতেছিলেন, "ধীর—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ"। তাহার পর আর এক ধারে পড়িলেন, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী।' শেষ পংক্তি পড়িয়া কিরণময়ী চমৎকৃত হইলেন, ভাবিলেন, "আর যায় কোথা ?"

এ দিকে হিরণ্ময়ী সহাস্য মুখে বিভক্ত বকুল ফুলের এক ভাগ কিরণময়ীকে দিলেন। তিনিও তাহা আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। তার পর হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি এ ফুলে মালা গাঁথিবে, না অমনি রাখিবে ?"

কিরণময়ী উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা করিবে, আমিও তাই করিব।"

হিরণ্ময়ী।—"আমি ঐ অশোক তলায় সূঁচ সুতা রাখিয়া আসিয়াছি। চল, দিদি! ঐ খানে বসিয়া দুই জনে মালা গাঁথিগে। আর দেখ, তোমার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, সে জন্য যদি তোমার মালা গাঁথিতে কষ্ট হয়, তা' হ'লে তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও, আমি তোমারও মালা গাঁথিয়া দিব, কেমন ?"

কিরণময়ী এই কথাগুলি শুনিলেন বটে, কিন্তু অমনোযোগের সহিত। এই অমনোযোগিতার কারণ ধীরেন্দ্রনামাবলী। তিনি হিরণ্ময়ীর করে ধীরেন্দ্রনাথের নাম নানা আকারে লিখিত দেখিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, সুতরাং হিরণ্ময়ীর সমস্ত কথা ভাল করিয়া শুনিতে পাইলেন না। অথচ কথার উত্তর না দেওয়াও ভাল নয় বলিয়া উত্তর দিলেন, "সূতা না থাকে, তবে কদলীত্বকে গাঁথিলেও হইবে। একটু অপেক্ষা কর, যাইতেছি।" এই

বলিয়া মনে মনে আর একবার পড়িলেন, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্র-নাথের আমি হিরণ্ময়ী।' বুঝিলেন হিরণ্ময়ীও ধীরেন্দ্রনাথের জন্য পাগলিনী। শুধু তিনিই নহেন।

কাজের কথার বাজে উত্তর পাইয়া হিরণ্ময়ী গোলযোগে পড়িলেন। ভাবিলেন, "বড় দিদি কেন এরূপ উ'টা কথা কহিলেন? ইনি কি ভাবিতে ছেন?" এই ভাবিয়া তাঁহার নয়নের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বড় দিদির দৃষ্টিরেখা তাঁহার লিখিত ধীরেন্দ্রনাথের নামাবলীর উপর ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মনে মনে চম্‌কাইয়া উঠিলেন। বুঝিতে পারিলেন, নিজের বিপদ নিজে ঘটাইয়াছেন—বড় দিদি জানিতে পারিয়াছেন। আর কাল-বিলম্ব না করিয়া কিরণময়ীর দৃষ্টি অবরোধ করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই বলিতে লাগিলেন, "বড় দিদি! সুতা আছে; চল না, শীঘ্র করিয়া মালা গাঁথিগে। আর যে বেলা নাই।" এই কথা ব্যতীত তিনি বাধা দিবার অন্য উপায় পাইলেন না। কিরণময়ীর সম্মুখে লেখা মুছিয়া ফেলিলে আরও বিপদ, সুতরাং চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দেওয়াই উপযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু সরলা বালিকা বুঝিতে পারি-লেন না যে, কিরণময়ী গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিতে জানেন। হিরণ্ময়ী আর একটি ফিকির খাটাইয়া বলিলেন, "বড় দিদি! ঐ পূর্ব্ব দিকের পাঁচিলের কাছে আম গাছে আম ধরিয়াছে, ওর নাম কি আম বড় দিদি? চল না, আমাকে গোটা দুই তিন পাড়িয়া দিবে—চল না, বড় দিদি!" কিন্তু এ ফিকিরও খাটিল না। কেমন করিয়া খাটিবে?—কিরণময়ী যে সব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার যাহা করিবার ইচ্ছা, এত দিন পরে তাহার গোড়া পাইলেন, তবে কি তিনি এখন আর মালা গাঁথিতে যাইবেন, না—আম পাড়িতে যাইবেন?

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কথার উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হিরণ্! এ সব কাহার হাতের লেখা?" এই বলিয়া তাঁহার চিবুকে কর স্পর্শ করিলেন। এই প্রশ্ন করিবার সময় কিরণময়ী গ্রীবা সঞ্চালন ও চক্ষুর্ভঙ্গি করিয়াছিলেন। প্রশ্ন করিবার সময় প্রায় সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে।

হিরণ্ময়ী কি উত্তর দিবেন, ঠিক্ করিতে পারিলেন না। ক্ষণেক কাল ভাবিয়া বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিব ?"

কিরণ।—কেমন করিয়া জানিবে কি ? আমি কি তোমার হাতের লেখা চিনি না, হিরণ ? এ কি,—'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী' ? ইহা কে লিখিল, হিরণ ?"

হিরণ্ময়ী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া অনন্যোপায় হইয়া স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "আমিই লিখিয়াছি, বড় দিদি !" এই কথা কএকটি আস্তে আস্তে বলিলেন। দোষী ব্যক্তি ফাঁদে পড়িয়া দোষ স্বীকার করিবার সময় যে রূপ ভাব প্রকাশ করে এবং যেরূপ ভাবে বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, হিরণ্ময়ীও ঠিক্ তাহাই করিলেন। এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে তাঁহার মনে এক প্রকার কষ্ট হইল।

কিরণময়ী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছ ?"

হিরণ্ময়ী কিরণময়ীর পদাঙ্গুষ্ঠের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হাত পাকাইবার জন্য।"

কিরণ।—"কালী নাম দুর্গা নাম প্রভৃতি ছাড়িয়া এই কি তোমার হাত পাকাইবার উপকরণ ?"

হিরণ।—"যখন যা' মনে আসে।"

কিরণ।—"আচ্ছা, দিদি ! তা' যেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী' এই পংক্তি লেখাতে কে তোমার হাত পাকাইবার কথায় বিশ্বাস করিবে? যাই হউক, হিরণ! আমি সব বুঝিয়াছি।"

হিরণ্ময়ী মহাসঙ্কটে পড়িলেন। এই কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি কি ছিলেন আর এক্ষণেই বা কি হইলেন ! বড় দিদির উপকার করিতে আসিয়া নিজের অনভিজ্ঞতায় নিজের অপকার করিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কেন আমি এরূপ লিখিলাম ? লিখিলাম ত কেন মুছিয়া ফেলিলাম না ? বড় দিদি ত এখন জানিতে পারিলেন। কি মনে করিতেছেন ? আমি যে ধীরেনকে খুব ভালবাসি, তা এ লেখায় এক প্রকার ধরা পড়িল। আর ত এড়াইবার যো নাই। বড় দিদি পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারেন নাই, —আজ আমার দোষেই সমস্ত জানিতে পারিলেন। আবার বলিতেছেন,—

'সব বুঝিয়াছি'। এখন কি করি?" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিরণময়ী তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "হিরণ! ধীরেন্দ্রনাথের উপর তোমার এত টান কেন? তুমি কি তাঁহাকে বিবাহ করিবে?"

"সে কি, দিদি! কে তোমাকে ও কথা বলিল? কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ?" মনের ভাব গোপন করিয়া, যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে হিরণ্ময়ী এই কএকটি কথা উচ্চারণ করিলেন।

কিরণ।—তা' হ'লেই বা;—আমি আজ এখন মাকে এ কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাহাতে তোমার শুভ বিবাহ হয়, তাই করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। কেন তুমি আমাকে এত দিন এ কথা বল নাই?"

হিরণ্ময়ী ভীত হইয়া বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি আপনা আপনি বিবাহের কথা পাড়িতেছ। আমি কিছুই জানি না। নাম লিখিলেই কি বিবাহ করিতে হয়? উত্তরপাড়ার হৈমবতী কত লোকের যে নাম লেখে, তা বলিয়া কি সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে? আমিও যে কত লোকের নাম লিখি।"

কিরণময়ী হাসিয়া বলিলেন, "সে সকল নাম লিখিবার ধরণ অন্যরূপ, কিন্তু, 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী' এরূপ লেখার ধরণ আর একরূপ।"

কথায় কথায় কিরণময়ী এই পংক্তিটি আবৃত্তি করাতে হিরণ্ময়ী ক্রমশই নিজ মত বজায় রাখিতে অকৃতকার্য্য হইলেন। যে কথাটি বলেন, সেইটিই ফাঁসিয়া যায় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

কিরণময়ী আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই, মাকে তোমার হাত পাকাইবার কথা বলিগে।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও ভীত হইয়া কিরণময়ীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন। বিনীতভাবে বলিলেন, "বড় দিদি! তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমাকে যা করিতে বলিবে, তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি,—আমি তাহাই করিব।"

কিরণময়ী বলিলেন, "শপথ করিয়া বলিতেছ, তাহাই করিবে?"

"হাঁ, বড় দিদি! তাহাই করিব—তোমার শপথ।"

"তুমি ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে আমার যে পত্র ও পাদ-ভূষণ পাইয়াছিলে—যাহা আমাকে দেখাইয়া ভয় দেখাইয়াছিলে, সে কথা তুমি মাকে বাবাকে বা বাড়ীর অন্য কোন লোককে বলিবে না বল?"

"তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রাণান্তেও বলিব না।"

"কালীগঙ্গার দিব্য?"

"কালীগঙ্গার দিব্য।"

"আমার দিব্য?"

"তোমার দিব্য।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

"কখন বলিবে না?"

"কখন বলিব না।"

এবার কিরণময়ী নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি কালীগঙ্গার দিব্য, আমার দিব্য আর ত্রিসত্য করিলে; দেখিও যেন ভুলিয়াও ইহার ব্যত্যয় করিও না।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! আমি শপথ করিয়া কখন লঙ্ঘন করি নাই—করিবও না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

এ কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ! তুমিও নিশ্চয় জানিও যে, তুমি আমার এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে আমিও তোমার এই সমস্ত কথা সকলকে বলিয়া দিব। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও, তুমি না বলিলে আমিও বলিব না।"

হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বড় দিদি আজ আমাকে খুব জব্দ করিয়াছেন। শুধু জব্দ নয়, লজ্জাও দিয়াছেন। যাই হউক, দুই জনে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দুই জনেরই মনের কথা মনে চাপা থাকিল।"

কিরণময়ীও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আজ আমি মহেন্দ্র ক্ষণে বাগানে পা বাড়াইয়াছিলাম।—কোন্ দিন হিরণ্ময়ী কাহার নিকট কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিত, আজ আমার সৌভাগ্যক্রমে তাহার মুখবন্ধ হইল। এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।" তিনি এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন, "হিরণ! আমি পায়ে একটু চুণ হলুদ গরম করিয়া দি গিয়া—না হ'লে রাত্রিতে ব্যথা আরও বাড়িবে।" এই বলিয়া কিরণময়ী হিরণ্ময়ী-প্রদত্ত বকুলফুলগুলি লইয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী আবার রোয়াকের উপর বসিয়া কিয়ৎকাল কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি কদলীপত্র খুলিয়া খোলা ফুল, ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া সমস্তই পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। কি জন্ত এত কষ্ট করিয়া সে গুলির সঞ্চয়ন ও গ্রন্থন করিয়াছিলেন, তাহা আর ভাবিলেন না—রাগ করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। ফুলগুলি ভাসিতে ভাসিতে কতক পার্শ্ববর্ত্তী তটে সংলগ্ন হইয়া গেল, কতক জলেই ভাসিতে লাগিল।

অনন্তর হিরণ্ময়ী মুখ ভার করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার দৃষ্টিরেখা অন্য কোন পদার্থের উপর একবারও আকৃষ্ট হইল না। তিনি কেবল অধোমুখ হইয়া মাটীর দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা মনেই রহিল।

হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। কিরণময়ীর নিকট যেরূপে অপ্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের জন্য সকল ভুলিয়া গেলেন। যাঁহাকে কখন তিলার্দ্ধ কালের জন্যও ভুলেন নাই, এ হেন ধীরেন্দ্রনাথকেও কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত ভুলিয়া গেলেন।

এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার যে চিত্ত-ফলকে নানাবিধ মনোহর বর্ণপূর্ণ তুলিকা-বলী আলিম্পিত হইতেছিল, এক্ষণে সেই চিত্ত-ফলকে এই এক অঘটন ঘটনার কালি পড়িয়া অসুন্দর করিয়া তুলিল। কিরূপে সুস্থির হইবেন—কিরূপে মনকে প্রবোধ দিবেন, আর কিরূপেই বা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তাহার কিছুই কূলকিনারা করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তর্জগতে মহাবিপ্লব ঘটিল। তাহার ফলস্বরূপ বিষম বিষণ্ণতা আসিয়া তাঁহার সুপ্রসন্ন ও কবিকুলবর্ণনীয় মুখমণ্ডলকে আক্রমণ করিল।

এই অসুস্থকরী অবস্থায় হিরণ্ময়ীর কতক্ষণ কাটিয়া গেল। অনন্তর তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আর কাহাকেও নয়, কেবল ধীরেন্দ্রনাথকে এ ঘটনা-বৃত্তান্ত একবার বলিবেন। কিন্তু শপথের ভয় মনে সমুদিত হইল। কাজেই বলিবার বাসনা বিসর্জ্জন দিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে সন্দেহ কি?—না, ধীরেন্দ্রনাথকেও এ কথা বলিলে তাঁহার ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবে। সে বিপদ আর কিছুই নয়—কেবল পাছে ধীরেন্দ্র নিজেও বিপদে পড়িবার ভয়ে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হইয়া যান। বাস্তবিক তিনি মনে করিতে পারেন যে, যেকালে হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার এতদূর লুক্কায়িত ভালবাসা কিরণময়ী জানিতে পারিয়াছেন, সেকালে বাড়ীশুদ্ধ লোকে ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে, সুতরাং হিরণ্ময়ীর প্রতি তাঁহার এতাদৃশ ভালবাসা প্রদর্শন করা আর ভাল নহে। হিরণ্ময়ীও তাহাই মনে করিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে এই কষ্টকরী ঘটনার কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে সাহস পাইলেন না। মনের মানুষকে মনের কথা বলিতে না পাইলে যে দুঃখ হয়, দুঃখিত হিরণ্ময়ীরও তাহাই হইল। এই দুঃখে তিনি আপনার ভাগ্যকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া রাত্রি প্রভাত হইল।

পর দিন প্রভাতেও হিরণ্ময়ীর সেই চিন্তা। তিনি এক এক বার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন, আবার উঠিয়া বসিলেন, আবার গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া অলিন্দছাদনস্থিত স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্মুখের দেওয়ালে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই দৃষ্টি স্থানে তুমি আমি কি দেখিব? না—কেবল পরিষ্কার চূর্ণলেপন। কিন্তু

তিনি সেখানে কি দেখিতে লাগিলেন ?—মা এই ঘটনাসঞ্জাত কষ্টোচ্ছ্বাস। তাঁহার দৃষ্টিতে তেমন শ্বেতবর্ণ দেওয়ালও যেন মসিম্রক্ষিত হইয়া গিয়াছে।

তিনি যে স্তম্ভটিতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইটির মস্তক হইতে একটি কড়ি সম্মুখস্থ দেওয়ালের উপর পর্য্যন্ত লম্বমান্ থাকিয়া ছাদভার বহন করিতেছিল। সেই কড়িটির মধ্যস্থলে একটি লোহার কড়া সংলগ্ন ছিল। সেই কড়াতে একটি লৌহশিক ঝুলিতেছিল। আবার সেই শিকে একটি পিত্তলের দাঁড়—সেই দাঁড়ে একটি চন্দনা পক্ষী। পাখিটি হিরণ্ময়ীর। যখন হিরণ্ময়ী সেখানে আসেন নাই, তখন চন্দনা চক্ষু দু'টি বুজিয়া, একটি পা গুটাইয়া নিঃশব্দে তাহার পূর্ব্বনিবাস ভাবিতেছিল। কিন্তু যখন হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পদশব্দে তাহার চক্ষু দু'টি খুলিয়া গেল। সে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া তাড়াতাড়ি নীচে চাহিয়া দেখিল। দেখিল জগদীশপ্রসাদের অন্যতম পোষ্য হাঁড়িভাঙ্গা হুলা বিড়াল নহে, তাহার পালিকা মাতা হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, সুতরাং সেও হিরণ্ময়ীকে বড় চিনিত। যখন হিরণ্ময়ী প্রথমতঃ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সে পাদবদ্ধ শৃঙ্খল টানিতে টানিতে এবং পক্কবিম্ববিনিন্দিত চঞ্চুতে দাঁড়ের শিক কামড়াইতে কামড়াইতে উপরে গিয়া বসিল। সেখান হইতে দুই চারি বার ঘাড় নাড়িল, আবার পাদমুষ্টি শিথিল করিয়া নীচে নামিল। নামিবার সময় দাঁড়সংলগ্ন একদিকের বাটীর ফাঁকে তাহার পাদবদ্ধ শৃঙ্খল জড়াইয়া গেল—টান পড়িল। সুতরাং সে চঞ্চুযুগলে উহা ছাড়াইয়া মধ্যস্থলে বসিল। সে এইরূপ করিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। সে তখন অভিমানভরে ঝুলিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা যে, সে অবশেষে এইরূপ করিয়াও হিরণ্ময়ীর আদর লাভ করিবে, কিন্তু উল্টা হইয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময়ী তাহাকে আদর করিলেন না—বরং অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক বিরক্ত স্বরে "চুপ্ কর্" বলিয়া ধমকাইলেন। চন্দনা কি করে, অগত্যা দাঁড়ে উঠিয়া বসিল। বসিয়া দুইবার "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া উঠিল। ঠিক্ এমন সময়ে উহার সুমধুর কণ্ঠে এইরূপ কথা ধ্বনিত হওয়াতে মনে হইল, যেন সে সহকারিণীর নিকট বিনা দোষে ভৎর্সিত ও

অনাদৃত হইয়াই মনের দুঃখে "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া আত্মসান্ত্বনা করিল।

হিরণ্ময়ী কি ভাবিয়া তখন তাহাকে দাঁড় সমেত নামাইয়া পুনর্ব্বার নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চন্দনা আহ্লাদে অষ্ট খণ্ড হইল। হিরণ্ময়ী তাঁহাকে যতগুলি বুলি শিখাইয়াছিলেন, সে এক একটি করিয়া কোনটি অর্দ্ধ ও কোনটি পূর্ণাংশে আওড়াইয়া দিল। হিরণ্ময়ী দুর্ভাবনা ভুলিবার জন্য তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। চন্দনা তাঁহার কোমল করস্পর্শ-সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া এক একবার চক্ষু নিমীলন ও এক একবার উন্মীলন করিতে লাগিল। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে হিরণ্ময়ী দুর্ভাবনা ভুলিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না।

অনন্তর তিনি চন্দনাকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, কিরণময়ী তখন সেখানে অনুপস্থিত। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হিরণ্ময়ী সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে গেলেন। তিনিও তখন সেখানে ছিলেন না। হিরণ্ময়ী তাঁহার আগমন-অপেক্ষায় কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন, কিন্তু বাসনা নিষ্ফল হইল। তখন তিনি ধীরেন্দ্রনাথের লিখিবার উপকরণ লইয়া লিখিলেন—'মনের কথা মনেই রহিল'। এই পংক্তিটি লিখিয়া ধীরেন্দ্রনাথের বসিবার চৌকিতে মস্যাধার চাপা দিয়া রাখিলেন। আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকিলেন না—আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

পাঠক! তুমি মনে করিতে পার যে, হিরণ্ময়ী শপথ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন কেন? কিন্তু ইহা ধীরেন্দ্রকে বলিবার জন্য নহে—মনের আবেগের জন্য। ইহা তাঁহার তাৎকালিক মনের এক প্রকার ভাব।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিয়বস্তু বিসর্জ্জন।

হিরণ্ময়ী প্রাতঃকালে যখন ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, ধীরেন্দ্র তাহার অনেকক্ষণ পূর্ব্বে, এমন কি সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। এই জন্ত তাঁহার সহিত হিরণ্ময়ীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি যে স্নান করিতে গিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে হয় ত হিরণ্ময়ীও সেখানে যাইতেন। কিন্তু জানিতে পারেন নাই বলিয়াই আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এ দিকে ধীরেন্দ্রনাথ উদ্যানে গিয়া প্রথমত কিয়ৎকাল এদিক ওদিক করিয়া প্রভাত-বায়ু সেবন করিলেন। এই উদ্যানে সে দিন রাত্রিকালে তিনি কিরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে এক একবার আপনা আপনি নীরবে হাসিলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী যদি আজিও বাঁকিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই হাসি যে কোথায় থাকিত, এমন স্থান খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। সেই দিনের সেই অনর্থপাত পরতে পরতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আজ তাঁহাকে আরও যে কি করিত, তাহা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হইয়াছে,— তিনি মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ পুষ্করিণীর দক্ষিণ ঘাটে পদার্পণ করিলেন। চারিটি ঘাটের মধ্যে এই ঘাটটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও পরিষ্কার। গোকুল মালীর সম্মার্জ্জনীর সুকোমল ঘর্ষণে ইহার সোপান গুলিতে শৈবাল স্থান পাইত না! স্ত্রীলোকেরা উত্তর ঘাটে এবং পুরুষেরা এই ঘাটে স্নান করিত। ধীরেন্দ্রনাথ কখন নন্দনকাননের রাধাকুণ্ডে কখন এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন। স্নান জন্ত পুষ্করিণীনির্ব্বাচন তাঁহার ইচ্ছাধীন। অদ্য তিনি এই পুষ্করিণীতেই স্নান করিতে আসিয়াছেন।

এক্ষণে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে লোহিতরাগে উদিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাঁহার রক্তরঞ্জিত কিরণ উদ্যানের মধ্যে বিশেষরূপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। না পারিবার কারণ উচ্চ প্রাচীর। কিন্তু বাগানের ভিতর বেশ আলোক হইয়াছে। বৈশাখ মাস বলিয়া গত রাত্রিতে উদ্যানস্থ বৃক্ষলতা-গুলির ফলপুষ্প বিশেষরূপে শিশিরসিক্ত হয় নাই, কিন্তু সতেজ হইয়াছে। এখনও উদ্যানের সমুদয় স্থল শীতল। পাখীগুলি নীড় ছাড়িয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে বসিয়া সুমধুর শব্দ ছাড়িতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ শীতল হইয়া কুসুমসৌরভ উড়াইতেছে। মনোহর প্রভাত।

ঠিক এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথ দক্ষিণ ঘাটে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়াই বাম দিকের রোয়াকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ রোয়াকের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, যেখানে সেখানে খড়িতে লেখা আছে 'ধীর—ধীরেন্—ধীরেন্দ্র—ধীরেন্দ্রনাথ'; তাহারই মধ্যে একস্থলে 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। ধীরেন্দ্রনাথ শেষের পংক্তিটি দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত হইলেন। তিনি হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর চিনিতেন, তাহাতে আবার নীচে লেখা আছে 'হিরণ্ময়ী। কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল—বিদ্যুদ্বেগে প্রবেশ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ বিভোর! ধীরেন্দ্রনাথ মোহিত! তাঁহার মনে প্রতিনিমেষপাতে কত কি আবির্ভূত, তিরোহিত ও পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইতে লাগিল। লেখাগুলি পুনর্ব্বার আদ্যোপান্ত পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, 'এটি মাছ—এটি গাছ—এটি পাতা—এটি পাখী আর এটি হিরণ্ময়ী।

এইরূপে কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল। অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি প্রতি পদেই আমার প্রতি হিরণ্ময়ীর আন্তরিক অপূর্ব্ব ভালবাসার পরিচয় পাইতেছি। ভালবাসার পন্থা অসংখ্য—ভাল-বাসার দৃষ্টান্তও অসংখ্য। হিরণ্ময়ী দিন দিন আমার প্রতি এই দুইটির কত-রূপ কার্য্য দেখাইতেছেন। বাস্তবিক হিরণ্ময়ীর কোমল ও সরল হৃদয় আমার দিকেই অনুক্ষণ আনত রহিয়াছে। আহা, এ হৃদয়ের মূল্য নাই—

তুলনা নাই। বিধাতা যে সকল উপকরণে হিরণের স্বর্গীয় হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সকল উপকরণ কি পৃথিবীতে আছে? না—তা' থাকিলে অন্য অন্য হৃদয়ও কেন এত কোমল—এত সরল—এত প্রেমপূর্ণ হয় নাই। আহা, কি সুন্দর লিখন,—'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। এই প্রস্তরের উপর এই খটিকালিখন খুদিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।"

ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ কত কি ভাবিয়া অনিমেষ নয়নে সেই পঁক্তির উপর কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তিনি যে স্নান করিতে আসিয়াছেন, তাহা তখন ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব পঁক্তিটি ভিন্ন তাঁহার চক্ষে জগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কিয়ৎকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই যেন নব নব রসাস্বাদবিশিষ্ট অমৃত-লহরী তন্মধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার তৃষাতুর প্রাণ মন এবং হৃদয়কে জুড়াইতে লাগিল,—কিন্তু তথাপি পরিতৃপ্তির চরম সীমা দেখিতে পাইলেন না। হিরণ্ময়ীর সম্মুখে থাকিয়া সেই পঁক্তি দর্শনে যত না সুখী ও বিমোহিত হইতেন, তাঁহার অসাক্ষাতে তদপেক্ষা শতগুণে সুখী হইলেন। সেই সুখময়ী পঁক্তি তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম বিভাগস্থ লুক্কায়িত ভাবসমূহকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ অন্তশ্চক্ষে দেখিলেন,তাঁহারই হিরণ্ময়ী।

ধীরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত লেখা দেখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে ইহার সমকক্ষ একটিও হয় নাই। তিনি কালিদাসের শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার, বিক্রমোর্ব্বশী, ভবভূতির বীরচরিত, উত্তররামচরিত, মাঘের শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় এবং অন্যান্য কবিদিগের কাব্যকলাপের অনেক রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে এই রত্নের নিকট তাহাদের মধ্যে একটিও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিল না। সে সমুদায় রত্ন পরকীয় কিন্তু এ রত্নটি স্বকীয়। এই জন্যই এ রত্নের এত আদর। পরের রত্ন কে কোথা মন দিয়া আদর করে?

কেবল চক্ষে দেখিয়া আশা মিটিল না বলিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ পঁক্তিটির উপর বুক চাঁপিয়া শুইয়া পড়িলেন। কেন শুইলেন?—বুক জুড়াইবার জন্য। বুক জুড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন, বুকে উল্টা অক্ষরে 'আমার—ধীরেন্দ্রনাথের' অংশটুকু উঠিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ উহা

দেখিয়া একটু হাসিলেন। হাসিয়া উহার শেষভাগে কথার যোগ করিলেন 'বুক' অর্থাৎ 'আমার—ধীরেন্দ্রনাথের বুক'। যদি খড়ি পাইতেন, তবে লিখিতেন, কিন্তু তদভাবে কেবল প্রণয়পূর্ণ বচনেই ইহা সম্পন্ন করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ একবার রোয়াকের লেখা আর একবার নিজ বক্ষের লেখা দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ দেখিলেন।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল, আর তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবার আশাকে অন্তঃকরণে স্থান দিতে পারিলেন না। অগত্যা গাত্রোত্থান করিয়া দুই এক সোপান অবতরণ করিলেন। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। আসিয়া মনে মনে বলিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমি সরলা, ভবিষ্যতের কিছুই বুঝিতে পার না; তাই তুমি তোমার মনের কথা এখানে লিখিয়া মুছিয়া ফেলিতে ভুলিয়া গিয়াছ। কেহ ইহা দেখিলে কি মনে করিবে, তাহা তুমি লিখিবার সময় জানিতে পার নাই বলিয়াই মুছিতে ভুলিয়া গিয়াছ। এরূপ প্রকাশ্য স্থলে এরূপ গূঢ়তম কথা বজায় রাখিয়া যাওয়া সরলা বালিকা ভিন্ন অপর কাহারই সাজে না, এই জন্যই ইহা মুছিয়া ফেল নাই। তা' ভালই করিয়াছ। মুছিয়া ফেলিলে তোমার ধীরেন্দ্রনাথ কি আর দেখিতে পাইত 'ধীরেন্দ্রনাথ আমার—ধীরেন্দ্রনাথের আমি হিরণ্ময়ী'। অপরের পক্ষে—অপরের চক্ষে তোমার এই পংক্তি বিষবর্ষণ করিবে, কিন্তু আমার পক্ষে—আমার চক্ষে কি করিবে?—কি করিবে কেন? —কি করিতেছে? না—অমৃতবর্ষণ। এ অমৃতবর্ষণ আমার পক্ষে জীবন-সঞ্জীবন।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "আমায় দায়ে পড়িয়া—ভবিষ্যৎ ভাবিয়া—পরের ভয়ে করিতে হইল

প্রিয় বস্তু বিসর্জ্জন।"

এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছায় রোয়াকের চিত্র ও হিরণ্ময়ীর নাম সমেত স্বীয় নামাবলি মুছিয়া ফেলিলেন—প্রথমে হস্তে—শেষে গাত্রমার্জ্জনীতে মুছিয়া ফেলিলেন। পুষ্করিণীর জলে গিয়া গাত্রমার্জ্জনী ডুবাইয়া জল আনিলেন। সেই জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন। একটুও চিহ্ন রহিল না। খড়িধৌত জল ধারাকারে রোয়াক হইতে গড়াইয়া চাতালে পড়িল।

আবার চাতাল হইতে গড়াইয়া এক একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পুষ্করিণীর জল পুষ্করিণীতেই পড়িল।

ধীরেন্দ্রনাথ যে ভয়ে প্রিয় বস্তু বিসর্জ্জন দিলেন, সে ভয়ের আর বাকী কি আছে? গত কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ তাহা কেমন করিয়া জানিবেন? তিনি যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাই করিলেন।

অনন্তর ধীরেন্দ্রনাথ পুষ্করিণীর শীতল জলে স্নান করিয়া স্বকক্ষে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়েও গামোছা নিঙ্‌ড়াইয়া সেই স্থানে জল ঢালিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

'যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।'

ধীরেন্দ্রনাথ আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিল, হস্তে একখানি শুষ্ক বস্ত্র অর্পণ করিল। ধীরেন্দ্রনাথ আপনি উহা পরিধান করিলেন। অনন্তর আহ্নিক পূজা সমাপ্ত হইল। সমাপ্ত হইলে, সেই ভৃত্য একখানি রূপার রেকাবী সাজাইয়া কএক প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। ধীরেন্দ্রনাথ তন্মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভৃত্য একটি রূপার ঘটি ভরিয়া জল ও একটি ক্ষুদ্র রেকাবী করিয়া দুইটি তাম্বুল আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিল। অনন্তর সে ধীরেন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত সিক্তবস্ত্র লইয়া ছাদের উপর চলিয়া গেল।

কক্ষের বহির্ভাগে ধীরেন্দ্রনাথের সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ, শুষ্কবস্ত্র পরিধান ও জলযোগ সমাহিত হইল। তাহার পর তিনি বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। একখানি দর্পণ ও একখানি কঙ্কতিকা লইয়া কেশ পরিষ্কার করিলেন। গাত্রমার্জ্জনীতে হাত মুছিলেন। তাহার পর তিনি

কি লিখিবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যেমন মস্যাধার ও লেখনী লইতে গেলেন, অমনি তাঁহার চক্ষে পড়িল 'মনের কথা মনেই রহিল।'

মস্যাধার সরাইয়া এই লিখনলিখিত পত্রখণ্ড হস্তে উঠাইয়া লইলেন। আর এক বার পড়িলেন—আবার পড়িলেন। হস্তাক্ষর চিনি চিনি করিয়া চিনিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান হইল। অনুসন্ধানের ফল—হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর—হিরণ্ময়ীরই 'মনের কথা মনেই রহিল।' ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন?—কত কি। কত কি কি? না—একবার—'হিরণ্ময়ীর হস্তাক্ষর বেস—সুন্দর ছাঁদ'—আবার 'হিরণ্ময়ী কেন এরূপ লিখিলেন?' তাহার পর,—'হিরণ্ময়ীর কি এমন মনের কথা?' আবার—'মনের কথা মনেই রহিল?' এইরূপ কত কি।

এই কত কি ভাবনার শেষ ফল দাঁড়াইল এই;—"হিরণ্ময়ী আমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে পান নাই বলিয়াই ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।" ধীরেন্দ্রনাথের মন এই কথাগুলি বলিল। ইহাই ধীরেন্দ্রনাথের চরম চিন্তা। তিনি হিরণ্ময়ীর নিকট ইহার প্রকৃত মর্ম্ম জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহার দর্শন-অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া অলিন্দের চারি ধার দেখিতে লাগিলেন,—হিরণ্ময়ীর দর্শন পাইলেন না। বাহিরে যাইবার সময় এই লিখিত পত্রখানি তাঁহার হস্তে ছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎকাল অলিন্দে দাঁড়াইয়া, হিরণ্ময়ীর কক্ষের দিকে গমন করিলেন। কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন হিরণ্ময়ী সেখানে নাই। তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে ফিরিলেন। পুনর্ব্বার আপনার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া সেই লেখাটি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বহির্ভাগে চরণভূষণের ন্যায় কিসের শব্দ হইল। উহা ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। শয়নাবস্থাতেই গৃহদ্বারের দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিলেন। এরূপ করিয়া থাকিবার ভাব এই, কে সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিবেন।

দেখিতে দেখিতে কিরণময়ী তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন—তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করিলেন। এখানে এরূপ হাস্যের অর্থ অভ্যর্থনা। যতপ্রকার অভ্যর্থনা

আছে, তাহার মধ্যে ইহা উচ্চশ্রেণীর একটি। পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, কিরণময়ীকে দেখিয়াই ধীরেন্দ্রনাথ ‘মনের কথা মনেই রহিল’কে ‘মনের কথা হাতেই রহিল’ করিলেন অর্থাৎ মুষ্টিমধ্যে চাপিয়া রাখিলেন। কেন না কিরণময়ী আসিয়াছেন—পাছে দেখিতে পান।

ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকে যথাস্থানে বসিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি বসিলেন না—দাঁড়াইয়াই রহিলেন। দাঁড়াইবার ভাবটি মনোহর;—বাম পদের উপর দক্ষিণ পদের অগ্রভাগ স্থাপিত—কটিদেশ ঈষৎ বক্র—কটি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহাংশ বাম দিকে হেলিত—বাম হস্তের সুন্দর অঙ্গুলিগুলি কটি বেষ্টন করিয়া স্থিত—দক্ষিণ হস্তে অঞ্চলের অগ্রভাগ ধৃত—শিরঃস্থ বস্ত্রবেষ্টনের সম্মুখ দিয়া অলকাবলী সুচারু ললাটপট্টে পতিত;—এইরূপ ভাবের শোভাময়ী প্রতিমা ধীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ এই মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া সুখী হইলেন, আবার বসিতে বলিলেন, কিন্তু কথা থাকিল না।

কিরণময়ী এইরূপে দাঁড়াইয়াই ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, “ধীরেন্! তোমার অদৃষ্ট বড় মন্দ!” এই কথাগুলি পরিহাসে পূরিত।

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, “কিসে মন্দ, কিরণ?”

“বলিব কি? না—বলিব না।”

“যদি আমার কাছে বলা অসঙ্গত বিবেচনা কর, বলিও না।”

“অসঙ্গত নয়; বলিতে লজ্জা করে।”

“সুতরাং তাও একপ্রকার অসঙ্গত।”

“না—অসঙ্গত নয়,—তবে বলি।” এই বলিয়া কিরণময়ী আপনা আপনি হাসিতে লাগিলেন। এবার হাসি কিছু বাড়াবাড়ি রকমের।

ধীরেন্দ্রনাথও হাসিলেন। কেন হাসিলেন?—কিরণময়ীর ব্যাপার দেখিয়া। কিরণময়ী কেন যে তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ বলিলেন, তিনি তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন; কেবল হাসিতে লাগিলেন। কিরণময়ীর হাসিতে শব্দ শ্রুত হইল, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের নীরব হাসি, অথচ বিকাশ ছিল। এইরূপ দুই জাতীয় হাসি কক্ষশোভা বৃদ্ধি করিল। তাহার পর কিরণময়ী হাসি-ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিলেন,

"ধীরেন্! তোমার অদৃষ্ট মন্দ এই জন্যে,—কেন তুমি কাল বিকালে পুষ্করিণীর ঘাটে যাও নাই?"

"গেলে কি হইত?"

"তোমার প্রতি তোমার হিরণ্ময়ীর কত ভালবাসা দেখিতে পাইতে।" এই বলিয়া আবার হাসিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রতি হিরণ্ময়ীর ভালবাসা!" এই কএকটি কথা বিস্ময়সহকারে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল।

কিরণময়ী পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "আমরি, কিছুই যেন জান না! লুকাইলে কি হইবে? স্পষ্ট করিয়া বলিলেই ত চুকিয়া যায়।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি স্পষ্ট করিয়া বলিব, কিরণ?"

"যে কথা অস্পষ্ট করিয়া বলিলে।"

"কি সে কথা?"

"তোমার প্রতি হিরণ্ময়ীর ভালবাসা।"

"কে তোমায় এ কথা বলিল?"

"যে তোমায় ভালবাসে, সেই বলিল।"

"কে সে?"

"এতক্ষণ ধরিয়া যাহার কথা বলিলাম।"

"হিরণ্ময়ী?"

"হাঁ—হাঁ।"

"এ তোমার ভুল—নিশ্চয় ভুল।"

"তবে সে কেন কাল পুষ্করিণীর ঘাটের রোয়াকে তোমার নামের জপমালা সাজাইয়াছিল। রোয়াকে যে একটিও তিল থাকিবার স্থান ছিল না—নাম লিখিতে এক তাল খড়ি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। আমি সব দেখিয়াছি—সব জানিয়াছি। তুমি না না করিলে কি হইবে?—হিরণ্ময়ী আপনিই ধরা দিয়াছে। উঃ, ভিতরে ভিতরে এত! তুমি আবার ভাঁড়াইতে বসিলে!" এবার কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে ক্রোধচিহ্ন দেখা দিল।

এই কথাগুলি শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ

আবার আত্মসংবরণ করিলেন?—পাছে কিরণময়ী বুঝিতে পারেন, সেই ভয়ে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডলের ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল। তিনি নিরুপায় হইলেন—অস্থির হইলেন। সুতরাং কি করেন, মনোভাবকে ছদ্মবেশে সাজাইয়া বলিলেন,

"হ্যা দেখ, কিরণ! যদি হিরণ্ময়ী এরূপ কোন কিছু লিখিয়া থাকেন, যাহাতে তোমার মনে সন্দেহ আসিয়া বাস করিতে পারে, তুমি নিশ্চয় জানিও, তা' কিছুই নয়। হিরণ্ময়ী বালিকা, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে।"

কিরণময়ী তীব্র পরিহাসের সহিত বলিলেন, "সে বালিকা, আর তুমি বালক! কেহই কিছু জান না;—না?"

ধীরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ হইলেন। নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "তা তুমি যাহাই মনে কর—আমি আর কি বলিব? নিজে না বুঝিলে কে বুঝাইবে?" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যা, সব গোল হইয়া গিয়াছে। সব ধরা পড়িয়াছে। ধরা ব'লে ধরা,—কিরণময়ীরই হাতে। আজ কিরণময়ী আমার সম্মুখে

'যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।'"

এমন সময় হিরণ্ময়ী ধীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই দিকে আসিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষদ্বারে আসিয়া যেমন প্রবেশ করিবেন, অমনি কিরণময়ীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। নিমেষকাল থমকিয়া বরাবর সমান চলিয়া গেলেন। এরূপ করিয়া চলিয়া যাইবার অর্থ এই যে, যদি কিরণময়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, তবে কিছু দোষের কথা মনে করিতে পারিবেন না। কেন না, তিনি যেন ধীরেন্দ্রনাথের নিকট যাইবার জন্য সে দিকে যান নাই, কোন কার্য্যের জন্য এক দিক হইতে আর এক দিকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তথাপি হিরণ্ময়ীর মনের ভিতর ভয় ও চিন্তা আসিয়া বিবাদ করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী আবার মনে করিলেন, বড় দিদি হয় ত তাঁহাকে একেবারেই দেখিতে পান নাই, কিন্তু বড় দিদি কটাক্ষপাতে সে কাজ সারিয়া লইয়াছেন। ধীরেন্দ্রনাথও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিরণময়ী আর সে কক্ষে অধিকক্ষণ থাকিলেন না—আপনার

কক্ষে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেলেন, "ধীরেন্! আর যাও কোথা ?"

এই কএকটি কথায় ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণে যেন শূল ফুটিল। তিনি একাকী শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের ফর্দ্দ।

এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীর এই সকল ব্যাপার হিরণ্ময়ীকে বলিলেন না। হিরণ্ময়ীও শপথের ভয়ে ধীরেন্দ্রনাথকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু শপথ করিয়া কিরণময়ী আর কাহাকেও নয়, কেবল ধীরেন্দ্রনাথকে হিরণ্ময়ীর এই ব্যাপর বলিলেন। তিনি জানিতেন যে, ধীরেন্দ্রনাথকে ইহা না বলিলে অসুবিধা বই সুবিধা নাই। ধীরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার জানিলে হিরণ্ময়ীকে আর তেমন করিয়া ভাল বাসিবেন না—মনে ভয় থাকিবে। তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। এই জন্যই তিনি তাঁহার নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এই এক সপ্তাহের মধ্যে এই তিন জনে আর কি কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না।

সপ্তাহের শেষ রজনী প্রভাত হইল। জগদীশপ্রসাদ প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। তিনি কখন্ কি আদেশ করেন, সেই জন্য এক জন বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ বৈঠকখানার দ্বারবহির্ভাগে একটি স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে এরূপ ভাবে দাঁড়াইল যে, জগদীশপ্রসাদ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না—সেও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু প্রশ্নোত্তর আদানপ্রদানের পথদূরত্ব থাকিল না। সেই বার্ত্তাবহ দ্বারবানের হাতে কোন কাজ ছিল না; কিন্তু মানুষ একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না,—যে কোনরূপেই হউক,

তাহাকে একটি না একটি কার্য্য লইয়া থাকিতে হইবে। সে কার্য্যের পরিণামে কোন ফল উৎপন্ন হউক বা না হউক, কিন্তু উহা সম্পন্ন করা চাই। দ্বারবান্ একাকী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অলিন্দের উপরিস্থ ছাদের কড়ি বরগা গণিয়া ফেলিল। রাম দুই করিয়া এদিক ওদিকের সমুদয় কড়ি বরগা গণনা করিল, কিন্তু গণনা ঠিক্ হইল না—ভুল হইয়া গেল। তাহার মতে যাহা হইল, তাহাই ঠিক্ গণনা। গণনার সময় সে এক একটি সংখ্যায় এক একটি ঘাড়নাড়া দিয়াছিল। কড়ি বরগার গণনা শেষ হইলে বৈঠকখানার দ্বার গণনা আরম্ভ করিল। এ গণনা ঘাড় নাড়িয়া নয়—অঙ্গুলি নাড়িয়া। রাম দুই করিয়া যেমন চারিটি মাত্র দ্বার গণনা হইয়াছে, এমন সময়ে ভিতর হইতে জগদীশপ্রসাদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কে ওখানে ?"

"আজ্ঞে করুন্।" বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ নিষ্ফল গণনা-কার্য্য ছাড়িয়া এই উত্তর দিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল। জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "দেওয়ান্‌কে এখানে ডাকিয়া আন।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া বার্ত্তাবহ প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদের দপ্তরখানা বহির্বাটীর সর্ব্বনিম্নতলে। দপ্তরখানার বন্দোবস্ত বড় সুন্দর। অধুনাতন কোন কোন জমীদারের দোষে বা অবহেলায় দপ্তরখানার যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, তাঁহার দপ্তরখানায় তাহা ছিল না। শুদ্ধ ইহা তাঁহার এবং তাঁহার দেওয়ানের গুণে বলিতে হইবে। তাঁহার দপ্তরখানায় প্রধানত দুইটি বিভাগ ছিল। একটি বিভাগে জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্য ও অপরটিতে সাংসারিক কার্য্যের হিসাব পত্র লিখিত হইত। কার্য্য অনেক, এই জন্য প্রায় চল্লিশ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। এক এক জনের হস্তে এক এক প্রকার কার্য্য। কার্য্যদক্ষতা অনুসারে কাহার দশ, কাহার পনর, কাহার কুড়ি, কাহার ত্রিশ, কাহার চল্লিশ, কাহার বা পঞ্চাশ ষাট্ টাকা বেতন। তবে কিনা বেশী মাহিয়ানার লোক পাঁচ ছয় জন, এবং দশ পনের কুড়িরই বেশী। দেওয়ানের বেতন চারি শত টাকা।

দেওয়ান্ মহাশয় বড় উপযুক্ত লোক, নাম হরিহর। তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর। দেহ খানি স্থূল, উদরের অন্তঃস্ফীতি (ভুঁড়ি) কিছু গুরুতর। বক্ষে ও পৃষ্ঠে লোমাবলি প্রত্যহ স্নানের সময়ে যথোপযুক্ত তৈলজল

পাইয়া অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেওয়ানজী কতকটা খর্ব্বাকারের লোক, সেই জন্য তাঁহার দেহস্থৌল্য তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে বিসদৃশ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি দাড়ী রাখিতে নারাজ, কিন্তু গোঁফের উপর খুব যত্ন। গোঁফ যোড়াটি খামুরে—কাঁচা পাকায় মিশান। তাঁহার মস্তকে অযুক্ত কেশরাজি, তাহাও কাঁচা পাকায় মিশান। সেই কেশাবলির যথাস্থানে পাঁচ ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ শিখা। তিনি প্রত্যহ আহ্নিক পূজার পর উহার অগ্রভাগে কোন দিন একটি তুলসীপত্র, কোন দিন একটি ক্ষুদ্র পুষ্প বাঁধিয়া রাখেন। নাসিকায় গোপীমৃত্তিকার বড় অঙ্গের তিলক কাটেন। তাঁহার দেহবর্ণ খুব গৌরও নয়, খুব কৃষ্ণও নয়—মাঝামাঝি, কিন্তু তাহাতে কতটা লাবণ্য আছে। জলদোষেই হউক বা বয়সেই হউক, তাঁহার দুই দিকের কসের দুই তিনটি দন্ত চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে। তিনি সেই তিনটির বিদায়-বিরহে এক এক সময়ে আক্ষেপ করেন, বিশেষত কঠিন খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া। তিনি দন্তচ্যুত হওয়াতে কতকটা শিথিলভাষী হইয়াছেন।

দপ্তরখানার মধ্যস্থলের দেওয়ালের দিকে একখানি স্বতন্ত্র আসনে একটি বৃহৎ তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া তিনি বসিয়া আছেন—অল্পক্ষণ হইল আসিয়া বসিয়া আছেন। এক জন সরকার তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জমীদারীসংক্রান্ত কিসের কাগজ পত্র পড়িতেছে। সেই সরকারের দক্ষিণ দিকে বড় বড় চারি পাঁচখানা খাতা। তখনকার খাতা ঠিক এখনকার মত ছিল না। সরকারের দক্ষিণ কর্ণে একটি কলম। সেই কলমের মুখের কালি তখনও কাঁচা ছিল। বোধ হয়, এই কতক্ষণ খাতায় হিসাবের কাটাকাটি করিয়া থাকিবে।

অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ লিখিতেছে, কেহ টাকার ঠিক দিতেছে, কেহ জমীদারীসংক্রান্ত একখানি বড় তালিকায় সূক্ষ্ম হিসাব রাখিবার জন্য খসড়া লিখিতেছে, কেহ কলম কাটিতেছে, কেহ এক পাতা লেখা শেষ করিয়া কলম মুছিতেছে, কেহ কাঁচা লেখার উপর চূণের পুটলির থোপ দিতেছে, কেহ হিসাব পরিষ্কার করিতে গিয়া বিষম গোলযোগে পড়িয়া কপাল কুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করিয়া একপ্রকার সং সাজিয়াছে। আবার তাহারই মধ্যে এক এক জন মহাপুরুষ দেওয়ানজীর দৃষ্টিপথকে ঢাকা দিয়া

মানুষ, ময়ূর ও রাশিচক্র আঁকিয়া আপনিই চিত্রকার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিতেছে। এইরূপে দপ্তরখানার কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু কোন গোল-যোগ নাই—প্রয়োজনীয় দুই একটি কথা ব্যতীত নীরবে কার্য্য চলিতেছে। জগদীশপ্রসাদের সময় বঙ্গদেশে তুলট কাগজেরই বিশেষ প্রচলন ছিল। কি পুঁথি, কি পত্র আর কি খাতা লেখা, প্রায় সকল কার্য্যই এই কাগজে সম্পন্ন হইত।

এই ভরপূর দপ্তরখানায় বার্ত্তাবহ দ্বারবান্ উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "সংবাদ কি?"

"কর্ত্তা মহাশয় আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

"এক্ষণে কোথায় তিনি?"

"বৈঠকখানায়।"

"একাকী আছেন?"

"আজ্ঞে।"

"চল যাইতেছি।" এই বলিয়া হরিহর দেওয়ান গদি হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, দ্বারবান্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

কতক্ষণের জন্য দপ্তরখানা হরিহরবিরহিত হইল। আমলাদিগের মুখ ফুটিল। এক এক জনের এক এক পেট কথার যেন স্রোত বহিতে লাগিল;—ক্রমে মহাসাগরের গর্জ্জন! কে কোথা কি ঘটনা দেখিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কেহ তাহা শুনিতে লাগিল। কেহ পরিহাসচ্ছলে কাহাকে কুটুম্বিতাসূচক দুই চারিটা মধুমাখা বোল শুনাইয়া দিল, শ্রোতা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া তাহার উত্তর দিল,--চারি দিকে হাসির ধুম পড়িয়া গেল। বড় বেতনের কর্ম্মচারীরা যে দিকে বসিয়া কার্য্য করিতেছিল, সে দিকে এরূপ ব্যাপার বড় একটা হইল না। সকল আমলাই যে, হরিহরহীন হইয়া এরূপে প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে লাগিল, তাহা নহে। কেহ কেহ পূর্ব্বের ন্যায় আপনার কার্য্যও করিতে লাগিল।

এ দিকে হরিহর দেওয়ান মহাশয় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। জগদীশপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য ডাকিয়াছেন, মহাশয়?"

জগদীশপ্রসাদ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "একখানা ফর্দ্দ করিতে হইবে।"

দেওয়ানজী ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা উচিত যে, হরিহর দেওয়ানজীর বচনপ্রয়োগ সময়ে একটি বাচিক-মুদ্রাদোষ ঘটিয়া থাকে। তিনি কথা কহিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে 'ওর নাম কি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি উপবিষ্ট হইয়া জগদীশপ্রসাদকে বলি-লেন, "ওব নাম কি, কিসের ফর্দ্দ ?"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীর বিবাহের ফর্দ্দ।"

হবিহর এক খণ্ড কাগজ লইয়া বলিলেন, "তবে, ওর নাম কি, আজ্ঞা করুন।"

জগদীশপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিলেন এবং হরিহর একটি একটি কবিয়া ফর্দ্দে টুকিতে লাগিলেন।

ফর্দ্দ লেখা শেষ হইল। জগদীশপ্রসাদের পুত্র নাই অথচ তিনি এক জন বিশেষরূপ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি, সুতরাং কন্যার বিবাহেই পুত্রের বিবাহের ন্যায় বিবাহ-ব্যয়ের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইল। বিস্তর টাকার ফর্দ্দ।

ফর্দ্দ লেখ শেষ হইলে, দেওয়ানজী বলিলেন, "তবে, ওর নম কি, চিন্তা-মণি স্বর্ণকারকে আপনার ফর্দ্দানুযায়ী অলঙ্কার সমুদয় তৈয়ার করিবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাই, আর, ওর নাম কি, রাধামোহন কাপড়ওয়ালাকেও ডাকা-ইয়া, ওর নাম কি, এই সকল কাপড় সরবরাহ করিবার কথা বলিয়া দি। আর, ওর নাম কি, বাকী যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, তা', ওর নাম কি, ইহার পর হইলেও হইবে। ওর নাম কি, আজ হইল জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচই, আর, ওর নাম কি, আষাঢ় মাসের সতেরই আপনি বিবাহের দিন ঠিক্ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে, ওর নাম কি, সমস্তই প্রস্তুত হইয়া যাইবে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তা হইলেই হইল। অধিক আর বলিব কি, যেন এটি হইল না, সেটি হইল না বলিয়া আমাকে দুঃখিত হইতে না হয়।"

হরিহর বলিলেন, "আজ্ঞে, তা হইতে হইবে না। ওর নাম কি, সময় অনেক আছে। এই সকল প্রস্তুত হইয়া, ওর নাম কি, আরও দিন থাকিবে। তবে, ওর নাম কি, এক্ষণে আমি দপ্তরখানায় যাইতে পারি ?"

জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা।"

দেওয়ানজী ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বৈঠকখানা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় এক এক বার ফর্দ্দখানা দেখিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মুখ হইতে এই কথাটি নির্গত হইল, "উঃ, অনেক টাকা।"

জগদীশপ্রসাদও বৈঠকখানা হইতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরবাড়ী।

জাহ্নবী দেবী প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। অদ্য সেইরূপ করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া নিজ হস্তে ঠাকুরপূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন। দুই জন দাসী নিকটে থাকিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কত কি যোগাড় করিয়া দিতেছে। জাহ্নবী দেবী একখানি নিরামিষ বঁটি পাতিয়া নিজেই শশা, কলা, আম্র, জামরুল, লিচু, ইক্ষু, কেশুর, পেয়ারা প্রভৃতি নানাবিধ ফল মূল ছাড়াইয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া এক একখানি রৌপ্যপাত্রে সাজাইয়া রাখিতেছেন। কখন বা বিচিত্র কর্ত্তনকর্ত্তিত কদলীপত্রে ছানা, মাখন, মিশ্রী প্রভৃতি বাহার করিয়া সাজাইতেছেন। দুই জন দাসীর মধ্যে এক জন আতপ তণ্ডুল ধৌত করিয়া রূপার থালায় তুলিতেছে, অপর জন মটর, ছোলা, বরবটী, মুগ প্রভৃতি সিক্ত কলাইগুলি এক একখানি মাটীর খুরিতে সাজাইতেছে। দেখিতে দেখিতে কএকখানি নৈবেদ্যের থালা প্রস্তুত হইল। পার্শ্বে নারিকেল-নাড়ু এবং উপরে গাছমোণ্ডা বসান হইল।

এমন সময়ে মধু মালী নন্দনকানন হইতে বড় বড় দুইটা ঝুড়ী ভরিয়া নানাজাতীয় পুষ্প আনিল। সে যে স্থানে সেই দুইটা ঝুড়ী রক্ষা করিল, সেখানে বড় মনোহর সৌরভ-তরঙ্গ ছুটিয়া উঠিল। ঠাকুর ঠাকুরাণীর নাসারন্ধ্রে সেই সৌরভ প্রবেশের সর্ব্বপ্রথমে মধুর পরে সেই স্থানের লোক জনের নাসিকায় প্রবেশ করিল। মধু মালী সতর্ক হইয়া ধীরে ধীরে ঝুড়ী

হইতে মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজ, যুঁই, রজনীগন্ধ, কৃষ্ণকলী, কৃষ্ণচূড়া, টগর, অশোক, বড় বড় প্রস্ফুটিত পদ্ম, বেল, বকুল, অপরাজিতা প্রভৃতি পুষ্প ও বাছাই করা তুলসীপত্র দুইখানা সুবিস্তৃত চক্রাকার তাম্রপাত্রে তুলিয়া দিয়া প্রথমে ৺ রাধাকৃষ্ণ, পরে জাহ্নবী দেবীকে প্রণাম করিল। একটা ঝুড়ীর ভিতর আর একটা ঝুড়ী রাখিয়া নন্দনকাননে পুনঃপ্রস্থান করিল। তাহার ঝুড়ী দুইটা খালি হইল বটে, কিন্তু তথাপি চেঁচাড়ীর খাঁজে খাঁজে কএকটা ফুলের পাপড়ী আটকাইয়া রহিয়া গেল।

দুইটি দাসীকে লইয়া জগদীশপ্রিয়া পূজার আয়োজন সমাধা করিলেন। কোথায় কি বাকী রহিয়া গেল কি না, তাহা জানিবার জন্য নৈবেদ্যগুলির উপর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদ তথায় উপনীত হইলেন। জাহ্নবী দেবী স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটি রূপার ক্ষুদ্র বাটীতে পুষ্করিণীর জল রাখিয়া দিয়াছিলেন, জগদীশপ্রসাদ নিকটে আগমন করাতে, সেই জল তাঁহার পাদস্পৃষ্ট করিয়া পান করিলেন।

জগদীশপ্রসাদ শ্রীশ্রী৺ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ যুগলকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন। পূজারী ঠাকুর তাঁহাকে দেবমূর্ত্তির স্নানজল দিলেন। জগদীশপ্রসাদ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তিভরে পান করিলেন। দক্ষিণ হস্ত প্রথমতঃ মস্তকে মুছিয়া পরে ধুইলেন। তখন পূজারী ঠাকুর একটি দেবার্চ্চিত তুলসীপত্র জগদীশপ্রসাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি তাহা শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণের উপর গুঁজিয়া রাখিলেন।

এই সকল দেবভক্তিসূচক কার্য্য হইয়া গেলে, পূজারী ঠাকুর পূজায় বসিলেন। সেই পূজারীর নাম বাসুদেব শর্ম্মা, বয়স ষষ্টি বৎসর গত হইয়াছে। তাঁহার আবয়বিক গঠনপ্রণালী বয়ঃক্রমানুসারে কতকটা শিথিল হইয়াছে। আকার দীর্ঘ, বর্ণ সুন্দর, পট্টবস্ত্র পরিহিত, উত্তরীয়খানি যজ্ঞসূত্রাকারে বামস্কন্ধ হইতে বক্রভাবে লম্বিত হইয়া দক্ষিণ কটির উপর গ্রন্থিবদ্ধ। গলশোভিত যজ্ঞসূত্র গাছটি অতি পরিষ্কৃত। উহা উত্তরীয়ের কোন স্থানে আচ্ছাদিত হইয়াছে, কোন স্থান হইতে দর্শন দিতেছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে একটি সাদা সিধা রূপার অঙ্গুরী। সেই

অঙ্গুরীর একস্থানে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার রূপার গুলি। তিনি কখন কখন যজ্ঞসূত্রেও সেই অঙ্গুরী বাঁধিয়া রাখেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার ঔদরিক ত্রিবলীরেখা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাসুদেব শর্ম্মার নাসিকা ও চিবুক কিছু দীর্ঘ, কিন্তু চক্ষু দুইটি আবার কিছু ক্ষুদ্র। তাঁহার অষ্টাঙ্গে চন্দন, কপালে দীর্ঘ ফোঁটা।

পূজারী মহাশয় পূজায় বসিলেন। যথাবিধি পূজা শেষ হইল। প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত ধূপ ধূনার সুগন্ধে ঠাকুর ঘর আমোদিত হইয়া রহিল। পূজার পর আরতি হইয়া গেল। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী ও অন্যান্য সকলে গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। অনন্তর জগদীশ-প্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ওদিকে ঠাকুরের মাধ্যাহ্নিক ভোগের জন্য রন্ধন-শালায় রন্ধনকার্য্য আরম্ভ হইল। শক্তিমূর্ত্তি হইলে আমিষের সংস্রব থাকিত, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের পূজায় তাহা হইবার নহে, সকলই নিরামিষ। ৺ রাধাকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে নন্দন কানন নানাবিধ তরকারি পাঠাইয়া দিয়াছে। কএকজন দাসী বড় বড় বঁটী লইয়া সেই সকল কুটিতে বসিয়া গেল। দাসীরা হাতে তরকারী এবং দাঁতে কথা কুটিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আমর, মধুমালী আজ খালি পোকা বেগুণ গুলো দিয়ে গেছে। 'ছিল ঢেঁকী হ'ল তুল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল'। যেটা তুলি, সেটাই কাণা।" তাহার কথা শুনিয়া গোবিন্দ অধিকারী গোছের একজন দাসী অনুপ্রাসসম্বলিত কবিতা-ছটা দেখাইয়া বলিল, "যেটা তুলি, সেটাই কাণা, মধু মালী বেটাই কাণা।" তাহার কবিত্বশক্তি দেখিয়া দাসী মহলে হাসি পড়িয়া গেল। কেহ আহ্লাদে আটখানা হইয়া, সেই কবিচূড়ামণিকে কাঁকুড়বিচির রাশি, কেহ কাঁচকলার বোঁটা, কেহ লাউয়ের খোলা পুরস্কার দিল। হাসির উপর আবার হাসির ধূম পড়িয়া গেল। এমন সময়ে একটি বিংশতিবর্ষীয়া দাসী হাসিতে হাসিতে অন্যমনস্ক হইয়া বঁটিতে আঙুল কাটিয়া ফেলিল। সে 'উহু' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আর অমনি সকলে 'আহা' বলিয়া সান্ত্বনা করিল। এইরূপে কএকটা 'উহু' 'আহা' হইবার পর সেই কবিকেশরিণী কিঙ্করী বলিল, "রান্না ঘরে আজ দুর্য্যোধনের হরিষে বিষাদ!" অঙ্গুলিকর্ত্তিতা দাসীর

কষ্টে সে মাসীর কিছুই কষ্ট হয় নাই। তাহার মধুর বাক্যে অঙ্গুলিকর্ত্তিতা যুবতী চটিয়া গেল। চটিয়া তাহার কি করিবে?—এক বকুনা জলে কর্ত্তিত অঙ্গুলি ডুবাইয়া রাখিল।

খাটমুণ্ডরে জন কএক জলবাহক ভৃত্য পিত্তলের বড় বড় ঘড়া ভরিয়া রসুই-ঘরে জল আনিতে লাগিল। পাচক ব্রাহ্মণেরা সারি সারি চুল্লী জালিয়া পিত্তলের রন্ধনপাত্রগুলা চড়াইয়া দিল। রন্ধন কার্য্য আরম্ভ হইল। হাতা বেড়ীর সহিত রন্ধন পাত্রগুলার যুদ্ধ বাঁধিল। খটর খটর, ঠন্ ঠন্, ঠক্ ঠক্, ঝন্ ঝনাৎ শব্দে, ঘৃত মসলার গন্ধে এবং কাঁচা কাঠের ধূঁয়ায় রন্ধনশালাস্থ লোকদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য বুঝিয়া লইল। দেখিতে দেখিতে ৺ রাধাকৃষ্ণের অন্নভোগ প্রস্তুত হইল। যথা সময়ে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া চুকিয়া গেল। অতিথিরা উদর পুরিয়া প্রসাদ পাইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ী।

জগদীশপ্রসাদ প্রিয়তমা ভার্য্যা জাহ্নবী দেবীকে বিবাহের কথা সবিস্তার বলিলেন। জাহ্নবী দেবী শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং আরও কএকটি অলঙ্কারের কথা স্বামীকে বলিলেন। জগদীশপ্রসাদ স্বীকার করিলেন।

দুই তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর শুভবিবাহের কথা বাড়ীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানিতে পারিল। সকলেরই পরতে পরতে আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নূতন দাস দাসীরা পুরাতন দাস দাসীদিগকে বলিতে লাগিল, "তোমরাই মানুষ, তোমাদেরই চাকরী করা সার্থক, কেন না, এই বিয়েতে আমাদের চেয়ে তোমাদেরই পাওনা থওনা বেশী। পুরাণর চেয়ে সকলেরই নূতন ভাল, কেবল চাকর চাকরাণীর বেলাই নয়?"

তাহাদের এই কথা—এই আনন্দে আক্ষেপের কথা শুনিয়া পুরাতন দাস দাসীদের মধ্য হইতে দুই একজন বলিল, "ভয় কি, তোমরাও কর্ত্তা-মহাশয়ের বড় মেয়ের ছেলের বিয়েতে বেশী বেশী পা'বে।"

আমলা মহলেও এই কথা উঠিল। তাহারাও বুঝিতে পারিল, পুরাণ আমলাদের ভাগ্যে ভাল ভাল শাল দোশালা আর নূতন আমলাদের পোড়া কপালে এক এক খানা বনাত—বড় জোর এক এক খানা চিত্রিয়াবুটী শাল!

শেষে তাড়া হুড়া হইবে বলিয়া দিন থাকিতেই দেওয়ান্ মহাশয় জিনিষ পত্র খরিদ করিবার জন্য কএকজন বুদ্ধিমান্ আমলাকে নিযুক্ত করিলেন। যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল, তাহারা একাদশ বৃহস্পতির বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র; কেন না, তাহারা প্রভুকে ঠকাইল না, বরং দশ টাকার জিনিষ খরিদের স্থলে পনর টাকা আর দুই শত টাকার স্থলে দুই শত পঁচিশ বা ত্রিশ টাকা বিবাহের খাতায় খরচ লিখাইয়া দিল! এইরূপ এ দিকেও যত বেশী, ও দিকেও তত বেশী! ধন্য প্রভুভক্তি! এইরূপ সাধুপুরুষ প্রভুভক্তগণ "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" স্বর্গভোগ করিয়া থাকে!

মহাসমারোহে বিবাহ হইবে, সুতরাং আয়োজনও তদনুসারে হইতে লাগিল। আরও দুই দিন কাটিয়া গেল।

পাঠক! বলিতে পারেন জগদীশপ্রসাদের বাটীর এত লোকের মধ্যে কাহার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী?—কিরণময়ীর। কিরণময়ী এক্ষণে শুধু কিরণময়ী নহেন,—আনন্দময়ী।

কিরণময়ীর বহুদিনের অসীমযত্নপালিতা আশালতা এত দিন পর্য্যন্ত কেবল বাড়িতেই ছিল—ফলবতী হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার পিতামাতার স্নেহ-বারি-সেচনে উহা ফলবতী হইতে চলিল। আজ কাল কিরণময়ীর আনন্দের সহিত, বোধ হয়, জগতের কোন উৎকৃষ্ট পদার্থেরই তুলনা হয় না। বিবাহ যে কি, কিরণময়ী এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছেন, স্বামী যে কি, তাহাও জানিয়াছেন, সুতরাং তিনি—আনন্দময়ী।

যে পিতা মাতা পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেন, সে বিবাহ সে বালিকা বুঝে না, বুঝেন কেবল সেই পিতা মাতা। আমরা সেরূপ পিতা মাতার বুঝাকে পাপ বলিয়া বিশ্বাস করি। যে যে কার্য্য করে, যে

[illegible] তাহার মর্ম বুঝিতে [illegible]

কার্য্য ? আমাদের বিবেচনায় উহা অকর্ত্তব্য। যাহারা জানে না, তাহারা এরূপ কার্য্য করে না, তবে যদি না বুঝিয়াও করে, তাহা হইলে তাহারা দোষী নহে, কিন্তু যাহারা জানিয়া বুঝিয়া এক জনকে দিয়া, অন্য জনকে করায়, তাহারাই অবশ্য দোষে—কেবল পিতা মাতা পুত্র কন্যার [illegible] হইয়া পরস্পর বলিয়া কথা ? কেবল বিবাহ বলিয়া নয়, সকল কার্য্যেই অগ্রে বুঝা, শেষে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত। কিরণময়ীর বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার মাতা কতকটা দোষী বলিয়া গণ্য হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার পিতা দোষী নহেন। তিনি কন্যাকে বুঝিবার সময় পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিয়া পরে বিজ্ঞের কার্য্যই করিয়াছেন। কিরণময়ীর ইহাই বিবাহ করিবার প্রকৃত অবস্থা। তিনি এই অবস্থায় বিবাহের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ 'আনন্দময়ী।

অকৃত্রিম ভালবাসায় ধীরেন্দ্রনাথ এত দিন পরে তাঁহার হৃদয়নাথ হইয়া চলিলেন বলিয়াই আজ কিরণময়ী—আনন্দময়ী।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদময়ী

জগদীশপ্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথের করে তাঁহার অগ্রজা কন্যা কিরণময়ীকে অর্পণ করিবেন, এ কথা হিরণ্ময়ীর কর্ণেও প্রবেশ করিতে বাকী থাকিল না। হিরণ্ময়ীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—আলোকে অন্ধকার দেখিল। তিনি অস্থির হইলেন, কিন্তু কি করিবেন, তাহার ঠিক করিতে পারিলেন না।—হিরণ্ময়ী বালিকা, তাই এত দিন আপনার মনে ঠিক দিয়া আসিয়াছিলেন, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ঠিকে ভুল হইল। তাঁহার পিতার ঠিক্ সেজন্যই ঠি

হইল। তিনি আরও বুঝিলেন যে, বিবাহ করা তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে, পিতার ইচ্ছাধীন। হিরণ্ময়ী নিরাশার অনন্তসাগরে মগ্ন হইলেন।

যে দিন হইতে এই কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, সেই দিন হইতে তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন। সেই দিন হইতেই আর আপনার কক্ষের বাহিরে পূর্ব্বের ন্যায় যখন তখন বহির্গত হন না। সর্ব্বদাই কক্ষে থাকিয়া চিন্তা করেন, রোদন করেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার সেই চারু ওষ্ঠাধরে আর হাস্যরেখা নাই, মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা নাই, শরীরে স্বাস্থ্য নাই এবং মনে সুখ নাই। সেই দিন হইতেই হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

অন্য কোন কারণে হিরণ্ময়ীর এরূপ মানসিক ও শারীরিক ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিলে, তিনি তাহা পিতা মাতা বা অন্য কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন, কিন্তু এ কথা ত কাহাকেই বলিবার নহে। তবু এক জনকে বলিবার আছে;—তিনি ধীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁহাকে বলিয়াই বা কি হইবে? যাঁহাকে বলিলে ইহার প্রতীকার হইতে পারে, তিনি পিতা, সুতরাং বলিবার নয়। মাতাকে বলিতে পারেন, কিন্তু পিতা আবার তাঁহার নিকট সব শুনিতে পাইবেন, সুতরাং তাঁহাকেও বলিবার নয়।—এই সকল কারণে হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

হিরণ্ময়ী পিতাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করেন। এক্ষণে পিতার ইচ্ছাতেই এই কার্য্য সমাধা হইবে—ধীরেন্দ্রনাথের সহিত অগ্রজা ভগ্নী কিরণময়ীর বিবাহ হইবে। সুতরাং তাঁহার অনেক দিনের আশা-লতা সমূলে শুকাইবে। শুকাইবে কেন?—শুকাইল। এই জন্য হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

হিরণ্ময়ী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এত দিন ধরিয়া যাহা ভাবিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা নিষ্ফল হইল।—আজ আমি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীশূন্য হইলাম।—ধীরেন্দ্রনাথ আর আমার নহেন, তিনি এক্ষণে আমার অগ্রজা ভগিনীর। বড় দিদি সৌভাগ্যবতী—আমি দুর্ভাগ্যের কিঙ্করী। বুঝিলাম, এক্ষণ হইতে আজীবন আমাকে দুর্দ্দম্য দুর্ভাগ্যের সেবা করিতে হইবে—নয়নের জলে আর উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার আরাধনা করিতে হইবে! হায়, বিধাতা আমাকে কাঁদাইবার জন্য—অগাধ দুঃখসাগরে

ডুবাইবার জন্য এই করিলেন! ধীরেন্—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—কণ্ঠরোধ হইল—অক্ষিযুগল ছল ছল করিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপতন হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী এক এক বার কি ভাবিতে লাগিলেন, আর তাঁহার প্রফুল্লকমলসদৃশ মুখমণ্ডল গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কেহ কাছে নাই, থাকিলে এই বিষাদ-প্রতিমা দেখিয়া তাহাকেও কাঁদিতে হইত।

হিরণ্ময়ী অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন—ভাবিলেন, কিন্তু কিছুতেই মন প্রবোধ মানিল না; বরং উত্তরোত্তর দুঃখোচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়া উঠিল। চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে এরূপ অবসন্ন করিল যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—পর্য্যঙ্কোপরে শুইয়া পড়িলেন। দরদরিত অশ্রুধারায় উপাধান ভিজিয়া গেল।

পাঠক, তুমি হয় ত বলিবে যে, হিরণ্ময়ী বিবাহের জন্য এত উতলা কেন? স্ত্রীলোক হইয়া এরূপ করা কি ভাল? তোমার এ প্রশ্নের উত্তর এই,—পুরুষের বেলা যদি এরূপ করিলে দোষ না হয়, তবে স্ত্রীলোকের বেলা কেন হইবে? বিবাহের ইচ্ছায়—বিবাহের সুখে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার। সেই ইচ্ছার বা সুখে যাহার বাধা লাগে, তাহারই হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, দশ দিক শূন্য হয় এবং জীবনধারণে অত্যন্ত কষ্ট হয়, এই জন্যই আজ হিরণ্ময়ী—বিষাদময়ী।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধীরেন্দ্রনাথ।

কিরণময়ী আহ্লাদে ও হিরণ্ময়ী বিষাদে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে আর একজন দুঃখের ভাগী উপস্থিত। ইনি ধীরেন্দ্রনাথ। জগদীশপ্রসাদের নির্ঘাত বাক্য ইহাঁকেও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ইহাঁর জন্য হিরণ্ময়ী যেরূপ উৎকণ্ঠিতা, ইনিও তাঁহার জন্য সেইরূপ উৎকণ্ঠিত।

এই দুই জনের হৃদয়, প্রাণ, মন সকলই সমবস্থ হইয়াছে। তবে প্রভেদ এই,—হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া বক্ষ ভিজাইতেছেন, ইনি তাহা না করিয়া অকূল বিষাদসাগরের পরতে পরতে ডুবিতেছেন। কিন্তু দুই জনেরই চিন্তা ও দুঃখ এক ধাতুর।

ধীরেন্দ্রনাথের বড় আশা ছিল, হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। তাহা যদি না হয়, তবে তিনি চিরকাল অবিবাহিত থাকিবেন। জগদীশ-প্রসাদ ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার কোন কন্যা প্রদান করিবেন কি না, তাহা তিনি জানিতেন না। তথাপি আপন ইচ্ছায় ঠিক করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি কন্যা দান করেন, তবে হিরণ্ময়ীকেই করিবেন। ধীরেন্দ্রনাথের এরূপ বিসদৃশ আশা কেবল ভালবাসার কল্পিত ফল ব্যতীত কাজের নহে, এক্ষণে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এক্ষণে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আত্মপোষিত আশা আশাই নহে। জগদীশপ্রসাদ যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, সুতরাং তাঁহার আশাই আশা।

ধীরেন্দ্রনাথের হিরণ্ময়ী প্রণয়-মোহিত অন্তঃকরণ কোনমতেই কিরণময়ীর দিকে নমিত হইল না, এই জন্য তিনি আজি এত অস্থির। কিরণময়ীকে তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই ছিল না, কিন্তু জগদীশপ্রসাদের অভিপ্রায় মতে কার্য্য না করিলে ভাল দেখায় না, কেন না জগদীশপ্রসাদ তাঁহার বিপদের পরিত্রাতা, ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্নজলদাতা এবং স্নেহে পিতা। তবে কি করিয়া তিনি এরূপ পরমহিতৈষীর বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন? কিন্তু এ দিকে আবার তাহার কিরণময়ীকে বিবাহ করিবার একেবারেই ইচ্ছা নাই। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। কিছু উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। মনে মনে নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে ধীরেন্দ্রনাথ হতাশ। তাঁহার অন্তর্জগতে বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লব যে কি, তাহা আর পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না।

দিবা অবসান হইল। অন্ধকার লইয়া সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যার সেই অন্ধকার কেবল জড়প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিল না,—ধীরেন্দ্রনাথের হৃদয়, মন ও প্রাণকেও আচ্ছন্ন করিল। ধীরেন্দ্রনাথের অন্তরে বাহিরে নিবিড় অন্ধকার।

তিনি এই ঘোরতর অন্ধকারে ডুবিয়া যেন হিরণ্ময়ীকে আর দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলেন, জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে লইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত। গভীর অন্ধকারের ভিতর এই দৃশ্য। ধীরেন্দ্রনাথ ইহা দেখিয়া চঞ্চল হইলেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে আর থাকিতে পারিলেন না। সাঁ করিয়া বহির্গত হইলেন।

বহির্গত হইয়া কোথায় গেলেন?—প্রিয়মাধবের নিকট। পথেই প্রিয়মাধবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দুই চারিটি কথা কহিলেন। তাহার পর কহিতে কহিতে যাইতে লাগিলেন।

প্রিয়মাধব বলিলেন, "ধীর! তুমি দিন দিন এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? অন্য দিন অপেক্ষা আজ আরও বেশী দেখিতেছি।"

ধীরেন্দ্রনাথ বিষাদিত চিত্তে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোমার চেষ্টা বিফল হইল আর আমার আশা ভরসাও পুড়িয়া গেল।"

প্রিয়মাধব ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কেন?"

"কর্ত্তামহাশয় কিরণময়ীর সহিত আমার বিবাহ দিবেন।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"সকলই প্রস্তুত। আগামী আষাঢ় মাসে বিবাহ।

এই কথা শুনিয়া প্রিয়মাধব উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া চলিতে লাগিলেন। এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার পশ্চাতে। ধীরেন্দ্র অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিলেন, বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হুঁছট লাগিল। তিনি প্রিয়মাধবের ভয়ে তজ্জনিত যন্ত্রণা মনে মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

প্রিয়মাধব বলিলেন, "ধীর! তাই ত, কি হইবে?"

ধীরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর।

উভয়ে আরও কতকটা পথ অতিক্রম করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রিয়মাধবের বাটীর বহির্দ্বার দেখা দিল। উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠকমহাশয়কে প্রিয়মাধবের বৈঠকখানার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুই বন্ধু সেই খানে গমন করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণতার গুরুতর ভারে অগ্রেই বসিয়া পড়িলেন। প্রিয়মাধব বসিলেন না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের

বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বৈঠকখানাগৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক করিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছিল, কিন্তু উহার আলোক বড় সমুজ্জ্বল ছিল না। সেই ক্ষীণালোকে ধীরেন্দ্র একবার চাহিয়া দেখিলেন, প্রিয়মাধবের বদনমণ্ডলে গভীর চিন্তার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি তাহা দেখিয়া আবার মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রিয়মাধব বলিলেন, "ভাই ধীর! কিরণময়ীকে বিবাহ কর। কর্ত্তা মহাশয়কে বলিয়াও যেকালে তাঁহার মত ফিরাইতে পারিলাম না, সেকালে আর ত কোন উপায়ই দেখিতেছি না। তিনি যখন নিজের অভিপ্রায়ে এই কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন তাহার ব্যতিক্রম করিলে কোন শুভ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অগ্রে বিবাহিত হইলে কনিষ্ঠার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন, কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া আর উপযুক্ত জানিয়াই কিরণময়ীর সহিত তোমার উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গৃহে গুণবান পাত্র থাকিতে, তাঁহাকে রাখিয়া আবার কোথা হইতে অন্য এক জন সেইরূপ পাত্র আনিবেন। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে, পরে অন্বেষণ করিয়া অন্য পাত্রের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবেন, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। আর ধরিতে গেলে এইরূপই হইয়া থাকে।"

ধীরেন্দ্রনাথের কর্ণ স্থির হইয়া প্রিয়মাধবের এতগুলি কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু রসনা ইহার উত্তরে একটিও কথা উচ্চারণ করিল না। ধীরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর।

ধীরেন্দ্রনাথকে এইরূপ থাকিতে দেখিয়া প্রিয়মাধব আবার বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে যে? আমার কথাগুলি সঙ্গত নয় কি?"

এবার ধীরেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন, বলিলেন, "দেখ, ভাই প্রিয়মাধব! তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহার সকলগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া কে নিজে অসুখী হইতে এবং আর এক জনকে অসুখী করিতে বাসনা করে? কর্ত্তা মহাশয় আমার পরম হিতৈষী। আমি কখন তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হই নাই। তাঁহার কথা আমার

শিরোধার্য্য। কিন্তু, ভাই! কখন যাহা হয় নাই- -এইবার তাহা হইল।" ধীরেন্দ্রনাথ এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাক্য রোধ করিলেন।

প্রিয়মাধব ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কি হইল?"

"আমি কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না।" এই কথা বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইলেন।

প্রিয়মাধব ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি, ধীর! এতে দোষ কি?"

ধীরেন্দ্রনাথ মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "কেন, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া নিজেও অসুখী হইব না, কিরণময়ীকেও অসুখী করিব না।"

প্রিয়মাধব বলিলেন, "কেন, তুমি মনে করিলেই নিজে সুখী হইতে পার আর কিরণকেও সুখী করিতে পার।"

ধীর।—"তাহা হইলে আজ আমি কেন এমন হইব?—

প্রিয়।—"এরূপ হওয়াও তুমি চেষ্টা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পার।"

ধীর।—"পরিত্যাগ? ক্ষমতার বাহিরে। যেরূপ করিলে আমি হিরণ্ময়ীকে ভুলিয়া গিয়া কিরণময়ীকে বিবাহ করিতে পারি, আজিও তাহা আমাতে বর্ত্তে নাই।"

প্রিয়।—"তুমি নিতান্ত বালক হইলে দেখিতেছি। কর্ত্তার কথামত কাজ কর, ভাল হইবে।"

ধীর।—"অন্যের বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমার নহে।"

প্রিয়।—"কর্ত্তা মহাশয়ের কথা কি উল্লঙ্ঘন করিতে আছে?"

ধীরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা' নাই, তা' করিও নাই,। কিন্তু —কিন্তু এবার করিলাম, এই অপরাধে আমি কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট মহা অপরাধী।"

প্রিয়মাধব দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার একটিও কথা রাখিতেছেন না, তজ্জন্য অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এবার তিনি ধীরেন্দ্রনাথের নিকট উপবেশন করিলেন। চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে একটিবারও চাহিলেন না—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

এবার প্রিয়মাধব যেন হতাশ হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি, ধীর! কি করিবে ?"

ধীরেন্দ্রনাথ সদুঃখে বলিলেন, "তোমাকে আর দেখিতে পাইব না।"

প্রিয়মাধব বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কেন দেখিতে পাইবে না!"

ধীর।—"আমি মধুপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইব।"

প্রিয়মাধবের বিস্ময় অধিকতর বৃদ্ধি হইল, মনে দুঃখ হইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তুমি পাগল। কেন এমন আশা করিতেছ ? কেনই বা এই যৎসামান্য মনোভঙ্গের কারণকে অসামান্য বলিয়া আকুল হইতেছ ? কেন মধুপুর ত্যাগ করিবে ?"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় কষ্টের সহিত বলিলেন, "নতুবা আমার আর অন্য উপায় নাই। এখানে থাকিলে আমায় ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে হইবে। ভাই প্রিয়মাধব! আমি তাহা পারিব না। একাকী আমিই কেন ? কেহই ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিতে পারে না। যদি করে, তবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যেরূপ করিলে আমাকে আর বেশী কষ্ট ভুগিতে হইবে না, আমি তাহাই করিব।—মধুপুর ত্যাগ করিব।"

প্রিয়মাধব দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথকে ফিরাইবার আর আশা ভরসা নাই। তিনি তাঁহার চিত্তোদ্বেগের শান্তি বিধান করিবার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তথাপি বলিলেন, "বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে, অতএব তুমি আরও কিছু দিন স্থির হইয়া থাক। আমি আবার চেষ্টা করিব। তবে নিতান্তই যদি কর্ত্তা মহাশয়ের মন ফিরাইতে না পারি, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিও। এক্ষণে ভাবিও না—কোথাও চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিও না।"

ধীরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। অনন্তর প্রিয়মাধবের নিকট বিদায় লইয়া আপনার গৃহে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গদাধর উপাধ্যায়।

গদাধর উপাধ্যায় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক—বিশিষ্টরূপ পণ্ডিত। মধুপুরে তাঁহার ন্যায় আর একটিও পণ্ডিত পাওয়া যাইত না। মধুপুরের সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানপ্রদর্শন করিত। লৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রত্যহ মধুপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা তাঁহার নিকট বিধান লইতে আসিত।

গদাধর উপাধ্যায়ের একটি বড় গোছের চতুষ্পাঠী ছিল। ছাত্রসংখ্যাও অনেক। তিনি সকলকেই স্মৃতিশাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। ছাত্রেরা তাঁহার নিকট অন্নবস্ত্রের সহিত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তন্মধ্যে কএকটি ছাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল। তিনি কোন স্থানে সামাজিক বিদায় পাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলে, সেই কএক জনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

উপাধ্যায় মহাশয় অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ। তাঁহার দেহ যদিও স্থূল, কিন্তু অত্যন্ত শিথিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সের পরমসখী একগাছি যষ্টির সহায়তা লইয়া ধীরে ধীরে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার ভ্রূপর্য্যন্ত পাকিয়া গিয়াছিল। তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ অধ্যাপনাকার্য্যে আর বড় পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। প্রধান ছাত্রেরাই নিম্নস্থ ছাত্রগণকে শাস্ত্রশিক্ষা দিতেন। তবে যে যে স্থলে কূট বাহির হইত, সেই সেই স্থলে তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন হইত।

গদাধর উপাধ্যায় মহাশয়ের চতুষ্পাঠীটি তৃণাচ্ছাদিত একখানি বড় চালা-ঘর। তাহার চতুর্দ্দিকে কোন আবরণ ছিল না, সুতরাং চারি দিক হইতেই তাহার অভ্যন্তর ভাগ দেখা যাইত। সুদৃঢ় সালের ও বাঁশের অনেকগুলি খুঁটির উপর চালাখানির ভর ছিল। বর্ষাকালে পাছে চতুষ্পাঠী-চালার ভিতর জল প্রবেশ করে, এইজন্য উহার মেঝে প্রায় দ্বিহস্ত উচ্চ ছিল। উহার উপরে উঠিবার জন্য চারি দিকে চারিটি সোপানমঞ্চ। প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করিয়া ধাপ। প্রত্যেক সোপানমঞ্চের দুই দিকে একটি করিয়া দুই দুইটি কামিনী

ফুলের গাছ। কামিনীফুলের গাছ যতদূর বাড়িতে পারে, সেগুলি ততদূরই বাড়িয়াছিল। প্রত্যেক গাছের নীচে আলবাল। সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা কলসী ভরিয়া তাহাতে জল ঢালিত। তাহাদেরই উপরে সেই আটটি কামিনী গাছের জীবন মরণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। চতুষ্পাঠীর মেঝের উপর সারি সারি আটখানি তক্তাপোস্। তক্তাপোস্গুলি বড় ও মজবুৎ। প্রত্যেকের উপর এক একখানি মাদুর পাতা। কিন্তু যেখানিতে উপাধ্যায় মহাশয় বসিতেন, সেখানির মাদুরের উপর একখানি পশুলোমনির্ম্মিত তক্তাপোস্-সমান আসন পাতা থাকিত।

সেই চতুষ্পাঠীর নিকটেই পশ্চিম দিকে গদাধর উপাধ্যায় মহাশয়ের ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোকের বাটী যেরূপ হইয়া থাকে, উহাও সেইরূপ ছিল। সেই বাটীতে উপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী, একটি বিধবা কন্যা, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ও তিনি থাকিতেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র বিদেশে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চতুষ্পাঠীর পূর্ব্ব দিকে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়ালের উপর তৃণাচ্ছাদিত বাটীর মধ্যে ছাত্রেরা অবস্থান করিত। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে তাহাদিগের ভোজনকার্য্য সমাধা হইত। গ্রীষ্মকালে কতকগুলি ছাত্র চতুষ্পাঠীর তক্তাপোসের উপর ঢালাও বিছানা পাতিয়াও শয়ন করিত।

রাত্রি গিয়াছে—প্রভাত আসিয়াছে। ছাত্রেরা আপনাপন পুঁথি লইয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রধান ছাত্রেরা নিম্নস্থ ছাত্রদিগকে পাঠ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন। এক এক স্থলের ব্যাখ্যায় ব্যাকরণের নানাপ্রকার সূত্র বিবৃত হইতেছে। বুদ্ধি অনুসারে ছাত্রেরা এক বারে দুই বারে তিন বারে বা ততোঽধিক বারে পাঠমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতেছে। যাহারা প্রথম-শিক্ষার্থী, তাহারা ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিতেছে, এখনও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঘটে নাই। কোন কোন ছাত্র ভ্রমক্রমে পুঁথির পাতা উল্টা পাল্টা করিয়া আবার ঠিক করিতেছে। কেহ বাঁখারির কলম কাটিতেছে। কেহ বা উপাধ্যায় মহাশয়ের পুঁথি নকল করিতেছে। কেহ তুলট কাগজে বড় কড়ি ঘসিয়া পালিস করিতেছে। কেহ মস্যাধারে কালি ঢালিতেছে। কেহ আলতা গুলিতেছে। কেহ বা লিখিতে লিখিতে ভুল লিখিয়া, তাহাতে

হরিতালমণ্ড ঘসিতেছে। এ দিকে উপাধ্যায় মহাশয় আপনার স্থানে উপবিষ্ট হইয়া একখানি সটীক মনুসংহিতার পুঁথি খুলিয়া কিসের ব্যবস্থা লিখিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে পরাশরসংহিতা, বৃহস্পতিসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, হারীত-সংহিতা, যমসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, শাতাতপসংহিতা, শঙ্খসংহিতা প্রভৃতি অনেকগুলি পুঁথি রহিয়াছে। সকলগুলিই চন্দনকাষ্ঠের পট্টে আবদ্ধ। জগদীশপ্রসাদ, উপাধ্যায় মহাশয়কে এই সকল চন্দনপট্ট প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। সংহিতাগুলিও তাঁহারই ব্যয়ে নূতন আকারে পুনর্লিখিত হইয়াছে। গদাধর উপাধ্যায় মহাশয় জগদীশপ্রসাদের কুলপুরোহিত।

চতুষ্পাঠীর ভিতর উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এইরূপে অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে জগদীশপ্রসাদের একজন দ্বারবান আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র প্রদান করিল। তিনি তাহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। পাঠক মহাশয় হয় ত এই পত্রখানির ভিতর কি আছে, জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন। পত্রখানির ভিতর ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর শুভ বিবাহের কথা লিখিত আছে। জগদীশপ্রসাদ এই বিবাহ সম্বন্ধে কি বলিবেন বলিয়া কুলপুরোহিত উপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয়ও পত্র পাঠ করিয়া যজমানগৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি পাল্কী ছিল। তিনি সেই পাল্কীখানিতে চড়িয়া গন্তব্য স্থলে গমন করিতেন। এক্ষণেও তাহাই হইল। চারি জন পাল্কীবাহক তাঁহাকে পাল্কী করিয়া জগদীশপ্রসাদের বাটী লইয়া চলিল। জগদীশপ্রসাদের দ্বারবান সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উপাধ্যায় মহাশয় তথায় গিয়া জগদীশপ্রসাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহা এখানে "অলমিতি বিস্তরেণ"।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া—চিকিৎসা।

আরও কএক দিন গত হইল—বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। কিরণময়ীর আনন্দ এবং ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর দুঃখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া ভাবিয়া এতদূর হতাশ হইলেন যে, তাঁহাকে হিরণ্ময়ী বলিয়া চেনা ভার। মনের সঙ্গে শরীরের যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা এক্ষণে হিরণ্ময়ীতে বর্ত্তমান। তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ হওয়াতে, শরীরও তাহাই হইল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন গুরুতর পীড়া হইয়াছে। মনুষ্যের প্রাণ স্বরূপ আশা বিনষ্ট হইলে, মনুষ্য জীবন্মৃত। হতভাগিনী হিরণ্ময়ীও তাহাই।

হিরণ্ময়ীর এই বিকৃত অবস্থা দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবীদেবী প্রভৃতি চিন্তিত ও ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, হিরণ্ময়ীর পীড়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে কি পীড়ায় এতদূর অবসন্ন হইয়াছেন, তাহা কাহারই অনুভূত হইল না। আহা, তাঁহার মর্ম্মপীড়া কেহই আজি পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল না। যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন, তবে সে ধীরেন্দ্রনাথ।

হিরণ্ময়ী আর নিয়মিতরূপে আহার করেন না—রাত্রিকালে নিদ্রা যান না—কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহেন না। তিনি যেন কি একটি প্রিয় পদার্থ হারাইয়া দুস্তর দুশ্চিন্তা-সাগরের অতল গহ্বরে ডুবিয়া গিয়াছেন। হিরণ্ময়ীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল।

দুই চারি দিন দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা হিরণ্ময়ীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াও রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। হিরণ্ময়ীও প্রকৃত রোগের কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পিতা মাতা বা অন্য কাহারই নিকট এ রোগের তথ্য প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহার নিকট করিবেন, হিরণ্ময়ী দেখিলেন, তিনিও তাঁহার ন্যায় পীড়িত। ইহাতেও তিনি অধিকতর অবসন্ন হইলেন।

জগদীশপ্রসাদ আর স্থির হইয়া থাকা ভাল নহে জানিয়া পারিবারিক চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিলেন। সেই চিকিৎসকের নাম সনাতন ধন্বন্তরি। তাঁহার বয়ঃক্রম আটচল্লিশ বৎসর। বর্ণ শ্যাম, গঠন একহারা, বাম চক্ষুটি অন্ধ, দাড়ী গোঁপ নাই, মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ। তিনি আকারে কিছু লম্বা। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে পারদর্শী; নাড়ীজ্ঞান বিলক্ষণ। চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি বিশেষরূপে দেখা আছে। রোগনির্ণয়ে চমৎকার অভিজ্ঞতা। সনাতন ধন্বন্তরি জাতিতে বৈদ্য। তিনি রোগনির্ণয় ও ঔষধপ্রয়োগসম্বন্ধে যেরূপ বিচক্ষণ, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতেও বিজ্ঞ। তদ্রচিত কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও ছিল।

জগদীশপ্রসাদের আহ্বানে ধন্বন্তরি মহাশয় হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিলেন। হিরণ্ময়ী শয্যায় শায়িতা। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় বিছানার এ পাশ ও পাশ করিতেছেন। হাত পা আছড়াইতেছেন। এক একবার যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছেন। আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব। পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব। একবার চক্ষু চাহিতেছেন আবার নিমীলিত করিতেছেন—আবার চাহিতেছেন—আবার নিমীলিত করিতেছেন। মর্ম্মের গূঢ়স্থলে অত্যন্ত যন্ত্রণা।

ধন্বন্তরি মহাশয় হিরণ্ময়ীর পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র অথচ পর্য্যঙ্ক-সমান উচ্চ চৌকীতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবী দেবী ও কিরণময়ী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিরণময়ী বেশী ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; পর্য্যঙ্কের অপর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। হিরণ্ময়ীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ধন্বন্তরি মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া দক্ষিণ করে হিরণ্ময়ীর বাম করের মণিবন্ধ ধারণ করিয়া নাড়ী দেখিলেন। একবার টিপিলেন, আবার ছাড়িলেন—আবার টিপিলেন, আবার ছাড়িলেন। এইরূপ কএক বার করিলেন, কিন্তু রোগনির্ণয় হইল না। কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে জাহ্নবী দেবী আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, "কি দেখিলে, ধন্বন্তরি ?"

ধন্বন্তরি মহাশয় বলিলেন, "কই জ্বর জ্বালা ত কিছুই নাই।"

জাহ্নবী।—"তবে কি ?"

ধন্বন্তরি মহাশয় জাহ্নবী দেবীর এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, হিরণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীরের ভিতর কিরূপ হইতেছে?"

হিরণ্ময়ী কষ্টপ্রসূতস্বরে বলিলেন, "কি রকম যে হইতেছে, তাহা ঠিক করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

জগদীশপ্রসাদ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "তবে কি করিয়া পীড়া ভাল হইবে? তোর্ রোগের কথা তুই না বলিলে কি করিয়া ঔষধ দেওয়া হইবে? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে নিজেও ভুগিবি আর আমাদিগকেও ভুগাইবি।"

পিতার এই ভর্ৎসনবাক্যে হিরণ্ময়ীর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিরণময়ী অঞ্চলে তাঁহার অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

জাহ্নবী দেবী দুই চারি কথায় জগদীশপ্রসাদকে বকিলেন।

ধন্বন্তরি মহাশয় বলিলেন, "রাত্রিকালে নিদ্রা হয় কিরূপ?"

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর হইয়া বলিলেন, "আজ কএক দিন ধরিয়া আদপেই ঘুম হয় না। সারা রাত্রিই ছট্‌ফট্ করে।"

ধন্বন্তরি বলিলেন, "ক্ষুধা কেমন?"

জাহ্নবী দেবী উত্তর করিলেন, "চারি ভাগের এক ভাগেরও কম।"

এই দুইটি কথা শুনিয়া সনাতন ধন্বন্তরি কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "মহাশয়! পীড়া এমন কিছুই নয়, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ বেশী, সেই জন্য শরীর অত্যন্ত গরম হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে আনীত একটি পিত্তলের বাক্স খুলিলেন। খুলিয়া এ মোড়ক সে মোড়ক হাঁট্‌কাইয়া একটি মোড়ক খুলিলেন। সেই মোড়কে যে ঔষধ-বটিকাগুলি ছিল, তাহা ভাল করিয়া দেখিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ মোড়ক করিয়া জগদীশপ্রসাদের হস্তে দিয়া কহিলেন, "মহাশয়! প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই বটিকার এক একটি ত্রিফলার জলে মাড়িয়া আপনার কনিষ্ঠা কন্যাকে খাওয়াইবেন। পাঁচ সাত দিন খাইলেই পীড়ার উপশম হইবে। আর প্রত্যহ তক্রসিক্ত অন্ন আহার করিতে দিবেন। তাহা হইলে ক্ষুধারও উদ্রেক হইবে এবং রাত্রিকালে নিদ্রারও ব্যাঘাত হইবে না।"

এই বলিয়া সনাতন ধন্বন্তরি জগদীশপ্রসাদকে অভিবাদন করিয়া ঔষধের

বাক্স হস্তে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি কল্য প্রাতে আবার দেখিতে আসিব।"

ধন্বন্তরি মহাশয় প্রস্থান করিলে পর জাহ্নবী দেবী ও কিরণময়ী উভয়ে মিলিয়া যথানিয়মে হিরণ্ময়ীকে ঔষধ সেবন করাইলেন। জগদীশপ্রসাদ দাঁড়াইয়া দেখিলেন।

হিরণ্ময়ী পিতামাতার ভয়ে ঔষধ সেবন করিলেন, কিন্তু পীড়ার জন্য নহে। এ ঔষধ যে তাঁহার প্রকৃত পীড়ার কিছুই করিতে পারিবে না, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার পীড়ার প্রকৃত ঔষধ ধীরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ। কিন্তু সেই ঔষধ না হইলে তাঁহার যে উত্তরোত্তর কি দশা ঘটিবে, তাহাই ভাবিয়া আবার অস্থির হইতে লাগিলেন।—পাঠক! হিরণ্ময়ীর এ কি হইল। বেচারীর আর কূল কিনারা নাই! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! বিশেষতঃ হিরণ্ময়ীর ন্যায় বালিকা!

ঔষধ সেবন সমাপন হইলে জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবী দেবী বাহিরে গেলেন। কেবল কিরণময়ীই কনিষ্ঠা ভগিনীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যাইবার সময় জাহ্নবী দেবী বলিয়া গেলেন, "কিরণ! দেখ মা, তুমি হিরণকে একাকিনী ফেলিয়া কোথাও যাইও না; আমি আবার এখনই আসিতেছি।"

পাঠক! ঐ দেখুন, হিরণ্ময়ীর কক্ষে শয্যাশায়িনী বিষাদময়ীর পার্শ্বে উপবিষ্টা আনন্দময়ী! কিন্তু আনন্দময়ীও আজ বিষাদময়ীর মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিষাদময়ী।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

সে দিন ও সে রাত্রি অতিবাহিত হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর পীড়ার কিছুই হইল না, বরং বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে আবার সনাতন ধন্বন্তরি আসিয়া

তাঁহাকে দেখিলেন। অনুপান বদলাইয়া দিলেন। আরও কি একটি ঔষধ দিলেন। অনন্তর চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার প্রস্থানের সময় জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ধন্বন্তরি! পীড়া বৃদ্ধি হইল কেন?"

ধন্বন্তরি মুখভঙ্গি দ্বারা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ও কিছুই নহে, মহাশয়! ঔষধের গুণে প্রথম প্রথম ওরূপ হইয়া থাকে। শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।" ধন্বন্তরি মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

আবার হিরণ্ময়ীকে ঔষধ সেবন ও যথা সময়ে তক্রমিশ্রিত অন্ন ভোজন করান হইল। কিন্তু হিরণ্ময়ী আহার করিতে পারিলেন না। সে দিন গেল, তাহার পর আরও চারি পাঁচ দিন গত হইল। হিরণ্ময়ী অধিকতর বিষণ্ণা। এই ব্যাপার দেখিয়া জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবী দেবী, কিরণময়ী ও বাড়ীশুদ্ধ লোক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কেন যে এমন সুচিকিৎসাতেও পীড়ার প্রতীকার হইতেছে না, এই ভাবনায় সকলেই অস্থির।

হিরণ্ময়ী পীড়িত হইয়া অবধি প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া ধীরেন্দ্রনাথের দর্শন পাইতেন। ধীরেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতেন, রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, সাবধান হইয়া থাকিতে বলিতেন। অদ্যও তিনি দেখিতে আসিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ যুবাবয়স্ক পুরুষ, তিনি ভগ্নহৃদয় হইয়াও হিরণ্ময়ীর মত প্রকাশ্যরূপে অস্থির হইয়া পড়েন নাই। তিনি অতি সতর্কতার সহিত মনের ভাব লুকাইয়া এ কয় দিন কাটাইতেছেন। কেবল প্রিয়মাধব তাঁহার মনের কথা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছেন। যাই হউক্, যদিও ধীরেন্দ্রনাথ মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আকার প্রকারে উহা যেন ধরা পড়িতেছে। কিন্তু অন্যে তাহা তলাইয়া বুঝিতেছে না।

ধীরেন্দ্রনাথ অন্য অন্য দিন যখনই হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিতেন, তখনই তাঁহার নিকট কিরণময়ীকে দেখিতে পাইতেন। পীড়া সম্বন্ধিনী কথা পাড়িতেন, কিন্তু, বোধ হয়, যেন আরও কি দুই চারি কথা বলি বলি, করিয়া মনেই চাপা দিয়া রাখিতেন, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না। অনেকক্ষণ থাকিয়া ফিরিয়া যাইতেন। হিরণ্ময়ীও কিরণময়ীর ভয়ে, নিকটে পাইয়াও, ধীরেন্দ্রনাথকে মনের কথা মনে মনেই বলিতেন, মুখ ফুটিয়া

বলিতে পারিতেন না। পাঠক! মনে কর দেখি, ধীরেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর এই নির্ব্বাক্ অবস্থার যন্ত্রণা কিরূপ ভয়ঙ্করী!

হিরণ্ময়ী, কিরণময়ী নিকটে আছেন বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে যেমন মনের কথা বলিতে পারিতেন না, সেইরূপ কিরণময়ীও, হিরণ্ময়ী কাছে আছেন বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে মনের কথা খুলিয়া বলিতেন না। যদিও তিনি মনে মনে আনন্দময়ী, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথকে চক্ষের নিকট পাইয়াও দুই চারিটি মনের কথা বলিতে না পারিয়া, তাঁহার আনন্দে এক এক বার বিষাদ-রেখা বসিয়া যাইত। কিন্তু তখনি আবার মনে মনে ভাবিতেন, "আর দিন কএক পরে ধীরেন্দ্রনাথ আমার হইবেন। তখন মনের কত কথাই বলিব।"

অদ্য ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিয়া কিরণময়ীকে দেখিতে পাইলেন না। ভালই হইল;—মনের কথা বলিবার পন্থা পরিষ্কৃত হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর পর্য্যঙ্কসন্নিহিত একখানি চৌকীর উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, "হিরণ! কেমন আছ?" এই কথা বলিয়া তাঁহার ললাটে করতলস্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, ললাট কিছু উষ্ণ।

হিরণ্ময়ী বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "মরিলেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না। ধীরেন্! আমি আর বাঁচিব না।" এই বলিয়া তিনি ধীরেন্দ্রনাথের ললাটস্পৃষ্ট করের উপর কর স্থাপন করিলেন। নয়ন হইতে অশ্রু বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথ ব্যথিতচিত্তে উহা মুছিয়া দিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। উহার শব্দ হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। হিরণ্ময়ী আরও দুঃখিত হইলেন। কহিলেন, "ধীরেন্! বড় দিদির আশা পূর্ণ হইল। তিনিই জগতে একমাত্র সুখিনী।"

ধীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও, যেন না বুঝিবার মত বলিলেন, "কেন, হিরণ্!"

হিরণ্ময়ী।—"কেন কি? তুমি ত সকলই জানিয়াছ।"

ধীরেন্দ্রনাথ অকপট মনে কহিলেন, "হিরণ! তুমিও ত জান।"

হিরণ্ময়ী।—"কি, ধীরেন্?"

ধীর।—"আমার শপথ—আমার প্রতিজ্ঞা।"

হিরণ্ময়ী।—"কি শপথ?—কি প্রতিজ্ঞা?" হিরণ্ময়ী ইহা জানিয়াও, না জানিবার মত বলিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভুলিয়া গেলে কি? সেই তোমার হস্ত হইতে দেবপ্রসাদিত পুষ্প লইয়া আমার শপথ—আমার প্রতিজ্ঞা—কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না।"

হিরণ্ময়ী এবার একটু হাসিলেন। আমরা এই হাসির মর্ম্ম বুঝিলাম না। হাসিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি পাগল নহি, তুমিই পাগল।"

হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন, "কেন কেন, আমি কিসে পাগল?"

ধীরেন্দ্র।—"কারণ, এখনও তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও শপথে বিশ্বাস করিতেছ না।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী লজ্জিত হইলেন, কিয়ৎ ক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি ভুলেও এমন মনে করিও না। আমি আমার নিজের কথা বা কার্য্যকে বরং অবিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের কথা বা কার্য্যকে ক্ষণকালের জন্যও অবিশ্বাসের অঙ্গস্পৃষ্ট করাইতে পারি না।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে কেন তুমি আমাকে পাগল বলিতেছ?"

হিরণ্ময়ী।—"বলিতেছি এই জন্য, কি করিয়া তুমি আমার পিতার কথা লঙ্ঘন করিবে? তাহা পারিবে না। সুতরাং বড় দিদিকে তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে—ইচ্ছা নাই সত্য,তথাপি দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কোন উত্তর নাই।

ইহা দেখিয়া সময় পাইয়া আবার হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তাই বলিতেছিলাম, তুমি পাগল।"

ধীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আমি এবার তোমার পিতার কথা রক্ষা করিতে অসমর্থ। পূর্ব্বে একজনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে কেমন করিয়া উহা লঙ্ঘন করিব? একটি প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরটি পালন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে তুমি কি করিবে, ধীরেন্?"

ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "চিরকালের জন্য মধুপুর পরিত্যাগ।"

এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখখানি আরও শুকাইয়া গেল—নয়ন ছলছল করিতে লাগিল—হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু দুইটি নিমীলিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথও তাঁহার তাদৃশ অবস্থা-পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

হিরণ্ময়ী এবার অতিশয় কাতর স্বরে বলিলেন, "তবে আমার দশা কি হইবে, ধীরেন্!"

ধীরেন্দ্রনাথ অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন, "হিরণ! কি বলিব বল? কি কথায় তোমার এ কথার উত্তর দিব, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার এ কথার উত্তর নাই।" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এবার ধীরেন্দ্রনাথেরও নয়ন ছল ছল করিয়া উঠিল।

হিরণ্ময়ী তাঁহার মন বুঝিলেন। আরও হতাশ হইলেন। আশা ছিল, কোন সদুপায় হইবে, এক্ষণে তাহাও ঘুচিয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্ম-স্থলে কি বিঁধিতে লাগিল। আলোকময় গৃহ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। হিরণ্ময়ী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, মস্তক ঘূরিতে লাগিল।

তখন ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর ও আপনার অবস্থা-বিপর্য্যয় দেখিয়া আর অধিক ক্ষণ সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। পাছে কেহ আসিয়া দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি ভাবিও না, সুস্থির হও। আমি এক্ষণে আসি, আবার আসিব।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী মস্তক ফিরাইয়া দেখিলেন, ধীরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। আবার ডাকিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পাছে কেহ শুনিতে পায়, সেই ভয়ে ডাকি ডাকি করিয়াও ডাকিতে পারিলেন না। নয়ন নিমীলিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া-প্রতীকার।

হিরণ্ময়ীর সহিত ধীরেন্দ্রনাথের যে সকল কথা হইতেছিল, পার্শ্বের গৃহে থাকিয়া কিরণময়ী তাহার কতক কতক শুনিতে পাইয়াছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ যখন প্রস্থান করিলেন, তাহার কিছুক্ষণ পরে কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিবণময়ীকে দেখিয়া হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিরণময়ী কাছে বসিয়া বলিলেন, "হিরণ! আবার এত বিষণ্ণ হইলে কেন?" হিরণ্ময়ী কাতর স্বরে বলিলেন, "বড় কষ্ট হইতেছে, বড় দিদি!"

এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণ্! আমি এতক্ষণে তোমার পীড়া কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

হিরণ্ময়ী কতকটা বিস্মিত হইলেন। আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি বুঝিয়াছ, বড় দিদি?

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "বলিলে রাগ বা দুঃখ করিবে না বল।"

হিরণ্ময়ী আরও বিস্মিত হইলেন। মনের ভিতর ভাবনা আসিয়া জুটিল। কিন্তু অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়াতে বলিলেন, "কেন রাগ করিব? কেন দুঃখ করিব? তুমি বল বড় দিদি!"

কিরণময়ী বলিলেন, "বাবাই তোমার শত্রু। মাও বড় ছাড়া যান না।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল। বলিলেন, "কেন? সে কি কথা? একি বল বড় দিদি?"

"কেন বলি, শুনিবে?" এই বলিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে বলিয়া।"

অন্যমনস্ক ব্যক্তির কর্ণে সহসা একটা উৎকট শব্দ প্রবেশ করিলে, সে যেমন হয়, সেইরূপ কিরণময়ীর এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীর বুক শিহরিয়া

উঠিল, হৃৎপিণ্ডে বেগে শোণিত উথলিতে লাগিল, বস্ত্রাবৃত দেহ-যষ্টি একবার কণ্টকিত হইল। যাঁহার কোমল কণ্ঠোত্থিত সুধাস্রাবী বচন-রসে কর্ণ জুড়াইয়া যায়, এ হেন কিরণময়ীর এই বাক্য হিরণ্ময়ীর কর্ণকুহরকে নির্ঘাত-রূপে আঘাতিত করিল। হিরণ্ময়ী অস্থির,লজ্জিত,শঙ্কিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনোগত ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "না, বড় দিদি! তাহা নয়। ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে, সে ত সুখের কথা, তজ্জন্য পিতা মাতা শত্রু হইবেন কেন?"

এবার কিরণময়ী হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "হিরণ! তুমি আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। আমি সব জানিতে পারিয়াছি। সত্য করিয়া বল দেখি, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোমার বিবাহ হইল না বলিয়া, তোমার মন ভাঙ্গিয়াছে কি না? তুমি ভয় বা লজ্জা করিও না—আমাকে তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিতে কোন বাধা নাই। আমাকে বল, তোমার কোন অপকার হইবে না।"

হিরণ্ময়ী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে সাহস পাই-লেন না। ভয় ও লজ্জাই তাহার কারণ।

হিরণ্ময়ীকে নিরুত্তর দেখিয়া কিরণময়ী বুঝিলেন, তিনি তাঁহাকে মনের কথা বলিতে সাহস পাইতেছেন না—বলিতেও পারিবেন না। সুতরাং আপনিই তখন বলিলেন, "হিরণ! আমি তোমাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসি। তুমিও আমাকে সেইরূপ ভালবাস,তা'ও জানি। আমাদের উভয় ভগিনীর ভালবাসা বরাবর যাহাতে অচল থাকে,আমার তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু এক্ষণে যে সূত্রে ইহা বিচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমি তাহা ঘুচাইয়া দিব। শুন, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। তোমার পীড়া যে কি আর পীড়ার নিগূঢ় কারণও যে কি, এক্ষণে আমি তাহা বুঝিয়াছি। সুতরাং তাহার প্রতীকার করিবই করিব।"

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অগ্রজা ভগিনী কি কৌশলে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। কত কি ভাবিলেন, কিন্তু সে কৌশলের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। তথাপি বুঝিলেন, বড় দিদি সমস্তই জানিতে পারিয়া-ছেন। লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না।

কিরণময়ী সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠা ভগিনীকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আর এমন কিছু বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "হিরণ! আমি যে কোন কৌশলে হউক্, ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। যাহাতে অন্য কোন পাত্রের সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহারই চেষ্টা করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না।—আরও বলি, আমিও তোমার ন্যায় ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি, কিন্তু জানিতাম না যে, এক জনকে ভালবাসিলে, আমার আর একটি ভাল বাসার—প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসার পাত্রীকে দুঃখভাগিনী করিতে হইবে। জানিলে কখনই ধীরেন্দ্রনাথকে এত দূর ভালবাসিতাম না। যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে আর তাঁহাকে ভালবাসিব না—তুমি যে মনে এবং যে অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ভালবাস, আমি সে মনে এবং সে অভিপ্রায়ে ভাল বাসিব না। তবে বন্ধুকে যেরূপে ভালবাসিতে হয়, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে সেইরূপে ভালবাসিব। ভগিনীপতিকে যেরূপে ভালবাসিতে হয়, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে সেইরূপে ভালবাসিব। হিরণ্ময়ি! আমি আবার বলিতেছি, তুমি আর ভাবিও না—ইচ্ছা করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিও না, সুস্থির হও, আমার কথায় বিশ্বাস কর—আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না। ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে এ কথা বলিও। আমিও বলিব।"

কিরণময়ীর এই দীর্ঘকালস্থায়ী বাক্যগুলি শুনিয়া হিরণ্ময়ীর ভয়লজ্জা দুঃখনিরাশাজড়ীভূত তমোময় অন্তরে কিঞ্চিৎ আলোক প্রকাশ হইল। মনে মনে কিরণময়ীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন—প্রণাম করিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এখনও কিছু বলিতে পারিলেন না।

আরও কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া, কিরণময়ী তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চেষ্টা বিফলা।

কিরণময়ীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বিস্ময়ের সহিত আনন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। তিনি এক একবার পুলকিত আবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি বড় দিদির নিকট এরূপ মনোমত কথা শুনিবার কখনই আশা করি নাই, কিন্তু তিনি আপনিই আমার আশার সুসার করিয়া দিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব কার্য্যের তুলনা নাই। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়া বড় দিদির উপর মনে মনে রাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম ভাল করি নাই। তিনি আমাকে আজিও যে পূর্ব্বের মত সমান ভাবে ভালবাসেন, আমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখিত হইয়া থাকেন, আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝি নাই। কেন বুঝি নাই? না—ধীরেন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়া। কিন্তু তিনিও ত ধীরেন্দ্রনাথকে আমার মত ভালবাসেন। তবে এমন করিলেন কেন? বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি, ধীরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা অধিক। তা নহিলে কখনই এরূপ করিতেন না। ধন্য বড় দিদি! আমি তোমার এই অতুলনীয় উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। কিন্তু যাবজ্জীবন তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া থাকিলাম।" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

কিরণময়ীর কথাগুলি হিরণ্ময়ীর মনে যতবার সমুদিত হইতে লাগিল, ততবারই যেন তাঁহার মন ও শরীর সুস্থির হইতে লাগিল। তাঁহার পীড়ার উপশম হইল। এক্ষণে হিরণ্ময়ী পীড়াহীনা।

ও দিকে প্রিয়মাধব প্রিয়তম বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথের নিকট পুনঃপ্রতিশ্রুত হইয়া জগদীশপ্রসাদকে অন্য পাত্রের সহিত কিরণময়ীর এবং ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন, অনেক কারণ দেখাইয়া দিয়া-

ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু হয় নাই। প্রিয়মাধবের নিকট ধীরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে হিরণ্ময়ী-লাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে ভবিষ্যতের ব্যাপার কিরূপে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা আমরা জানি না।

এদিকে কিরণময়ী হিরণময়ীর নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই পালন কার্য্যে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু সহসা কাহার নিকট উহা প্রকাশ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পিতা মাতার নিকট কন্যার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হয় না। ভয় ও লজ্জা আসিয়া জিহ্বা চাপিয়া ধরে।—এই জন্য তিনি মনে মনে নানা প্রকার কৌশল গড়িয়া তাঁহার দাসীর নিকট মনের কথা পাড়িলেন। দাসী অনন্যচিত্তে একটি একটি করিয়া সমুদয় শুনিল। শুনিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণী এ কথা শুনিয়াছেন?"

কিরণ বলিলেন, "না।—তুই তাঁহাকে বলিস্।"

দাসী বলিল, "তা যেমন বলিব, কিন্তু তিনি যদি আমার উপর রাগ করেন।"

কিরণময়ী হাসিয়া বলিলেন, "তোর উপর রাগ করিবেন কেন? যদি করেন ত আমার উপরেই করিবেন।"

দাসী কিরণময়ীকে বড় ভালবাসিত। সে এ কথা শুনিয়া বলিল, সেও ত ভাল কথা নয়।"

কিরণময়ী কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "সে যাই হউক, তুই বল্‌বি কি না? না বলিস্ ত আমি ভাত খাইব না।"

দাসী চঞ্চল হইল। বলিল, "আচ্ছা, বলিব।" এই কথা বলিয়া আবার বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

কিরণময়ী বলিলেন, "এখন বুঝিয়াও কাজ নাই। পরে বুঝাইয়া দিব।"

দাসী।—"আচ্ছা, তবে এখন যাই।"

কিরণ।—"হ্যা দেখ্, তুই কেবল এই কথাগুলি মা'র কাছে বল্‌বি যে, কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। এ কথা শুনিয়া তিনি যদি বলেন যে, কে ইহা বলিল? তাহা হইলে তুই বলিস্ যে, কিরণময়ী

নিজেই। কিন্তু আমি যে এ কথা মা'কে বলিবার জন্য তোকে পাঠাইলাম, তাহা যেন তিনি জানিতে না পারেন, কেমন ?"

দাসী বলিল, "না, তা বলিব না। আমি যেন আপনার ইচ্ছায় বলিতেছি, এইরূপ ভাবে বলিব।"

কিরণময়ী বলিলেন, "হাঁ, তাই বলিস্। দেখিস্ যেন এক বলিতে আর বলিয়া ফেলিস্ না।"

দাসী আপনার বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার জন্য বলিল, "না গো না, তা' কেন বলিব ? আমি এমনই কি না ? তবে এখন যাই।"

কিরণময়ী বলিলেন, "আচ্ছা, যা; কিন্তু খুব সাবধান।" দাসী প্রস্থান করিল।

দাসী চলিয়া গেলে পর, কিরণময়ী ভাবিতে লাগিলেন, "মা দাসীর নিকট এ কথা শুনিলে পিতাকে বলিবেন। অবশ্য আমাকে ডাক পড়িবে। পিতা আমাকে কিছু বলিবেন না, কিন্তু মা সব বলিবেন। তখন আমিও আমার মনের কথা তাঁহাকে বলিব। কারণ দেখাইলে অবশ্যই আমার কথা রক্ষা হইবে।" তিনি এইরূপ আরও কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

এ দিকে দাসী জাহ্নবীদেবীর নিকট গিয়া, এ কথা সে কথার পর কিরণময়ীর বিবাহের কথা পাড়িল। জাহ্নবী দেবীও বিবাহের বিষয়ে কত কি বলিলেন। দাসী সকলগুলিই শুনিল। শুনিয়া একটু বিরস হইল। জাহ্নবী দেবী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "তুই এমন হইলি কেন ?"

দাসী বলিল, "মা ঠাকুরুণ। তুমি যা বলিতেছ, তা শুনিয়া আমার আনন্দও হইতেছে, অসুখও হইতেছে।"

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "অসুখ আবার কিসের ?"

দাসী বলিল, "ধীরেন্দ্রনাথকে কিরণের বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই।"

জাহ্নবী দেবী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সে কি ? কে তোকে এ কথা বলিয়াছে ?"

দাসী।—"আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি। তিনি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে নারাজ।"

জাহ্নবী।—"কই, আমার কাছে ত সে কিছুই বলে নাই।"

দাসী।—"লজ্জার ভয়ে।"

জাহ্নবী দেবী কি নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া দাসীকে বলিলেন, "তুই কিরণময়ীর নিকট গিয়া ভাল করিয়া তাহার মনের কথা গুলি শুনিয়া আমাকে আবার সংবাদ দিস। আমি যে তোকে তাহার নিকট পাঠাই-তেছি, তাহা যেন সে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে লজ্জা ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিবে না।"

দাসী আবার কিরণময়ীর নিকট গমন করিল। গিয়া জাহ্নবী দেবীর কথা গুলি এক এক করিয়া বলিল। কিরণময়ী শুনিয়া উপায় ঠিক করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জাহ্নবী দেবীও নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। এক-বার স্বামীর নিকট এই কথা বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণ না জানিয়া বলিলেন না।

সে দিন এই রূপে অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রভাতে জাহ্নবী দেবী কিরণময়ীকে আপনার নিকট ডাকাইয়া বলিলেন, "কিরণ! স্বামীর প্রতি পত্নীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠে অবগত হইয়াছ। অদ্য আমি ও সে বিষয়ে আরও কতকগুলি কথা বলিব। পতিই পত্নীর গুরু। বিপদে ও সম্পদে স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র ভরসা। পতী সেবা করিলে নারীর স্বর্গলাভ হয়। যে পত্নী ভর্ত্তার প্রতি বিমুখ, তাহাকে অক্ষয় নরকে পতিত হইতে হয়। স্বামীই স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। পতিব্রতা রমণীর প্রতি দেবগণ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন, কিন্তু পতিসেবাহীনার প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত রুষ্ট হ'ন। স্ত্রী-লোকের পতিই একমাত্র গতি—পতি ব্যতীত তাহার আর ঐহিক ও পার-লৌকিক সুখের কেহই নাই। স্বামীসেবার জন্যই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী শৈব্যা প্রভৃতি রমণীগণ প্রত্যেক লোকের মুখে আজিও প্রশংসা লাভ করিতেছেন। তাই বলিতেছি, স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিসেবাই সর্ব্ব-তোভাবে কর্ত্তব্য। তোমারও বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। আর

অল্প দিন পরে দুই হস্ত এক হইবে। তুমিও সীতা সাবিত্রী [illegible] ভর্তৃসেবায় কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবে ;—দেখিও কখন যেন [illegible] অন্যথা করিও না। ধীরেন্দ্রনাথ তোমার স্বামী হইবেন, তাহা তুমি [illegible] য়াছ। তুমি তাঁহার প্রতি সর্ব্বক্ষণ ভক্তি প্রদর্শন করিবে।" জাহ্নবী দেবী কিরণময়ীর মনঃপরীক্ষার জন্য এই কথা গুলি বলিলেন।

কিরণময়ী জননীর মুখে স্ত্রীলোকের পতিসেবা ও ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহের কথা গুলি আদ্যোপান্ত শুনিয়া নীরব হইয়া নতমুখে চাহিয়া রহিলেন। জাহ্নবী দেবী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী বলিলেন, "মা! তুমি যাহা বলিলে, তাহার সকলগুলিই সত্য, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া হিরণময়ী নির্ব্বাক্ হইলেন।

কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে না পাইয়া জাহ্নবীর কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু কি, বাছা?"

কিরণময়ী বলিলেন, "তোমার কাছে বলিতে লজ্জা করে।" মুখ অবনত করিয়া এই কথা বলিলেন।

জাহ্নবী দেবী কন্যার মনোগত ভাবের আভাস পাইলেন। পাইয়াও যেন কিছুই জানেন না, এই রূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিরণময়ী দাসীর নিকট জননীর মনস্থ বুঝিয়াছেন। সেই জন্য মনে মনে উহা চিন্তা করিয়া মাতৃকৌশলের মর্ম্ম ভাবিতে লাগিলেন। জাহ্নবী দেবী তাহার কিছুই বুঝিলেন না। তিনি কেবল বুঝিলেন, কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে যে বিবাহ করিবেন না, তাহা তাঁহার লজ্জা জনিত নিরুত্তরতায় প্রকাশিত হইতেছে। জাহ্নবী দেবী এই রূপ বুঝিয়া কিরণময়ীকে বলিলেন, "মায়ের কাছে বলিতে লজ্জা কি? তুমি বল।" কিরণময়ী বলি বলি করিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন "মা! আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিব না।"

জাহ্নবী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কেন?"

কিরণ —"যদি আমার উপর রাগ না কর, তবে বলিতে সাহস করি।"

জাহ্নবী।—"কিসের রাগ?—তুমি বল।"

কিরণ।—"মনের মিলন হইবে না।"

জাহ্নবী।—"কি করিয়া জানিলে ?"

কিরণ।—"তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই বলিয়াই জানিয়াছি।"

জাহ্নবী দেবী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। বিবাহের এক প্রকার সমস্তই ঠিক হইয়াছে অথচ এমন সময়ে কিরণময়ী এ রূপ বলিতেছেন শুনিয়া তিনি গোলযোগে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তুমি গিয়া স্নানাহার কর। আমি ভাবিয়া দেখি, পরে বলিব।"

কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। জাহ্নবী দেবী ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর যথা সময়ে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন। কিন্তু ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। জগদীশপ্রসাদ আহার করিতে বসিলেন। জাহ্নবী দেবীও পূর্ব্ববৎ তাঁহার নিকট বসিয়া তালবৃন্ত বীজন করিতে লাগিলেন। ভোজনকার্য্যের প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইল।

এমন সময়ে এ কথা সে কথার পর জাহ্নবী দেবী জগদীশপ্রসাদকে বলিলেন, "যদি রাগ না কর, তবে একটি কথা বলি।"

জগদীশপ্রসাদ হাসিলেন। পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আহার করিতে করিতে পুরুষে রাগ করে না, স্ত্রীলোকেই করে।"

জাহ্নবী দেবীও পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আজ বোধ হয়, তাহার বিপরীত হইবে।"

জগ।—"তা' হইবে না, তুমি বল।"

কাজেই জাহ্নবী দেবীকে বলিতে হইল। তিনি বলিলেন, "কিরণময়ী গোলযোগ বাঁধাইতেছে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "কিসের গোলযোগ ? কি হইয়াছে ?"

জাহ্নবী বলিলেন, "বলিব না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ বাম হস্তে জাহ্নবী দেবীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "বলিতেই হইবে।"

জাহ্নবী।—"তুমি এখনি রাগিয়া উঠিবে।"

জগ।—"না।"

জাহ্নবী বলিলেন, "কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবে না। সে বলিতেছে, তাহার মনের মিল হইবে না।

জগদীশপ্রসাদ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "কে তোমাকে এ কথা বলিল?"

জাহ্নবী।—"সে নিজেই।"

জগদীশপ্রসাদ বিস্ময়সহকারে বলিলেন, "সে নিজেই বলিয়াছে?"

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "হাঁ।"

জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবী দেবীকে আর কিছুই বলিলেন না। দাসীকে ডাকিলেন। দাসী ভোজনগৃহে প্রবেশ করিল। জগদীশ তাহাকে বলিলেন, "এখানে কিরণময়ীকে ডাকিয়া আন্।"

দাসী প্রস্থান করিল।

জগদীশপ্রসাদের ভাব দেখিয়া জাহ্নবী কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, "কিরণকে রুষ্ট হইয়া কিছু বলিও না।"

জগদীশপ্রসাদ কথা কহিলেন না।

জাহ্নবী আরও ভাবিতে লাগিলেন। বলিলেন, "হ্যা দেখ, তুমি চুপ করিয়া থাকিও। আমিই তাহাকে বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী আসিয়া ভোজনগৃহের দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জগদীশপ্রসাদের নিকটে গেলেন না, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসীর মুখে সমুদয় কথা শুনিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইয়াছে।

জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে দেখিয়া বলিলেন, "কাণ্ডকারখানাটা কি?" এই কএকটি কথাতে তাঁহার ক্রোধচিহ্ন প্রকাশ পাইল।

কিরণময়ী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কি, বাবা?"

জগদীশ।—"তোর মতে কি আমাকে চলিতে হইবে?" এই কথার সহিত ক্রোধব্যঞ্জক আরও কত কথা বলিলেন।

তদ্দর্শনে জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "রাগ করিবে না বলিলে, কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহাই হইল। ভাল কথায় বল না। অমন করিয়া রাগ করিলে বা গালি দিলে কি হইবে?"

জগদীশপ্রসাদের কর্ণে এ কথা স্থান পাইল না। আবার কিরণময়ীকে

বলিলেন, "ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তোর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে। বিবাহেরও বেশী দিন বাকী নাই। কিন্তু তুই এমন সময়ে আপনার মতে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্।"

কিরণময়ী পিতার মুখে এই রোষপূরিত বাক্যগুলি শুনিয়া ভীত হইলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন,"প্রকৃত কথা বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে পিতা আমার উপর রাগ করিবেন না।" এই ভাবিয়া আবার ভাবিলেন,"না তাহা বলিব না। বলিলে বিপদ ঘটিবে—হিরণ্ময়ী মারা যাইবে। সে একে হতাশ হইয়া আছে, এমন সময়ে প্রকৃত কথা বলিলে, আমার যত না হউক, কিন্তু তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।" এই ভাবিয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জগদীশপ্রসাদ কন্যাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার বলিলেন, "কেন তুই ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে চাহিস্ না? কারণ কি বল্?"

কিরণময়ী ধীর স্বরে বলিলেন, "কারণ কি আমি জানি না, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিব না।" এই কথাগুলি বলিবার সময় কিরণময়ীর মুখমণ্ডলে লজ্জারেখা পরিস্ফুট হইল।

জগদীশপ্রসাদ এই কথা শুনিয়া রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শান্তমূর্ত্তি রৌদ্ররসে কতকটা আপ্লুত হইয়া উঠিল। কথা গুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া গেল। চক্ষু ঈষৎ আরক্তিম হইল। তাঁহার এ মূর্ত্তিবিপর্য্যয় দেখিয়া জাহ্নবী দেবী ও কিরণময়ী বড় ভীত হইলেন। দ্বারবহির্ভাগে দাসী দাঁড়াইয়াছিল, সেও ভয় পাইল। জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে বলিলেন, "হ্যা দেখ্, কিরণ। আবার যদি তোর মুখে বিবাহের অনিচ্ছার কথা শুনিতে পাই, তবে উপযুক্ত শাস্তি দিব। পিতা মাতা কন্যার মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকে; বিবাহ দেওয়া তাহার অন্যতম নিদর্শন। আমি উপযুক্ত পাত্রের হস্তে তোকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি; কিন্তু তুই বালিকাস্বভাব-সুলভ নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহার বিপরীত করিতে উদ্যত হইইয়াছিস্। সাবধান, আর যেন তোর একপ অন্যায় ইচ্ছা ও অন্যায় ব্যবহার দেখিতে না পাই। তুই নিশ্চয় জানিস, তোর খুব সৌভাগ্য যে, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হইবে।" এই কথা গুলি বলিয়া জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে নিজ কক্ষে যাইতে বলিলেন।

কিরণময়ী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। হিরণ্ময়ীকে কি বলিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। শেষে ভাবিয়া দেখিলেন তাঁহার চেষ্টা বিফলা।

জগদীশপ্রসাদের ভোজনব্যাপার শেষ হইল, কিন্তু তৃপ্তিবোধ হইল না। চিত্ত চঞ্চল ও অসুস্থ হইল। তিনি মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিশ্রামগৃহে প্রস্থান করিলেন। জাহ্নবীদেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

বিশ্রামগৃহে গিয়া জগদীশপ্রসাদ পর্য্যঙ্কোপরি বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলেন। জাহ্নবী তাঁহার নিকট বসিয়া তালবৃন্তের ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "যদি কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে না চাহে, তবে তুমি এক কাজ কর না কেন?

জগদীশ বলিলেন, "কি কাজ?"

জাহ্নবী।—"অন্য পাত্রের সহিত কিরণের বিবাহ দাও না কেন? এখনও ত সময় আছে; ঘটক পাঠাইয়া অনায়াসে ঠিক্ করিতে পার।"

জগ।—"তা' যেন পারিলাম, কিন্তু আমি হঠাৎ ধীরেন্দ্রনাথের মত মনোমত পাত্র কোথায় পাই? তোমরা স্ত্রীলোক, বুঝ না, তাই এমন কথা বল।"

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "আচ্ছা, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেন কিরণময়ীর বিবাহ হইল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর বেলা কি হইবে? তাহার জন্যও ত আর একটি বর ঠিক্ করিতে হইবে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "সে ভবিষ্যতের কথা। তখন অন্বেষণ করিয়া দেখা যাইবে। এখন ত আর হঠাৎ এই অল্পদিনের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতে পারে না। আর এক কথা এই, ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিরণময়ীর বিবাহ হইবে, ইহা সকলেই জানিয়াছে। এখন্ আবার আমি কি করিয়া তাহার বিপর্য্যয় করিতে পারি? ধীরেন্দ্রনাথই বা কি মনে করিবে? আমা হইতে তাহা হইবে না। আমি কিরণময়ীর কথায় চলিতে পারি না।"

জাহ্নবীদেবী এই কথাগুলি শুনিয়া কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তাই ত, কি হইবে।"

জগদীশ বলিলেন, "কি হইবে কি? তোমরা স্ত্রীলোক, বুঝিয়াও বুঝ না। যে কিরণময়ীকে ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক দেখিতেছ, বিবাহের পর সেই কিরণময়ীকেই আবার পতিপরিচর্য্যানুসারিণী দেখিবে। অনেক স্থলে এই রূপ হইতে দেখা যায়। ইহার জন্য তুমি ভাবিও না।" এই বলিয়া স্বীয় উদরে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, "তা হইলেই সুখের বিষয়। ভগবান্ কিরণময়ীকে সেই রূপ মতি দিউন।" এই বলিয়া তিনি আহার করিতে গেলেন, কিন্তু সুখ নাই। কিরণময়ী কখন কি করেন, এই ভাবনাতেই তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

জগদীশপ্রসাদও পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান্ থাকিয়া মনে মনে এই সকল কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশ।

কিরণময়ী পিতার নিকট ভর্ৎসিত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ হিরণ্ময়ীর অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকতর পীড়িত হইল। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিলেন যে, এ কথা যদি হিরণ্ময়ীর কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহার ঘোর সর্ব্বনাশ হইবে। এই জন্য কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে এই কথা বলিবার ইচ্ছা করিলেন না।

এ দিকে হিরণ্ময়ী আপনার কক্ষে বসিয়া আছেন। তিনি অগ্রজা ভগিনীর সেই সকল আশ্বাসপ্রদ বাক্যগুলি শুনিয়া অবধি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। এখন শয্যাতলে প্রতিনিয়ত শুইয়া থাকেন না। উঠিয়া বসেন, গৃহমধ্যে পদচারণা করেন এবং মধ্যে মধ্যে বহির্ভাগেও আসেন, কিন্তু বেশী দূর গমন করেন না। এক্ষণে হিরণ্ময়ী শয্যার উপরে বসিয়া ভাবিতেছেন, "বড় দিদি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ না করিলে, পিতা অন্য পাত্রের

সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। বড় দিদি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে নিশ্চয় জানিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিবেন, কিন্তু পিতা কি বড় দিদির ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন ?" শেষ কথা গুলি ভাবিয়া হিরণ্ময়ী কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেন। আবার ভাবিলেন, "বড় দিদি খুব বুদ্ধিমতী ; তিনি আপনি কৌশল করিয়া পিতার মন ফিরাইতে পারিবেন।" হিরণ্ময়ী এই রূপ কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

কিরণময়ী অন্য দিন হিরণ্ময়ীর কক্ষে এতক্ষণ কতবার যাওয়া আসা করিতেন, কিন্তু অদ্য এখনও তথায় যান নাই। যাইয়া কি বলিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়াই যান নাই।

দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয় প্রহর উপস্থিত হইল।

যে দাসী জগদীশপ্রসাদের আহারের সময় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিল, কিরণময়ীর ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবার অনিচ্ছার কথা এবং তজ্জন্য জগদীশপ্রসাদের ভৎ্সনবাক্য যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দাসী হিরণ্ময়ীর কক্ষে আসিল। তাহার হস্তে জলখাবারের পাত্র। সে জাহ্নবী দেবীর আদেশে হিরণ্ময়ীকে জলখাবার খাওয়াইতে আসিল। সেই দাসীটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে। দেহ বর্ণ মধ্যম গোছের, মুখশ্রীও তাহাই, নাকে উল্কি ও তাহার উপর বসকলি, দাঁতে মিসি, গলায় সোণার দানা। দাসী বিধবা,—পরণে শাদা কাপড়। উহার নাম হারাণী।

হারাণী আসিয়া হিরণ্ময়ীকে জলখাবার খাওয়াইতে লাগিল। এ কথা সে কথার পর হারাণী বলিল, "ওগো, আজ দুপুর বেলা কর্ত্তার ভাত খাবার সময় তোমার বড় দিদিকে নিয়ে গোলযোগ বেঁধে গিয়েছিল।"

হিরণ্ময়ী এই কথা শুনিয়া উৎসুক হইয়া বলিলেন, "কি গোলযোগ, হারাণি ?"

হারাণী বলিল, "তোমার বড় দিদি ধীরেন্দ্রনাথকে বিয়ে কত্তে নারাজ। গিন্নী ঠাকুরুণ সেই কথা কর্ত্তা মশায়কে বলেছিলেন, তাই তিনি তোমার বড় দিদিকে ডাকিয়ে বড় বকেছেন।"

হিরণ্ময়ীর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সাবধান হইয়া বলিলেন "তাহার পর কি হইল ?"

দাসী।—"কর্ত্তা মশায়ের যা' ইচ্ছে, তা'ই হ'বে। তোমার বড় দিদির সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের বিয়ে হ'বে।"

হিরণ্ময়ী আরও অস্থির হইলেন, কিন্তু পাছে হারাণী তাঁহার মনের ভাব জানিতে পাবে, এই জন্য সতর্কতার দিকে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন।

হারাণী আবার বলিল, 'হ্যাগা, ধীরেন্দ্রনাথ অমন গুণবান আর সুন্দর পুরুষ, তোমার বড় দিদি কেন তাঁ'কে বিয়ে কত্তে চা'ন না?"

হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "তা' আমি কি করিয়া জানিব?" কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষ হইল। হারাণী তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিল, অসুখের জন্য এইরূপ হইয়াছে।

হারাণী বলিল, "অমন সুন্দর যুবকে বিয়ে কত্তে কা'র না ইচ্ছে হয়, কিন্তু তোমার বড় দিদির যে কি পসন্দ, তা' আমরা বুঝতে পারি না। তা যা'ই হউক, কর্ত্তা মশায় ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বড় দিদির বিয়ে দিবেন বলেছেন। কর্ত্তা মশায় খুব বুদ্ধিমান মানুষ।"

হিরণ্ময়ী হারাণীর এই কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, "হারাণি! বড় দিদি বাবার আর মায়ের মন বুঝিবার জন্য সেইরূপ করিয়াছিলেন, বোধ হয়।"

হারাণী তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিল, "তা' হ'বে।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর হস্তে একটি তাম্বূল দিয়া জলখাবারের উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া প্রস্থান করিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে আর বেশী কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেন না বলিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন না। পাছে কথায় কথায় মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে বলিয়াই এইরূপ করিলেন। কিন্তু কিরণময়ীর মুখে সমুদয় তদন্ত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ও দিবসের অন্তিম দশা উপস্থিত। উভয়েই অন্তর্হিত হইল। সন্ধ্যা আসিল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইল, ধূনার সুগন্ধ-মিশ্রিত ধূমোত্থিত হইতে লাগিল এবং দীপবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত হইল। সন্ধ্যার পর ক্রমে ক্রমে রাত্রি গাঢ় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গেল। কিন্তু আজি এখনও কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর কক্ষে অনুপস্থিতা।

রাত্রির আরও কিয়দংশ বৃদ্ধি হইলে পর, কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর নিকট

আসিলেন। হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া চিন্তাকুলা কিরণময়ীর চিত্ত আরও অস্থির হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ীর মুখখানি দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদ-রেখা অঙ্কিত হইতে লাগিল। কি বলিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

পাঠক মহাশয়ের মনে আছে যে, কিরণময়ীর কক্ষেই উভয় ভগিনী রাত্রিকালে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ কক্ষেও শয়ন করিতেন, তাহাও আপনি জানিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে হিরণ্ময়ী পীড়িতা হওয়াতে কয় দিন ধরিয়া কিরণময়ী কনিষ্ঠা ভগিনীর গৃহে রাত্রি-কালে শয়ন করিতে আসেন। অদ্যও সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন। হিরণ্ময়ী পীড়িতা, এই জন্যই অদ্য আসিয়াছেন, নতুবা অদ্যকার মাধ্যাহ্নিক ঘটনা স্মরিয়া তাঁহার একেবারেই আসিবার ইচ্ছা ছিল না।

কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। হিরণ্ময়ীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

হিরণ্ময়ী দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "বড় দিদি! তুমি আজ দিনের বেলায় একটি বারও আমাকে দেখিতে আসিলে না।"

কিরণময়ী বলিলেন, "তজ্জন্য আমি তোমার কাছে দোষী, কিন্তু কি করিব, আসিতে অবকাশ পাই নাই। তুমি কিছু মনে করিও না।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হিরণ্ময়ী বলিলেন, "বড় দিদি! হারাণীর মুখে শুনিলাম, বাবা তোমাকে নাকি বড় বকিয়াছেন?"

কিরণময়ী চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, "বাঃ লক্ষ্মীছাড়া মাগী সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া গিয়াছে। আমি এখন কি উত্তর দি? ভাঁড়াইতে হইল, নতুবা অন্য উপায় নাই।" এই ভাবিয়া বলিলেন, "বাবা যেমন মাঝে মাঝে বকেন, সেইরূপ বকিয়াছেন।"

হিরণ্ময়ী।—"না, সে রকম বকা ত নয়, তুমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবে না বলিয়াছিলে বলিয়া তিনি বকিয়াছেন।"

কিরণময়ী বলিলেন, "না না, হারাণী মাগী ধান শুনিতে পান শুনে। সে কি শুনিতে কি শুনিয়া তোমার কাছে উল্টা বলিয়াছে। তুমিও যেমন,

হিরণ্! কেন তাহার কথা শুন? সে মাগীর কাজই ঐ,—মিছামিছি গোল-যোগ বাঁধায়।"

হিরণ্ময়ী ম্লানমুখে বলিলেন, "বড় দিদি! আমি আরও ভাবিব বলিয়া তুমি আমাকে বলিলে না, কিন্তু আমার মনে বড় সন্দেহ হইয়াছে। আমি হারাণীর কথা শুনিয়া আশায় নিরাশ হইয়াছি।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিরণময়ী দেখিলেন, বড় সঙ্কট উপস্থিত হইল। কি করেন, নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে হিরণ্ময়ীকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "দেখ, হিরণ! তুমি কেন পরের কথায় ভাবিয়া কষ্ট পাও? আমি যাহা বলি, তাহাই শুন। আমার কথায় কান দাও না, এ জন্য আমি বড় দুঃখিত হই। চুপ করিয়া ঘুমাও। কোন ভাবনা নাই।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, বড় দিদি কিছুই ভঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না—বলি-বেনও না। সুতরাং চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু উস্‌খুস্ করিতে লাগি-লেন। চক্ষে নিদ্রা আসিল না। কিরণময়ী তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। উভয় ভগিনীরই নিদ্রা নাই—চিন্তায় অস্থির। অনেকক্ষণ পরে কিরণময়ীর নিদ্রা আসিয়াছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ী একেবারেই জাগিয়া-ছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া একপার্শ্বে শুইয়া গাত্রবেদনাবশতঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গচালনায় মধ্যে মধ্যে কিরণ-ময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। কিরণময়ী যখনই ভগ্ননিদ্র হইয়াছিলেন, তখনই হিরণ্ময়ীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠা ভগিনী নিদ্রা যান নাই বলিয়া মনে মনে কষ্টও পাইয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীর যন্ত্রণা ভোগের যামিনী যেন অনেক বিলম্বে কাটিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। নিদ্রিত নরনারী জাগিল, কিন্তু আশায় নিরাশ জাগরিতা হিরণ্ময়ী জাগিলেন কি বলিব?—না। যাঁহার চক্ষে নিদ্রার নাম মাত্রও নাই, তিনি ত জাগরিতাই।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশার ফল।

গত দিবস মধ্যাহ্নের সময় বিবাহ লইয়া যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, অদ্য প্রাতঃকালে উহা এক মুখ, দুই মুখ, পাঁচ মুখ, দশ মুখ করিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ঐ কথা লইয়া কাণাকাণিও করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঐ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের জন্য উৎসুক হইলেন। কিরণময়ী গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। এক্ষণে হিরণ্ময়ী একাকিনী।

কিয়ৎকাল হিরণ্ময়ী স্বীয় কক্ষে থাকিয়া আর থাকিতে পারিলেন না—আস্তে আস্তে মাতার নিকট গমন করিলেন। জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে শীর্ণ ও বিমর্ষ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "হাঁ মা! আবার কি কাল রাত্রিতে অসুখ বাড়িয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী ধীরস্বরে বলিলেন, "বড় কষ্ট হইয়াছিল।"

জাহ্নবী দেবী বলিলেন, "তবে কেন আবার এখানে আসিলে? যাও শোও গিয়া।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "যাইতেছি।" এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। জাহ্নবী দেবী তাঁহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "কাল রাত্রিতে নিদ্রা হইয়াছিল?"

হিরণ্ময়ী ধীরস্বরে বলিলেন, "না।"

জাহ্নবী।—"নিদ্রা না হওয়াই ত তোর রোগ। আজ ধন্বন্তরি আসিলে ঔষধ বদলাইয়া দিতে বলিব।" এই বলিয়া আবার বলিলেন, "যাও, এখন না হয় একটু ঘুমাও গিয়া। সকাল বেলা বেশ ঠাণ্ডা আছে, হয় ত ঘুম আসিতে পারে।"

হিরণ্ময়ী আবার "যাই" বলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা! কাল বাবা বড় দিদিকে কেন বকিয়াছিলেন?"

জাহ্নবী।—"তোমাকে সে কথা কে বলিল?"

হিরণ।—"হারাণী।"

জাহ্নবী।—"তোমার বড় দিদি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে নারাজ হইয়াছিল, তাই তোমার বাবা তাহাকে বকিয়াছিলেন।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "তা'র পর কি হইল, মা?"

জাহ্নবী বলিলেন, "তা'র পর আর কি হইবে?—বিবাহই হইবে। বিবাহের দিনও ত নিকট হইয়া আসিল। এখন কালী দুর্গার ইচ্ছায় তোর ব্যারাম সারিয়া গেলেই আর কোন ভাবনা থাকে না।"

মাতৃমুখে ধীরেন্দ্রনাথের সহিত জ্যেষ্ঠা ভগিনীরই বিবাহ হইবে শুনিয়া হিরণ্ময়ী বুঝিলেন, তাঁহার আর আশা ভরসা কিছুই নাই। কিরণময়ী যে, গত রাত্রিকালে তাঁহাকে ভাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাও বুঝিলেন। মাতা নিকটে আছেন বলিয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলেন। আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। বলিলেন, "মা! তবে আমি আসি, গিয়া খানিক ঘুমাই।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন।

জাহ্নবীদেবীর নিকট হইতে হিরণ্ময়ী আত্মভাব গোপন করিয়া আসিলেন, কিন্তু বাহিরে আসিয়া আর সামলাইতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন। নয়ন দুইটি উছলিয়া উঠিল—গণ্ডদ্বয় বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ অঞ্চল ঘর্ষণে চক্ষু যুগল আরক্ত হইল। তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত স্থলে যেন কিসের ঘন ঘন আঘাত হইতে লাগিল। চরণ আর যেন চলিতে চায় না। একে হতভাগিনী দুর্ব্বলা, তাহার উপর আবার এই নিদারুণ মনঃপীড়া, সুতরাং আর আপনা-আপনি আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। কিরণময়ীর আশ্বাসে তাঁহার মনের ভিতর যে আনন্দ টুকু জন্মিয়াছিল, তাহা বিলীন হইয়া চতুর্গুণ মাত্রায় যন্ত্রণার উৎস ফুটিয়া উঠিল। নিরাশা-ভুজঙ্গী-দংশিতা হিরণ্ময়ীর এই অসদৃশ মর্ম্মবেদনার মর্ম্ম বলিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার পন্থা নাই। তাঁহার মর্ম্মযন্ত্রণা তিনি এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই বুঝিতেছেন। আহা, এমন যে

মনোহর প্রভাত, তাহাও তাঁহার চক্ষে অমাবস্যার ভয়ঙ্করী নিশীথিনীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

মর্ম্মাহতা স্খলিতপদ. হিরণ্ময়ী আপনাকে এই শঙ্কটকূটদশায় নিক্ষিপ্ত করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শিথিল-শরীর হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। সুকোমল তূলগর্ভ শয্যাতল হইতেও যেন তাঁহার কোমল ও ক্লেশজর্জ্জরিত অঙ্গে তীক্ষ্মমুখ কণ্টকজাল বিদ্ধ হইতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীরে যত টুকু বল থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও ঘুচিয়া গেল। মস্তক ঘুরিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী আপনাকে যেন বিশ্ব সংসারের মধ্যে যন্ত্রণার একমাত্র প্রস্রবণ মনে করিলেন।

হিরণ্ময়ী জননী-বদনে শুনিয়াছেন, পিতা নিশ্চয়ই ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অগ্রজা ভগিনীর বিবাহ দিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না। তিনি এখন কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার কথা পিতা মাতাকে বলিবেন। আবার ভাবিলেন, তাহা তাঁহা হইতে হইবে না—তিনি প্রাণ গেলেও মুখ ফুটিয়া এ কথা তাঁহাদিগকে বলিতে পারিবেন না, অথচ প্রতি নিমেষপাতে অসহ্য নিরাশা-জনিত যন্ত্রণার বজ্রমুষ্টিতে আপনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবেন। হিরণ্ময়ীর এই মর্ম্মবিদারিণী দূরবস্থা ও যন্ত্রণার শেষ সীমা, বোধ হয়, বিধাতা নির্ণয় করেন নাই, কেবল বৃদ্ধি হইবারই পন্থা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন! হা হতভাগিনী হিরণ্ময়ী! তুমি কেন ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারিতেছ না? বুঝিয়াছি, পারিবে না। তাহা পারিলে কি তোমাকে এখনও এত কাঁদিতে হয়—এত ভাবিতে হয় এবং এত হতাশ হইতেও হয়। বুঝিয়াছি, তুমি জগৎকে ভুলিতে পার, জগতের অস্থিমজ্জাবিজড়িত একটি পরমাণুর অপার অংশের এক এক অংশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন বিশ্বলোচন সূর্য্যকেও ভুলিতে পার—তুমি আপনাকে ভুলিতেও পার, কিন্তু একমাত্র ধীরেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পার না—পারিবেও না। হিরণ্ময়ি! দশ বৎসরের কথা বলিতেছি, তুমিই না তোমাদের বাড়ীতে ধীরেন্দ্রনাথের প্রথম পদার্পণের দিন সুধামাখা ওষ্ঠাধরে হাসি মাখাইয়া তাঁহার সহিত খেলা করিতে চাহিয়াছিলে? তুমিই না সেই অপরিচিত নব আগন্তুক বালককে পরিচিতের ন্যায়

এই চক্ষে দেখিয়াছিলে? কিন্তু, হায়, হতভাগিনি! আজ তোমার সেই এই ওষ্ঠাধরে সেই হাসির খেলা কই?—সেই এই পদ্মপলাশ-লোচনে সেই আলাপ কৌশলই বা কই? আজ তোমার পক্কবিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধর বৈমর্ষ্যের আকর—নয়নযুগল উত্তপ্ত-অশ্রু-তরঙ্গের মহাসাগর! বিধাতার বিধি বা কৌশল যে কিরূপ ভৌতিক, কিরূপ চঞ্চল, কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা তোমার সেই দিন আব এই দিনেব সঙ্গেই তুলনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়! পাঠক! হিরণ্ময়ীর এ কি হইল! ইহাব প্রতীকার কি? ইহার পরিণাম কি?—ঈশ্বরই জানেন।

হিরণ্ময়ী অনেক কাঁদিলেন—অনেক ভাবিলেন। কিন্তু দেখিলেন—তীব্র দৃষ্টির সহিত ভবিষ্যতের অভেদ্য তমোরাশির মধ্যে দেখিলেন, তাঁহার আশা-লতাটি শুকাইয়া গিয়াছে। সেই লতাটিতেই তাঁহার জীবনী-শক্তি ও ইহ-লোকে অবস্থিতির আশ্রয় ছিল, সে দুইটিও তাহার সহিত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই তিনটির অভাবে আরও দেখিলেন, তিনি যেন আর বাঁচিয়া নাই! অমনি তাঁহার চমক হইল। এমন সময়ে এরূপ চমক যে কেন হইল, তাহা হিরণ্ময়ী এবং হিরণ্ময়ীর অবস্থাপন্ন হতভাগ্য বা হতভাগিনী ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারিবে না।

হিরণ্ময়ী চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। মাথা ঘূরিতে লাগিল। আবাব শুইয়া পড়িলেন। অশ্রুপাতের বিবাম নাই। চক্ষু যুগল ও মুখমণ্ডল আরক্তিম। সেই আরক্তিম মুখমণ্ডলেব ইতস্তত অশ্রুলিপ্ত হওয়াতে, বোধ হইল যেন প্রস্ফুটিত অনব গোলাপেব উপর শিশির সিঞ্চিত হইয়াছে। •

প্রভাত হিবণ্ময়ীকে কাঁদাইয়া সে দিনের মত চলিয়া গেল। মধ্যাহ্ন আসিল। হিরণ্ময়ীকে কি সান্ত্বনা করিতে? কে বলিল?—কাঁদাইতে! পলকে পলকে যেরূপ অশ্রুবৃদ্ধি, দেখিলে ভয় হয়, পরিণামে কি দাঁড়াইবে।

নাবাণেব মা হিরণ্ময়ীকে আহার করিতে ডাকিতে আসিল। বৃদ্ধা দাসী আসিয়াই অবাক্। হিরণ্ময়ীর বোদনে ও মুখমণ্ডল-বিস্ফুরিত-বৈমর্ষ্যে তাহারও হৃদয় গলিয়া গেল। সে হিরণকে প্রাণের সহিত ভালবাসে বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বড় কষ্ট হইতেছে কি? শরীরের ভিতর—মনের ভিতর কি রকম হইতেছে?" এই বলিয়া হিরণ্ময়ীকে আপনার বক্ষের উপর হেলাইয়া রাখিয়া আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতে

লাগিল। সরল মনে বলিতে লাগিল, "হে হরি! আমার হিরণকে শীগ্‌গির আরোগ্যি কর, তোমার হরি-লুট দিব। হে মা গঙ্গা! আমার হিরণকে শীগ্‌গির আরাম কর, তোমায় ডাব চিনি দিব মা!" বুড়ী এইরূপে আরও কত ঠাকুর ঠাকুরাণীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মানসিক করিল।

হিরণ্ময়ী বলিলেন, "আজ অসুখ বড় বাড়িয়াছে, আমি কিছুই খাইব না। তুই মাকে এই কথা গিয়া বল্।"

নারাণের মা তাহাই বলিতে চলিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "খুব সাবধানে থাকিও—জল টল মেলা খাইও না। আমি নেয়ে টেয়ে আবার আসিব।"

*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*

ধীরেন্দ্রনাথ গত কল্যের সমস্ত কথা শুনিয়াছেন। তিনিও অত্যন্ত অস্থির হইয়াছেন। বাড়ীতে কোন মতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া প্রিয়মাধবের নিকট গিয়া বসিয়া আছেন। বাড়ী হইতে যাইবার সময় তাঁহার ভৃত্যকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমি আজ এখানে আহার করিব না, প্রিয়মাধবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে।" সুতরাং জগদীশপ্রসাদ বা জাহ্নবী দেবী আহারের সময় তাঁহার আর অনুসন্ধান লন নাই। ধীরেন্দ্রনাথ প্রিয়মাধবকে এই ঘটনার আদ্যোপান্ত বলিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা জানি না।

*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*

এ দিকে কিরণময়ীও, হিরণ্ময়ী সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কি বলিয়া কনিষ্ঠা ভগিনীর মনকে প্রবোধ দিবেন, তাহার কোন উপায় না পাইয়া, হতাশ হইয়াছেন। এই জন্ত তিনি হিরণ্ময়ীর কক্ষ হইতে প্রাতঃকালে বহির্গত হইয়া অবধি আর প্রবেশ করেন নাই।

যথা সময়ে সনাতন ধন্বন্তরি আসিয়া ঔষধ বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আজি পর্য্যন্ত যে কালে রোগের প্রকৃত লক্ষণ পরিস্ফুট হইল না, সেকালে আনুমানিক ঔষধ-বটিকায় বা চূর্ণকে কি ফললাভ? সনাতন ধন্বন্তরি বাহিরে না হউক মনে মনে হারি মানিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ণ উপনীত হইল। কিন্তু আশা-দগ্ধা হিরণ্ময়ীর আর যন্ত্রণার শেষ হইল না। তিনি গত দিবস হইতে অদ্য এতক্ষণ পর্য্যন্ত কতশত চিন্তা করিলেন—যন্ত্রণার কতশত সবিষ দংশন সহ্য করিলেন, তাহা কে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে? হিরণ্ময়ী অবশেষে কি ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। যথাস্থান হইতে মস্যাধার, লেখনী ও একখণ্ড কাগজ লইয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। ক্রমে ক্রমে পত্র লেখা শেষ হইল। পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিলেন।

অনন্তর হিরণ্ময়ী দ্বারোন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কেহই নাই। আস্তে আস্তে ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে গমন করিলেন। কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া শিরোবাহক উপাধান তুলিলেন, দেখিলেন, সেখানে ধীরেন্দ্রনাথের সিন্দুকের চাবি রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিলেন। সিন্দুকের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া যথাস্থানে চাবি রাখিলেন। অনন্তর গৃহের দ্বার খুলিয়া আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এখনও তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। পত্রখানির ভিতর কি লেখা হইল, তাহা জানি না।

দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। যে দাসী অন্তঃপুরস্থ গৃহে গৃহে দীপ জ্বালে, সে হিরণ্ময়ীর কক্ষে দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। হিরণ্ময়ী তাহা শয্যাতলে শুইয়া দেখিলেন। অনন্তর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। হিরণ্ময়ীর পিতা মাতা ও অন্যান্য পরিজনেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণেও কেহ কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী যেরূপ উত্তর দিয়া থাকেন, তাহাই দিতে থাকিলেন। হিরণ্ময়ীর কক্ষে কিরণময়ী এখনও অনুপস্থিতা।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। কিরণময়ী আসিলেন না। দুই প্রহর অতীত হইল, তথাপি কিরণময়ীর দেখা নাই। এতক্ষণে হিরণ্ময়ী বিশেষরূপে বুঝিলেন, বড় দিদি লজ্জায় পড়িয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন সদুপায় করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এইজন্য এখনও তাঁহাকে দেখা

দিলেন না। তিনি আরও বুঝিলেন যে, এত রাত্রি হইল, এখনও যেকালে বড় দিদি আসিলেন না, সেকালে আজ আর আসিবেন না। আপনার ঘরে শয়ন করিবেন। হিরণ্ময়ী মনে মনে এইরূপ ধারণা করিয়া একাকিনীই অনেকক্ষণ শুইয়া রহিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশার ফল-পরিণাম।

পাঠক মহাশয়! অদ্য রজনীতে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটিতে চলিল। এরূপ দুঃখের ঘটনা জগদীশপ্রসাদের আলয়ে পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সকলেই নিদ্রিত, কেবল চিরজাগরণ-ব্রতী হিরণ্ময়ীই নিদ্রার সুকোমলকোলশূন্যা। আরও বোধ হয়, স্ব স্ব কক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ ও কিরণময়ীও এখন পর্য্যন্ত নিদ্রিত হন নাই।

হিরণ্ময়ী গা তুলিয়া পর্য্যঙ্কের উপর বসিলেন। মস্তকের দিকের বাতায়ন খুলিয়া দেখিলেন, চন্দ্র অস্তগত হইয়াছেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার গৃহের বহির্ভাগের যে দক্ষিণ দিক নিশাকরের ধবল কৌমুদীজালে বিধৌত হইতে-ছিল, এক্ষণে তাহাই আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই দৃশ্যের সহিত হিরণ্ময়ীর ঠিক তুলনা হয়;—ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কিরণময়ীর বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্তর্জগৎ উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা গভীর অন্ধকারে স্তূপীভূত হইয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময়ীর অশ্রুসিক্ত নয়নযুগলের দৃষ্টিরেখা অন্ধকারের মধ্যে যতদূর প্রবেশ করিতে পারিল, তদ্দ্বারা তিনি দেখিলেন, যেন তমিস্রসাগরে সমস্ত পদার্থ ডুবিয়া গিয়াছে। অক্ষোমসীলিপ্ত বৃক্ষগুলি তাহাতে ভাসিতেছে। তমস-তরঙ্গসম্ভব ভীষণ ভঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে যেন গ্রাস করিতে আসি-তেছে। তিনি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একটা পেচক কর্কশ-চীৎকারে এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের উপর উড়িয়া বসিল। পেচক-কণ্ঠের সুকঠোর শব্দে হিরণ্ময়ীর চক্ষু দুইটি পুনর্ব্বার উন্মীলিত হইল। তিনি কি ভাবিয়া বাতায়নকপাট বন্ধ করিলেন। পর্য্যঙ্কের মধ্যস্থলে আসিয়া

উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।—অত্যন্ত গভীর ভাবনা—সর্ব্বনাশিনী ভাবনা!

কতক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া হিরণ্ময়ী পর্য্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া নিম্নে দাঁড়াইলেন। অদ্য শয়ন করিবার সময় সে গৃহের দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মনে ছিল না। তিনি কপাট বন্ধ আছে ভাবিয়া, অর্গল খুলিতে গেলেন, কিন্তু কপাট নিরর্গল। কপাট কেবল ভেজান ছিল। তিনি আস্তে আস্তে খুলিলেন, তথাপি কিঞ্চিৎ শব্দ হইল। হিরণ্ময়ী কপাট খুলিয়া ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া এ দিক ও দিক দেখিলেন, কেহই নাই। আবার গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। পাঠক! এ ভাবনা সেই ভাবনা—অত্যন্ত গভীর ভাবনা—সর্ব্বনাশিনী ভাবনা!

এইবার হিরণ্ময়ী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বড় দিদি! তুমি আমাকে যে প্রাণের সহিত ভালবাস, তাহা তোমার কার্য্যের প্রত্যেক সূত্রপাতে আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি আমার জন্য কি না করিয়াছ আর কি নাই করিতেছ? কিন্তু আমার প্রতি বিধাতা সর্ব্বতোভাবে বিমুখ। আমি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, নিয়তির ইচ্ছা এবং গতি অবশ্যম্ভাবিনী। উহাকে লঙ্ঘন করিয়া এক নিমেষের জন্যও চলিতে পারে, এমন লোক আজিও পরমাণুতে উৎপন্ন হয় নাই। তবে, বড় দিদি! তুমিই বা কি করিবে, আমিই বা কি করিব আর পিতাই বা কি করিবেন? নিয়তির ইচ্ছা ও গতি অলঙ্ঘনীয় বলিয়াই এই গভীর অন্ধকারময়ী তামসীতে আমি একটি অসমসাহসিক কার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। বড় দিদি! প্রাণের বড় দিদি! আর তোমাকে দেখিতে পাইব না—জন্মের মত আজ তোমাকে প্রাতঃকালে এই গৃহ হইতে যাইবার সময় দেখিয়াছি। বড় দিদি! আজ তোমার স্নেহের অভাগিনী নিরাশার প্রতিমূর্ত্তি হিরণ্ময়ী উদ্দেশে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে!" এই বলিয়া পুনঃপুনঃ অশ্রুবর্ষণ ও অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। আবার বলিলেন, "না, কেন আমি বড় দিদির কাছে বিদায় চাহিতেছি? কেন তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিব?—না,—তা' করিব না। বড় দিদি! ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার বিবাহ হউক। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিতে যেরূপ উৎসুক, তুমিও ত তাহাই। তবে

কেন আমি এত উদ্বিগ্ন ও হতাশ হইতেছি?—তুমি বড়; তোমারই সহিত ধীরেনের শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা হইবে, ইহা ত অন্যায় নহে। পিতার মনস্কামনা পরিপূর্ণ হউক। আমি ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে তোমার হস্ত এক হইতে দেখিয়া সুখিনী হইব।" এই কথাগুলি মনে মনে বলিয়া হিরণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

আবার তাঁহার ভাববিপর্য্যয় ঘটিল। মানুষের মন কখন যে কিরূপ হয়, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করা মানুষের কর্ম্ম নহে। মানব-চিত্ত পলকে পলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে—এক পলকে হাসে অপর পলকে কাঁদে—এক পলকে জলের অপেক্ষাও গলিয়া যায়, অপর পলকে লৌহের অপেক্ষাও কঠিন হয়—এক পলকে বাঁচে, অপর পলকে মরে। দুঃখিনী হিরণ্ময়ীর চিত্ত ইহার একটি অন্যতম প্রকৃত সাক্ষী। হিরণ্ময়ী এই কিছু পূর্ব্বে উদ্দেশে কিরণ-ময়ীর নিকট বিদায় চাহিতেছিলেন, আবার পরক্ষণেই সে আশা বিসর্জ্জন দিলেন—পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ভাব ধারণ করিলেন। তিনি যেন এক্ষণে একবারে আশার সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরাশার চিরান্ধ-কারাময় গভীর হইতেও গভীরতর গর্ত্তে উলট পালট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। অতিশয় অস্থির হইয়া অবলম্বনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিরা-শার সঙ্কটময় গর্ত্ত অবলম্বনশূন্য! হিরণ্ময়ী যেন আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন! আর গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিলেন না—বাহিরে নির্গত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না—একাকিনী চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

তাই ত, হিরণ্ময়ী কোথায় যান? পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা সঙ্গী বা সঙ্গিনীশূন্যা হইয়া একাকিনী কোথায় যান?—অন্ধকার দেখিয়া, পেচকের চীৎকার শুনিয়া এই কতক্ষণ পূর্ব্বে যে হিরণ্ময়ী আতঙ্কে বাতায়ন-দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হিরণ্ময়ী এক্ষণে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া কোথায় যান? হিরণ্ময়ীর রমণী-সুলভ অন্তঃকরণে এমন কি দুর্দ্ধর্ষ ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যাহার চালনায় বা তাড়নায় তিনি ভয় ভুলিয়া নির্ভয়ে বাহির হইয়া পড়িলেন?—কিছুই বুঝি না, তবে কি করিয়া অন্যকে বুঝাইব? যাহার আশা ভরসা ঘুচিয়া গিয়াছে, যাহার পক্ষে প্রাণধারণ অত্যন্ত কষ্টকর, যাহার শরীরে তীক্ষ্ণমুখ কণ্টকজাল

মুহুর্মুহু বিদ্ধ হইতেছে এবং মনের ভিতর জলন্ত হুতাশন-শিখা হুঙ্কার ছাড়িতেছে, তাহার আবার জড় প্রকৃতিকে কিসের ভয়? তাহার জর্জ্জরিত অন্তঃপ্রকৃতির উপর জড় প্রকৃতি কি আর বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে? এই জন্যই বুঝি হিরণ্ময়ী একাকিনী বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

হিরণ্ময়ী বরাবর চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে উপর তল হইতে নিম্ন তলে আসিবার সোপানের নিকট আসিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকার প্রজ্জ্বলিত দীপ নিবিয়া গিয়াছিল। তিনি অন্ধকারে দেওয়ালে হাত দিয়া আস্তে আস্তে একটি একটি করিয়া সোপান অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নীচে নামিলেন। অনন্তর, যে উদ্যানে তিনি ধীরেন্দ্রনাথের চক্ষু টিপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য পুষ্পমালা গাঁথিয়াছিলেন, এবং তাঁহার হস্তে ধরা পড়িয়াছিলেন, সেই উদ্যানের দিকে যাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুর হইতে উদ্যানে প্রবেশ করিবার দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানকার দেওয়ালে উদ্যানের খিড়কী দরজার চাবি টাঙ্গান থাকিত, হিরণ্ময়ী জানিতেন। তিনি সেই চাবি লইয়া উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটি পথ ধরিয়া বরাবর উত্তর দিকে যাইতে লাগিলেন। উদ্যানের বৃক্ষগুলি মসীমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল খদ্যোতনিচয় তাহাদের পত্রাবৃত শাখা প্রশাখার অভ্যন্তরে স্ব স্ব স্বভাব-দীপ প্রজ্জ্বালন করিয়া এ দিকে ও দিকে সঞ্চরণ করিতেছে। মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণে বৃক্ষের পত্রগুলি আপন মনে দুলিতেছে—মধ্যে মধ্যে এক একটি শুষ্কপত্র খসিয়া পড়িতেছে। পতনকালে এক প্রকার মধুর অস্ফুট মর্ম্মর শব্দ হইতেছে। শাখাশিখায় রজনীগন্ধা হৃদয় খুলিয়া সৌরভ বিতরণ করিতেছে। শীতল সমীর সেই মনোহর সৌরভ লুণ্ঠন করিয়া আপনার বাসস্থান শূন্যাকাশে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। বৃক্ষ লতার পত্র পুষ্পগুলি শিশিরসিক্ত হইয়া যেন পুনর্জীবিত হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী ক্রমে ক্রমে উত্তর দিকের প্রাচীর মধ্যস্থ অবান্তর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। অন্য দিন হইলে তিনি কত পুষ্প তুলিতেন, আজ আর তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। তাঁহার পক্ষে উদ্যানের সমস্ত ভাল ভাল পদার্থগুলিই আজ যেন অপকৃষ্ট বোধ হইল।

হিরণ্ময়ী চাবি দিয়া খিড়্কী দরজার তালা খুলিলেন। উদ্যানের বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে বহির্ভাগের কড়ায় তালা লাগাইয়া আবার চাবি দিলেন। চাবি সঙ্গে রাখিলেন। কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া এ দিক ও দিক দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ সেখানে থাকিলেন না এইবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা ! তুমি নিদ্রিত আছ ; বাবা ! তুমি নিদ্রিত আছ। তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হইল না। আমি উদ্দেশে তোমাদের চরণে প্রণাম করিয়া আজ জন্মের মত বিদায় লইলাম। আর ইহজন্মে দেখা হইবে না। আমি সর্ব্বসন্তাপহারিণী ভাগীরথীর শীতল গর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে শীতল করিতে চলিলাম। ধীরেন্! এ জন্মে ত আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারিলাম না, কিন্তু পরজন্মে যেন হইতে পারি,এই আমার মনস্কামনা। আমি বিবাহের জন্য উন্মত্ত হইয়াছি—আত্ম-হত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, লোকে ইহা জানিতে পারিলে, না জানি কতই পরিহাস ও নিন্দা করিবে। করুক্ ; আমি তাহাতে ডরাই না। যে আমাকে বিয়ে-পাগ্লী বলিয়া গালি দিবে, সে মূর্খ—সে মনুষ্য নহে। যে যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, সে যদি তাহাকে না পায়, তবে তাহার ছার শরীরে ছার প্রাণ ধারণ করিয়া লাভ কি ?—কিছু না। বরং তাহার মৃত্যুই পরম লাভ। এমন অবস্থায় সর্ব্ব যন্ত্রণা উপসমকারী মরণই শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আর জীবনই অপকৃষ্টতম শত্রু। সুতরাং আমি ভাগীরথী-গর্ভে ডুবিয়া মরিব।" এই বলিয়া নিরাশ প্রণয়ের অশ্রুমুখী প্রতিমূর্ত্তি গঙ্গাজলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে চলিলেন। পেচক ডাকিল, হিরণ্ময়ীর ভয় হইল না—শৃগাল কুকুর দৌড়া-দৌড়ি করিতে লাগিল, ভয় হইল না—অন্ধকারে দূরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় নানা-রূপ কল্পিত মূর্ত্তির অপছায়া দেখা যাইতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীর ভয় হইল না। যে মরিতে যাইতেছে, তাহার আবার কিসের ভয় ? যে আর কিছু সময় পরে পঞ্চদশ বর্ষের সুবর্ণ শরীর ও প্রিয়তম প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহার আবার মরণের ভয় কি ?

হিরণ্ময়ী একটি পথ ধরিয়া বরাবর যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে জন্ম-ভূমি মধুপুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শূন্য গৃহে।

কাহার পক্ষে সুপ্রভাত আবার কাহারও পক্ষে কুপ্রভাত হইয়া রাত্রি প্রভাত হইল। দিবাকর প্রত্যহ যেরূপে উদয় হইয়া থাকেন, সেইরূপে ধীরে ধীরে নীলাকাশে উঠিতে লাগিলেন। পক্ষীরা যেরূপ করিয়া থাকে, তাহাই করিতে লাগিল। নিদ্রিত মানবগণ স্ব স্ব ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদের প্রাসাদস্থ সকলেই ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইয়া স্ব স্ব শয্যা ছাড়িতে লাগিল। বহির্দ্বারে দুই জন প্রহরী রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বদলি হইয়া জাগিয়া বসিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিল। কিন্তু যে দুই জন প্রহরী রাত্রির মধ্য প্রহরে প্রহরা দিয়াছিল, তাহারা এখনও খাটিয়ার মায়া ছাড়িতে পারিল না—প্রভাতের শীতল সমীরণে পাশ ফিরিয়া সুখে ঘুমাইতে লাগিল।

জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবীদেবী, কিরণময়ী, ধীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। জাহ্নবী দেবী হিরণ্ময়ীর কক্ষে হিরণ্মীকে দেখিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে করিলেন মুখ হাত ধুইতে গিয়াছেন। ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার আসিবার ইচ্ছা রহিল।

যথা সময়ে সনাতন ধন্বন্তরি ঔষধের বাক্স লইয়া হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিলেন। জগদীশপ্রসাদ, জাহ্নবী দেবী, কিরণময়ী ও একজন দাসী তাঁহার সহিত হিরণ্ময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য। জগদীশপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ দাসীকে হিরণ্ময়ীকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সে আদেশ পাইয়া প্রস্থান করিল। সে সময়ে যেখানে যেখানে হিরণ্ময়ীর থাকিবার সম্ভাবনা, সে সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান করিল কিন্তু দেখিতে পাইল না। তৎক্ষণাৎ সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জগদীশপ্রসাদকে উহা জানাইল।

দাসীমুখে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান না পাইয়া জগদীশপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া আপনা আপনি বলিলেন, "দেখ দেখি, ধন্বন্তরি মহাশয় আসিয়া বসিয়া রহিলেন, এমন সময়ে হিরণ্ গেল কোথা ? এমন দুরন্ত আর অবাধ্য মেয়েও ত কোথাও দেখি নাই।"

পিতার এই কথা শুনিয়া কিরণময়ী বলিলেন, "বাবা! আমি একবার খুঁজিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে ধীরেন্দ্রনাথের গৃহে চলিয়া গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে বসিয়াছিলেন। তিনি কিরণময়ীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনে মনে কি বলিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু মুখে যেরূপ সহাসবচনাবলি বলিয়া থাকেন, তাহাই বলিলেন। কিরণময়ী হিরণ্ময়ীকে দেখিতে না পাইয়া ধীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিরণ্ কি তোমার কাছে আজ আসিয়াছিল ? সে এখন কোথায়, বলিতে পার ?"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই আমার নিকট হিরণ্ময়ী আজ আসেন নাই। তিনি যে এখন কোথায় আছেন, তাহাও বলিতে পারি না। তাঁহার গৃহে নাই ?"

কিরণ।—"না।"

ধীরেন্দ্র।—"কেন তাহার অনুসন্ধান করিতেছ ?"

কিরণ।—"ধন্বন্তরি মহাশয় আসিয়া বসিয়া আছেন। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে; তাই অনুসন্ধান করিতেছি।"

ধীরেন্দ্র।—"এ সময়ে যে যে স্থানে তিনি থাকেন, সে সকল স্থান দেখিয়াছ ?"

কিরণ।—"আমি দেখি নাই বটে, কিন্তু দাসী দেখিয়া আসিয়াছে, দেখা পায় নাই।"

ধীরেন্দ্র।—"তুমিও একবার নিজে খুঁজিয়া দেখ।"

কিরণ।—"তাই দেখি।" এই বলিয়া কিরণময়ী আবার বলিলেন, "ধীরেন্! তুমি এত কাহিল হইয়া যাইতেছ কেন ?"

ধীরেন্দ্র।—"আজ কয় দিন ধরিয়া বড় অসুখ হইয়াছে। কিছু ভাল লাগে না, আহারাদি করিতে পারি না, তাই এমন হইয়াছি।"

কিরণ।—"কি অসুখ হইয়াছে ?"

ধীরেন্দ্র।—"তা' ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।"

এইবার কিরণময়ী একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "ধীরেন্! তুমি নিজে তোমার অসুখের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছ না, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি অসুখ হইয়াছে বল দেখি ?"

কিরণময়ী আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "যদি রাগ না কর, তবে বলি।"

ধীরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ভাবিত হইলেন, বলিলেন, "কেন রাগ করিব, কিরণ ? হিত কথা বলিলে কে কোথায় রাগ করে ?"

কিরণময়ী বলিলেন, "হিরণের যে অসুখ, তোমারও তাই।"

এই কথা শুনিয়া ধীরেন্দ্রনাথ কি ভাবিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হিরণের কি অসুখ ?"

কিরণময়ী বলিলেন, "তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হওয়া, আর তোমারও তাহাকে না পাওয়াই অসুখ।—কেমন কি না ?"

ধীরেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইলেন—বিরক্তও হইলেন। বলিলেন, "কিরণ! তুমি আমাকে ওরূপ বলিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত করিও না।"

কিরণময়ী দেখিলেন ধীরেন্দ্রনাথ চটিয়াছেন, এই জন্য আর এমন কিছু বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "তুমি রাগ করিও না। আমি তোমাকে আরও অনেক কথা বলিব। সে সকল কথা তোমার প্রতিকূল নহে— অনুকূল। আমি তোমার শত্রু নহি। তুমি কিছুই ভাবিও না। এখন যাই, আর এক সময়ে আসিব। এখন হিরণ্ময়ী কোথায় আছে, ধরিয়া লইয়া যাই।"

চিন্তিত ধীরেন্দ্রনাথ কিছুই উত্তর করিলেন না। মনে মনে শঙ্কিত হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার উচ্ছিন্নপ্রায় অন্তর্জগতে আবার সহসা ভয়ঙ্করী ঝটিকা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবনার উপর ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইলেন না।

এ দিকে কিরণময়ী ধীরেন্দ্রনাথের কক্ষ হইতে বাড়ীময় খুঁজিয়াও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইলেন না। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। জগ-

দীশপ্রসাদ কিরণময়ীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কই, কিরণ! হিরণ কই?"

কিরণময়ী বলিলেন, "এত করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কোন স্থানই বাকী রাখি নাই, কিন্তু কোথাও পাইলাম না।"

এইবার জগদীশপ্রসাদ ও জাহ্নবীদেবী চিন্তিত হইলেন। ধন্বন্তরি মহাশয়কে বসাইয়া রাখিয়া আপনারা অন্য অন্য দাস দাসীদিগকে লইয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হইতে পারে, তাহার অণুমাত্রও শৈথিল্য হইল না, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। অনন্তর কতকগুলি লোক নন্দনকাননে, কতকগুলি ঠাকুরবাড়ীতে আর অবশিষ্ট অনেকগুলি লোক মধুপুরের প্রত্যেক বাটীতে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তথাপি হিরণ্ময়ীকে পাওয়া গেল না। যে লোকগুলি অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিল, তাহারও দুঃখিতচিত্তে ফিরিয়া আসিল।

জগদীশপ্রসাদ জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী এই বার অত্যন্ত অস্থির হইলেন। হিরণ কোথা—হিরণের কি হইল, এই কথা বাড়ীর প্রত্যেক লোকের মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইল। কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিল।

জাহ্নবীদেবী ও কিরণময়ী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। বাড়ীতে ক্রমে ক্রমে রোদনের শব্দ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। জাহ্নবী দেবী জগদীশপ্রসাদের পায়ের উপর পড়িয়া "কই আমার হিরণ কই? ওগো, হিরণ কোথা গেল! হিরণের কি হইল!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। সনাতন ধন্বন্তরি জাহ্নবীদেবীকে কত আশ্বাস দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন মানিল না। জাহ্নবীর শোকবিলাপ দেখিয়া গৃহ শুদ্ধ লোকে অস্থির হইয়া উঠিল। কিরণময়ীর মুখমণ্ডল নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। তিনি সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ এই রোদনশব্দে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাড়াতাড়ি

জগদীশপ্রসাদের নিকট আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ীর কক্ষ বিলাপস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

আবার জগদীশপ্রসাদ মধুপুরের প্রত্যেক বাগান ও পুষ্করিণীতে অনুসন্ধান করিতে অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে আবার অনুসন্ধান করিতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে জাহ্নবীদেবী ও ধীরেন্দ্রনাথ চলিলেন। কিরণময়ী আপনার কক্ষে থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে একপ্রকার বুঝিলেন যে, ধীরেন্দ্রনাথের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইল না বলিয়া তিনি বাটী ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, কি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা পিতা মাতার নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। আপনা আপনিই স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগদীশপ্রসাদ যখন উদ্যানের মধ্যে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে যান, তখন আর কএক জন ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। জগদীশপ্রসাদ উদ্যানের এ দিক ও দিক করিয়া চারি দিক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ীকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি যখন উত্তর দিকের প্রাচীরের দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, সেই সময় খিড়কী দরজায় তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি দেখিলেন, দরজায় তালা লাগান নাই—খোলা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কপাট টানিলেন, কিন্তু কপাট খুলিল না। জগদীশপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন। মালীকে ডাকাইলেন। মালী দৌড়িয়া আসিল।

এমন সময়ে ধীরেন্দ্রনাথও তথায় উপস্থিত হইলেন। বিমর্ষ ধীরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি আরও বিমর্ষ হইয়াছে। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থার তুলনা হয় না। তিনি মনে মনে যে কত কি ভাবিতেছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

জগদীশপ্রসাদ মালীকে বলিলেন, "খিড়কী দরজার তালা কি হইল? তুই কি তালা বন্ধ করিস নাই?"

মালী ভীত হইল। সবিনয়ে যোড়হস্তে বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়! আমি তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম। প্রত্যহই তালা লাগান থাকে। কালও সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই দরজায় তালা লাগান ছিল।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "তবে কি হইল?"

মালী পূর্ব্বের ন্যায় বলিল, "আজ্ঞে, যেখানে চাবি থাকে, সেখানে আছে কি না, দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া দৌড়িয়া লক্ষ্য স্থানে আসিল। দেখিল, চাবি নাই। অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইল। আবার দৌড়িয়া জগদীশ-প্রসাদের নিকট গেল। বলিল, "যেখানে চাবি রাখি, সেখানে নাই। বোধ করি, কাল রাত্রিতে কেহ সেই চাবি আনিয়া তালা খুলিয়া লইয়াছে।"

জগদীশপ্রসাদ মালীকে বলিলেন, "প্রাচীরের উপর উঠিয়া দেখ্ দেখি, ও দিকে কি হইয়াছে। কপাট খুলিতেছে না কেন, দেখ্ দেখি।"

মালী প্রাচীরসংলগ্ন একটা বড় জামরুল গাছ বাহিয়া প্রাচীরে উঠিল। জামরুল বৃক্ষের শাখা ধরিয়া মুখ নত করিয়া দেখিয়া বলিল, "ভিতরের তালাটা বাহিরে লাগান আছে।"

জগদীশপ্রসাদ বলিলেন, "ও দিকে লাফাইয়া পড়িতে পারিবি?"

মালী অন্য সময়ে অক্ষম হইলেও এক্ষণে বলিল, "আজ্ঞে পারিব।"

"তবে ও দিকে গিয়া দেখ্ দেখি, তালাটা বন্ধ কি আটকান আছে।" জগদীশপ্রসাদ এই কথা বলিলেন।

মালী প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লম্ফনের লক্ষ্য স্থান ঠিক করিয়া ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। ধপাস্ করিয়া শব্দ হইল। ঘাসের উপর পড়িয়াও তাহার দক্ষিণ পদে আঘাত লাগিল। কিন্তু তাহার সে ব্যথার ব্যথী কে? সে আপনিই আঘাতিত স্থানে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কপাটের নিকট গিয়া তালা টানিল—সবলে টানিল, কিন্তু তালা খুলিল না। তখন সে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে জগদীশপ্রসাদকে শুনাইয়া বলিল, "কর্ত্তা মশায়! তালায় চাবি দেওয়া আছে। কোনমতে খুলিল না।"

এই কথা শুনিয়া জগদীশপ্রসাদ, ধীরেন্দ্রনাথ এবং আর কএক জন পুরুষ মানুষ উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে গেলেন। অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইল, সুতরাং লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল। যাহা হউক, তাঁহারা সেখানে গিয়া দেখিলেন, বাস্তবিক তালায় চাবি লাগান আছে। সকলে মিলিয়া রকমওয়ারি করিয়া টানাটানি করিলেন; কিন্তু তালা খুব মজবুৎ—খুলিল না। অনন্তর সকলে মিলিয়া সেই খানে চাবি খুঁজিতে লাগিলেন।

খিড়কী দরজার সম্মুখ হইতে একটি সরু রাস্তা বরাবর চলিয়া গিয়া ও দিকে একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত রাস্তায় মিলিত ছিল। কএক জন লোক সেই খিড়কীর রাস্তার এ দিক ও দিক করিয়া খোয়া হাঁটকাইতে লাগিল, চাবি মিলিল না। কএক জন লোক সেই রাস্তার দুই দিকের ঝোড় ঝাড় ও ঘাস হাঁটকাইতে লাগিল,—তথাপি চাবি মিলিল না। মালী বিশেষরূপে দেখিবার জন্য মড়মড় করিয়া অনেকগুলা ঘেঁটু এবং আস্‌সেওড়ার গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কতকগুলাকে উৎপাটন করিয়া অন্যগুলার ঘাড়ে ফেলিয়া দিল। অনেক খুঁজিল, চাবি দেখা দিল না। তাহার অধীনস্থ মালীরাও খুঁজিতে খুঁজিতে হাল্লাক হইয়া গেল, তথাপি চাবি দেখা দিল না। জগদীশ-প্রসাদ ও ধীরেন্দ্রনাথও অনেক অনুসন্ধান করিলেন, সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল। অনুসন্ধানের সময় কএক জনের হাতে পায়ে কাঁটা ফুটিল—রক্তও পড়িল, কিন্তু পরিশ্রম বৃথা হইল।

জগদীশপ্রসাদ আবার মালীকে বলিলেন, "যেখানে চাবি রাখিতিস্, হিরণ্ময়ী কি তাহা জানিত ?"

মালী।—"আজ্ঞে, জানিতেন। তিনি এক এক দিন সেই স্থান হইতে চাবি লইয়া ফুঁ দিয়া বাজাইতেন। আবার রাখিয়া দিতেন।"

জগদীশপ্রসাদ এই বার অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন, ভাবিয়া ধীরেন্দ্র-নাথকে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বলিলেন, "ধীরেন্দ্র! আর কোন সন্দেহ নাই; হিরণ্ময়ীই মধ্যরাত্রিতে বা শেষ রাত্রিতে এই অবান্তর দ্বার দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই আবার ভিতরের তালা বাহিরে লাগাইয়া দিয়াছে। হয় চাবি তার সঙ্গে আছে, নয় ত কোথাও ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখন আর এখানে বৃথা গোলযোগ করিয়া কোন ফলোদয় নাই। চল, বাড়ীর মধ্যে গিয়া শীঘ্র তাহার অনুসন্ধানের জন্য চারি দিকে লোক পাঠান যাউক। তুমি এক দিকে যাও, আমিও এক দিকে যাই। আর বিলম্ব করা উচিত নয়।" এই বলিয়া তিনি আবার বলিলেন, "হিরণ্ময়ী কেন এমন করিল! সে কোথায় গেল! তাহাকে কি আর পাইব! হা জগদীশ্বর!" এই কএকটি কথায় জগদীশপ্রসাদের বক্ষঃস্থল যেন শতধা ফাটিয়া গেল। মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিমর্ষ হইল।

ধীরেন্দ্রনাথ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনিও যা'র পর নাই অস্থির হইয়াছেন।

অনন্তর সকলে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

জগদীশপ্রসাদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কর্ম্মচারীকে নিকটে ডাকাইলেন। সকলে উপস্থিত হইল। সকলেই বিষণ্ণ। অনন্তর জগদীশ-প্রসাদ সেই সকল কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে শ্রমশীল, চতুর, অনুসন্ধানে তৎপর লোকদিগকে নানা স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পাঠাইবার সময় কহিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি হিরণ্ময়ীকে আনিতে বা তাহার প্রকৃত সন্ধানের কথা বলিতে পারিবে, তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবেন। আদিষ্ট লোকেরা অনুসন্ধান করিতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর তিনি ঘোষযন্ত্রবাদকের দ্বারা ঐরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঘোষযন্ত্রবাদক ঘোষযন্ত্রে আঘাত করিতে করিতে মধুপুরের প্রত্যেক পল্লীতে ঘুরিতে লাগিল। যাহারা ঘোষযন্ত্রবাদকের মর্ম্ম বুঝিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্থলোভে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। কেহ কেহ কেবল দুঃখিত হইল। অল্পবয়স্ক বালকেরা ঘোষযন্ত্রবাদকে দেখিয়া মনে করিল, সে বুঝি পাঁচ হাজার টাকা লইয়া বাঁশবাজী করিবে।

দেখিতে দেখিতে মধুপুরের প্রত্যেক নর নারীর মুখে হিরণ্ময়ী-হারানর কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। যাহার যেরূপ যুক্তিশক্তি, সে সেইরূপ করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। হাটে, বাজারে, দোকানে জিনিষ পত্রের ক্রয় বিক্রয়ের সহিত এই বিষয়েরও ক্রয় বিক্রয় হইতে লাগিল। সম্মার্জ্জনী-মার্জ্জিত বটবৃক্ষতলে পুরাতন এবং অৰ্দ্ধচ্ছিন্ন সপের উপর বসিয়া বৃদ্ধেরা এই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। নবযুবতীরা

পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে গিয়া, কেহ শূন্য কলসী, কেহ পূর্ণ কলসী নামাইয়া এবং কেহ বা কক্ষে ধারণ করিয়া ঈষৎ বঙ্কিমভাবে এই কথায় নানা কথার যোগ দিতে লাগিল। কৃষক এবং রাখালেরা মাঠে গিয়া এই কথার তোলাপাড়া করিতে লাগিল। যাহার মনে যাহা আসিল, সে তাহাই লইয়া এই ব্যাপারে লিপ্ত হইল। কাজেই আমাদিগকেও এই সময় বলিতে হইল,—"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

জগদীশপ্রসাদ নানাস্থানে নানা জনকে পাঠাইয়া, ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলেন "দেখ, বাপু! সহসা আমি যে সঙ্কটে পড়িয়াছি, এরূপ বোধ হয়, কাহাকেই পড়িতে হয় না। এখন তোমাকেও একটি কার্য্য করিতে হইবে। তুমিও একদিকে অনুসন্ধান করিতে প্রস্থান কর। পাথেয় লইয়া যাও।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে কতগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করিবার পন্থা নাই।—তিনি জগদীশপ্রসাদের নিকট হইতে পাথেয় লইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতে অণুপরিমাণেও ত্রুটি করিব না। সঙ্কটমোচন পরমেশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন তাঁহার প্রসাদে আমি আপনার হিরণ্ময়ীকে আনিতে পারি। আমি আর বেশী বিলম্ব করিব না। তবে এক্ষণে আসি, মহাশয়!" ধীরেন্দ্রনাথ এই বলিয়া জগদীশপ্রসাদকে প্রণাম করিলেন।

"মঙ্গল হউক" বলিয়া জগদীশপ্রসাদ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ আপনার কক্ষে গমন করিলেন। দূরপ্রস্থানের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন।—জগদীশপ্রসাদ যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, ধীরেন্দ্রনাথ তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি লইতে ইচ্ছা করিলেন। বিদেশে, বিশেষতঃ এরূপ বিপদে পড়িয়া বিদেশে যাইতে হইলে সঙ্গে বেশী টাকা কড়ি থাকা চাই। কিন্তু তিনি জগদীশপ্রসাদের নিকট তাহা চাহেন নাই। জগদীশপ্রসাদ যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইতে পারিত, তথাপি ধীরেন্দ্রনাথ আপনার সিন্দুক হইতে আরও কতকগুলি বাহির করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। যথাস্থান হইতে চাবি লইলেন,—সিন্দুক খুলিলেন, ডালা তুলিলেন, দেখিলেন,—একখানি পত্র রহিয়াছে। কৌতূহল বৃদ্ধি

হইল। তাড়াতাড়ি পত্রখানি বাহির করিয়া লইলেন। দেখিলেন, পত্রখানি তাঁহারই নামে লিখিত। বিস্মিত হইলেন। কে তাঁহার সিন্দুকের মধ্যে পত্র রাখিল, কে তাঁহার সিন্দুক খুলিল, প্রথমে এই ভাবনায় কতকটা চঞ্চলচিত্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে সে বিষয় পরিহার করিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। আবার পঠিত পত্র পড়িতে লাগিলেন,—

"প্রাণাধিক প্রিয়তম!

এই হতভাগিনী হিরণ্ময়ী তোমাকে পাইল না। ইহার আশা, ভরসা, আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই তুমি, কিন্তু, সে সমস্তই ফুরাইল! প্রাণেশ্বর! তবে বল দেখি, আমি কি করিয়া জীবিত থাকিতে পারি? অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।—বর্ষার নদী-প্রবাহ-উচ্ছ্বাসের ন্যায় আমার অনন্ত যন্ত্রণা প্রতিপলে বাড়িয়া উঠিতেছে,—আমার আর নিস্তার নাই। আমি কোনমতে আর এখানে থাকিতে পারিলাম না। চলিলাম—চিরকালের জন্য চলিলাম—চিত্তচাঞ্চল্য ও দারুণ যন্ত্রণার উপশম করিবার জন্য ভাগীরথী-গর্ভে এই হতাশ প্রাণ ও দগ্ধ শরীর বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম! প্রাণনাথ! যদিও পিতা মাতা তোমার সহিত আমাকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু আমি তোমাকে বহুদিন পূর্ব্বে মনে মনে বরণ করিয়াছি। তুমিই আমার স্বামী—তুমি ব্যতীত আমার আর পতি নাই। এই জন্যই আমি প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। প্রাণত্যাগ ব্যতীত এক্ষণে আমার আর কিছুই নাই। নাথ! আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধিনী, এক্ষণে আমার প্রতি দয়া করিয়া সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া যাও—ক্ষমা কর। তুমি যে আমার জন্য দুঃখিত হইয়াছ, তাহা জানি;—বড় দিদিও যে আমার নিমিত্ত অনেক করিয়াছেন, তাহাও অবিদিত নহি। কিন্তু আমার ভাগ্যলিপির মর্ম্ম জানি না। কিন্তু না জানিয়াও, এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি। কি?—ভাগীরথী-গর্ভে দুর্ভাগিনী হিরণ্ময়ীর মৃত্যু। হৃদয়েশ্বর! আমার শপথ, তুমি আমার জন্য আর দুঃখ করিও না;—বড় দিদিকে বিবাহ করিও।

তোমারই হতভাগিনী কিঙ্করী

হিরণ্ময়ী।"

ধীরেন্দ্রনাথ উপর্য্যুপরি এই পত্রখানি দুই বার পড়িয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। একবার ভাবিলেন, জগদীশপ্রসাদকে এ বিষয় জানাইবেন। আবার ভাবিলেন, না, যে ভাবে পত্রখানি লিখিত হইয়াছে, ইহা কোন মতেই তাঁহাকে দেখান যাইতে পারে না। এক পত্রে প্রণয় ও মৃত্যুর কথা, সুতরাং এ পত্র এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহারই পাঠ করা উচিত নহে। ধীরেন্দ্রনাথ কিরণময়ীকেও ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বলিলেন না। আর বেশীক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি ও পত্রখানি সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের সময় জগদীশপ্রসাদ কএক জন লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ লইলেন না। বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যে কএক জন লোককে আমার সঙ্গে দিবেন বলিতেছেন, বরং তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যেক দিকে পাঠাইয়া দিন্‌। এক্ষণে এরূপ করিয়াই অনুসন্ধান করা উচিত।"

জগদীশপ্রসাদ তাহাই স্বীকার করিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর, জগদীশপ্রসাদ কএক জন লোক লইয়া আর এক দিকে প্রস্থান করিলেন। পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে বাড়ী প্রায় খালি হইয়া গেল।

জাহ্নবী দেবী, কিরণময়ী ও অন্যান্য পরিজনেরা হিরণ্ময়ীকে হারাইয়া কিরূপ অধীর হইয়া শোক পরিতাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ।

কিরণময়ীর সহিত ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ-ঘটনা যে, এক্ষণে স্থগিত রহিল, তাহা পাঠক মহাশয়কে বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় দিন গত হইল, তথাপি কেহই আসিলেন না। কে যে কোথায় গিয়া কিরূপে হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা কেমন করিয়া জানিব। এ পর্য্যন্ত জগদীশপ্রসাদ বা ধীরেন্দ্রনাথেরও দেখা নাই।

এ দিকে কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর জন্য এতদূর উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্ণ হইলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া অশোকেরও শোকোদয় হয়। তাঁহার আর সে কান্তি নাই, সে মূর্ত্তি নাই, সে প্রাণ নাই এবং সে মন নাই। ফল কথা সুখের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই নাই। তিনি একণে বর্ষার মেঘের ন্যায়, অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায়, প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর যন্ত্রণার ন্যায় হইলেন। আহার নিদ্রার সঙ্গে তাঁহার আর সম্পর্ক রহিল না। তিনি সর্ব্বদাই হতাশের ন্যায় আক্ষেপ করেন, উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করেন। কএক দিন ধরিয়া এইরূপ আক্ষেপ ও রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। হিরণ্ময়ীকে না দেখিয়া তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিল না।— হিরণ্ময়ীর প্রস্থানের সপ্তম দিনে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া, রাত্রিকালে কোথায় চলিয়া গেলেন। এরূপ ভাবে চলিয়া গেলেন যে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। একে এই বিপদ, তাহার উপর আবার কিরণময়ীর বাটীপরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান, ইহা যে কি পর্য্যন্ত শোচনীয় ও বিষম ঘটনা, তাহা পাঠক মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। কিরণময়ী কি অভিপ্রায়ে যে, কাহাকে কিছু না বলিয়া সকলের অলক্ষ্যে চলিয়া গেলেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম এখনও বুঝিতে পারিলাম না। তিনি তাঁহার প্রাণাধিকা কনিষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ীকে যার পর নাই ভালবাসিতেন বলিয়াই কি ভগিনী-বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে গেলেন?—হিরণ্ময়ীর যে গতি, তাঁহারও কি তাহাই ঘটিল? হইতে পারে;—ঈশ্বর জানেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সকলে গাত্রোত্থান করিল। প্রাণোপমা কনিষ্ঠা কন্যা-বিরহি যন্ত্রণাময়ী শোকমূর্ত্তি জাহ্নবী দেবীও গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি রাত্রিকালে নিদ্রা যান নাই, কেবল শয্যার এ-পাশ ও-পাশ করিয়া সময় কাটাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবতী জাহ্নবীর দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। এ জাহ্নবী যেন আর সে জাহ্নবী নহেন। দেখিলে চিনিয়া উঠা দুষ্কর। হিরণ্ময়ীর বিরহে তাঁহার জীবন ধারণ করা একশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

জাহ্নবী দেবী গাত্রোত্থানের পর যেমন তেমন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক কিরণময়ীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একটি দাসীকে পাঠাইলেন। দাসী কিরণময়ীর গৃহে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তিনি

গৃহে নাই।" জাহ্নবী আর কিছু বলিলেন না। ভাবিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কিরণময়ী তাঁহার নিকট আসিবেন।

বেলা বাড়িল, তথাপি কিরণময়ী আসিলেন না, তখন জাহ্নবী আপনি কিরণময়ীর কক্ষে গমন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত দাসী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া গেল। কিরণময়ীর কক্ষ শূন্য। জাহ্নবী দেবী দুই চারি বার "কিরণ —কিরণ" বলিয়া ক্ষীণোচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া শব্দ পাইলেন না। তিনি বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—কিরণময়ীর শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। কিরণময়ীর আগমন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যমনস্কতার সহিত কিরণময়ীর মাথার বালিস্ উল্টাইয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, একখানি পত্র রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, উহার উপরে লেখা আছে, "পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতা ঠাকুরাণী মহোদয়া শ্রীচরণ-কমলেষু—"। জাহ্নবী দেবী সমুৎসুকচিত্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"মা!—আমি হিরণকে হারাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। প্রত্যেক নিমেষে আমার প্রাণ, মন, শরীর অবসন্ন হইতেছে। আমি কোন মতে স্থির থাকিতে পারিতেছি না। পিতা, ধীরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সকলে হিরণের অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছেন।—আমিও চলিলাম। আপনাদিগকে বলিলে যাইতে দিবেন না বলিয়াই আমি গোপনে চলিলাম। যদিও এ কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত, কিন্তু, মা! আমি যে তোমার স্নেহের এবং আমার প্রাণের হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতে চলিলাম। এরূপ কার্য্যে কোন দোষ নাই, বরং কর্ত্তব্যজনিত মহাপুণ্য আছে। যদি আমি হিরণ্ময়ীকে পাই, গৃহে ফিরিয়া আসিব, ~~তা নহিলে আসিব না~~ না পাইলেও ফিরিয়া আসিব।* আপনি ভাবিবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন যেন দুই ভগিনী এক সঙ্গে আসিয়া আপনার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে পারি। ঈশ্বর আপনার দুশ্চিন্তা এবং আমাদের বিঘ্ন নিবারণ করুন, ইতি। আপনার স্নেহপালিতা

কিরণময়ী।"

---

* কর্ত্তিত অংশটুকু কিরণময়ীর মনের প্রকৃত ভাব, কিন্তু মাতার পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই ভাবিয়া কর্ত্তিতাংশের পরে শেষাংশটুকু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

জাহ্নবী দেবী এই পত্রখানি পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দাসী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সেও চমকিয়া উঠিল, বলিল, "মা ঠাকুরাণি! কি হইয়াছে?"

জাহ্নবী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—কিরণময়ীও কাল রাত্রিকালে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! হায় হায়, আমার বিপদের উপর বিপদ!"

দাসী এই কথা শুনিয়া, "অ্যাঁ—সে কি! এ কি হইল!" বলিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

জাহ্নবী সরোদনে বলিলেন, "পত্রে ত লেখা আছে, হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতে গিয়াছে। কিন্তু আমাব তা'ত বিশ্বাস হয় না। কি জানি, কি ঘটিতে কি ঘটে! পোড়া বিধি রে, আমার কপালে এতও লিখেছিলি!" এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। একে শরীর ও মন অস্থির হইয়াছিল, তাহার উপর এই দুর্ঘটনা। জাহ্নবী যেন জীবন্মৃতা হইলেন। পাঠক! জাহ্নবী দেবীর ন্যায় এরূপ বিপদ্‌গ্রস্তা নারী, বোধ হয়, পূর্ব্বে কখন নয়নগোচর করেন নাই।

দগ্ধভাগ্যা জাহ্নবীর রোদন-নিনাদে এক এক জন করিয়া বাড়ীর সমুদয় লোক সেখানে উপস্থিত হইল। সকলেই অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল। যদিও পত্র পাইয়া কিরণময়ীর প্রস্থানবার্ত্তাব সন্দেহ রহিল না, তথাপি সকলে বাড়ীময় কিরণময়ীকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই হইল না।

জগদীশপ্রসাদ, ধীবেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য যাঁহারা হিরণ্ময়ীর অন্বেষণে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই নূতন বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না। যদি হিরণ্ময়ী আজিও কোন স্থলে গিয়া জীবিত থাকেন, তিনিও ইহার কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। এক বিবাহ লইয়াই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দুইটি ঘটিল।

প্রণাধিকা কন্যা দুইটিকে হারাইয়া জাহ্নবী দেবী এতদূর শোকাচ্ছন্ন ও চিন্তাজর্জ্জরিত হইলেন যে, তাঁহাকে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতে হইল। সে রোগ হৃদ্‌রোগ, অত্যন্ত সাংঘাতিক! সনাতন ধন্বন্তরি বিশেষরূপে জাহ্নবী দেবীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। ক্রমশই রোগের বৃদ্ধি, ক্রমশই শরীর ক্ষয়, এবং ক্রমশই জীবনীশক্তিব বিলোপ হইয়া আসিল। ধন্বন্তরি মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, জাহ্নবী দেবী এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন না বুঝি।

রোগ এতদূর পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তদ্দারা জাহ্নবী দেবী কখন অচেতন হইয়া যান, কখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেন, কখন আত্মঘাতিনী

হইতে যান। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বাটীস্থ সকলেই আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু আর উপায় নাই। এক দিন ঠিক মধ্যাহ্নের পর তিনি সেই নিদারুণ হৃদরোগের অসহ্য যন্ত্রণায় এরূপ অভিভূত হইলেন যে, তাঁহার চৈতন্য, স্পন্দ, নাড়ীগতি সমস্তই বিলুপ্ত হইল। নিকটস্থ পরিচারিকারা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন বাচনিক বা ইঙ্গিত উত্তর পাইল না। তৎক্ষণাৎ সকলে তাঁহার হস্ত পদ স্পর্শ করিয়া দেখিয়া চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। পরিচারিকাদিগের রোদননিনাদে বাটীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা দৌড়িয়া আসিল। পরিচারিকাদিগের মুখে সমস্ত শুনিয়া, আপনারাও ভাল করিয়া দেখিল। দেখিয়া সকলে হাহাকার করিয়া শোকবিলাপ করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে "হায় হায়, কি হইল! গৃহিণী ঠাকুরাণী আমাদিগকে ছাড়িয়া চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। এইরূপ ও অন্যরূপ নানাবিধ শোকবাক্য নিঃসৃত হইতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। জগদীশপ্রসাদের মাতুলপুত্র প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়-মাতা গণ হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং হরিহর দেওয়ান মহাশয় বাটীস্থ চারি পাঁচ জন প্রতিপালিত ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা তাঁহার আদেশে জাহ্নবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ তদীয় দেহ লইয়া ভাগীরথী তীরে গমন করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন ভৃত্যও চলিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাবিপদ।

জাহ্নবী দেবীর এই দুর্ঘটনার এক মাস পরে জগদীশপ্রসাদ সঙ্গীদিগকে লইয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহারা যে কএক জন গিয়াছিলেন, সকলেই ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে হিরণ্ময়ী নাই। অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর দেখা পাওয়া যায় নাই। আর যাহারা যে দিকে গিয়াছিল, তাহারা কিছু পূর্ব্বেই ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। কেবল ধীরেন্দ্রনাথ আজিও আসেন নাই।

জগদীশপ্রসাদ বাটীতে আসিয়া শুনিলেন, কিরণময়ীও হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানের জন্য, কাহাকে কিছু না বলিয়া, গোপনে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন এবং কন্যা দুইটির নিদারুণ শোকে তদীয় সহধর্ম্মিণী জাহ্নবী দেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জগদীশপ্রসাদ এই দুইটি অশুভকর সংবাদ শ্রবণে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল ফাটিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল। প্রাণ মন নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি করে মস্তক চাপিয়া অধো-

মুখে ভাবিতে লাগিলেন। নয়নযুগলে অশ্রু দেখা দিল। যাহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারাও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল।

অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল। অনন্তর জগদীশপ্রসাদ কিরণময়ীর লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া বিমর্ষবদনে তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে বলিলেন, "আর না—আর আমি এখানে থাকিব না। আমার দগ্ধভাগ্যের ফল এতদিনে পূর্ণাংশে ফলিল! বিধাতা আমার কপালে যে এতদূর দুর্ঘটনার বিষয় লিখিয়াছিলেন, তাহা অদ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। হা জগদীশ্বর! তোমার মনে এই ছিল!" এই বলিয়া আবার নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী, পিতৃস্বসা, মাতুলানীদ্বয় নিকটে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে আবার ক্রোন্দনধ্বনি উথলিয়া উঠিল।

জগদীশপ্রসাদ কিয়ৎকাল পরে সদুঃখে বলিতে লাগিলেন, "এ জন্মের মত মধুপুর পরিত্যাগ করিব। আমার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় যথাক্রমে আমার দুই জন ভাগিনেয়, পাঁচ জন মাতুলপুত্র এবং তোমাদিগকে অংশ করিয়া দিতেছি। আমি ধীরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করি, তাহাকেও সমান অংশের এক অংশ দিব। কাগজ কলম আনয়ন কর, দেওয়ানকে ডাক, আমি এক্ষণেই এই কার্য্য সমাধা করিয়া মধুপুর পরিত্যাগ করিব। কষ্টকর জীবনের শেষ ভাগটা কাশীধামে অতিবাহিত করিব। এখানে থাকিব না—বড় যন্ত্রণা! আমি এক্ষণে সন্ন্যাসী, আমার তীর্থবাসই উপযুক্ত। আমি মহাপাপী, তা' নহিলে আমাকে কিজন্য এরূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক তাপে তাপিত হইয়া কাঁদিতে হইবে! আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তীর্থস্থান ব্যতীত এখানে হইবার নহে।" এই বলিয়া আরও কত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক আবয়বিক ও মানসিক অবস্থা দেখিলে, জগতে যে কেহই সুখী নহে, তাহাই প্রতীয়মান হয়। জগৎ যে অসহ্য যন্ত্রণার আকর, তাহা জগদীশপ্রসাদ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন। জগতে মনুষ্যই যে কেবল অশেষরূপ যন্ত্রণার উপাদানে নির্ম্মিত তাহা জগদীশপ্রসাদের হৃদয়ঙ্গম হইল। মনুষ্যের বিপৎপাতের সংখ্যা যে অগণ্য, তাহা হতভাগ্য জগদীশপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন। আজ জগদীশের হৃদয় যন্ত্রণার আগ্নেয় গিরি, মন শোকের বিশাল সমুদ্র। আজ জগদীশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য।

জগদীশপ্রসাদের আদেশে একজন দাসী হরিহর দেওয়ানকে ডাকিতে গিয়াছিল। যাইবার পথে সে দেওয়ানজীর দেখা পাইল। হরিহর তখন জগদীশপ্রসাদের নিকট আসিতেছিলেন। দাসী তাঁহাকে কর্ত্তা মহাশয়ের সমস্ত কথা জানাইয়া, সঙ্গে করিয়া আনিল। জগদীশপ্রসাদ হরিহর দেওয়ানকে বিষয় বিভাগ ও কাশীবাসী হইবার কথা বলিলেন। দেওয়ানজী

সমস্তই দুঃখিতচিত্তে শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়! বিপদের সময়, ওর নাম কি, অত উতলা হইবেন না। আপনি পরম বিজ্ঞ, আপনাকে আমার বলাই বাহুল্য। ওর নাম কি, আপনি অন্য ব্যক্তিকে বিপদের সময় কত বুঝাইয়া থাকেন, তবে নিজে কেন এত অধীর হইতেছেন?"

জগদীশ বলিলেন, "পরকে বুঝান সহজ, কিন্তু নিজেকে নিজে বুঝান বড় কঠিন। আমি আর এখানে থাকিব না—এ শ্মশানে কে থাকিতে চায়?

দেওয়ানজী দেখিলেন, কর্ত্তা মহাশয় অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোনমতে তাঁহাকে সুস্থির করিতে হইবে, তাহা না হইলে সংসারটি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "মহাশয়! আপনার মনে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচিত, ওর নাম কি, তাহাই করুন, কিন্তু হঠাৎ এরূপ করাটা কর্ত্তব্য নহে। বিধাতার বিড়ম্বনায়, ওর নাম কি, গৃহিণী ঠাকুরাণী দেহত্যাগ করিয়াছেন, মনুষ্যে তাহার কি করিতে পারে? কিন্তু, ওর নাম কি, কিরণময়ীও ত ফিরিয়া আসিবেন. নিরুদ্দিষ্ট গিয়াছেন। আর ধীরেন্দ্রনাথ আজিও প্রত্যাগত হন নাই। ওর নাম কি, তিনিও ত হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। ওর নাম কি, তাঁহার আগমনকাল পর্য্যন্ত আপনি সুস্থির হইয়া থাকুন, তাহার পর, ওর নাম কি, কাশীবাসী হইবেন।"

জগদীশপ্রসাদ অধোমুখে দেওয়ানজীর কথাগুলি শুনিলেন। শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই থাকি। কিন্তু কিরণ হিরণকে কি আর পাইব। হা, আমি কি হতভাগ্য। স্ত্রী কন্যা সকলই হারাইলাম! হা বিধাত!" এই বলিয়া কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিলেন, "আচ্ছা, দেওয়ানজী। আমি ধীরেন্দ্রনাথের আগমনকাল পর্য্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে যা হউক করিয়া থাকিলাম, কিন্তু কন্যা দুইটির সুসংবাদ না পাইলে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই করিব।"

অনন্তর হরিহর দেওয়ান জগদীশপ্রসাদকে স্নান আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। জগদীশ তাঁহার কথা রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু সকলই অতৃপ্তি ও অনিচ্ছার সহিত। সে দিন গত হইল, তাহার পর এক দুই করিয়া কত দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। জগদীশপ্রসাদ হতাশহৃদয়ে ধীরেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হিরণ কিরণকে পাইবার আশা নাই, কেবল ধীরেন্দ্রনাথের মুখে হিরণ্ময়ীর শেষ সংবাদটি জানিবার জন্য শ্মশান সদৃশ ভবনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড।

——এই বলিয়া হিরণ্ময়ীর হস্ত ধারণ করিলেন।
হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না, কেবল অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।
ধীরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগি
এমন সময়ে উদ্যানের পশ্চিমদক্ষিণ কোণে কতকটা দূরে একটি মনুষ্যের
কি দেখা দিল। ——২ পৃষ্ঠা দেখ)